মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

পিএইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তাপস পাটোয়ারী

তত্ত্বাবধায়ক: অধ্যাপক সৌমিত্র বসু

সহ তত্ত্বাবধায়িকা: অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Soumitra Basu and Professor Aparajita Mukhopadhyay and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor	Co supervisor	Candidate
Dated: 14.8.2025	Dated: 14.8.25.	Dated: 14/08/2025
Former Professor Department of Philosophy Jadavpur University	Professor Department of Philosophy Jadavpur University Kolkata - 700 032	

এই গবেষণাপত্র আমি উৎসর্গ করছি **আমার মা** এবং **অদিতি'কে**

যাদের নিঃশর্ত ভালোবাসা, উৎসাহ এবং নিঃশব্দ ত্যাগ আমাকে এই

দীর্ঘ যাত্রায় নিরলস ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাপত্রটি মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদ বিষয়ক মননচর্চার একটি বিনম্র প্রয়াস। এই গবেষণাপত্র রচনার দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য যাত্রায় বহুমানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও উৎসাহ আমার পাথেয় হয়েছে। আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছি, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমার এই পিএইচ.ডি. গবেষণায় অবদান রেখেছেন।

প্রথমেই আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সৌমিত্র বসু এবং সহ তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রণাম। তাঁদের দূরদর্শিতা, তত্ত্বগত বিশ্লেষণ এবং অধ্যবসায় আমার চিন্তাভাবনাকে শাণিত করেছে। তাঁদের পরামর্শ, নির্মোহ সমালোচনা এবং বন্ধুসুলভ সহানুভূতি ব্যতীত এই গবেষণা কার্য কখনোই পরিপূর্ণ রূপ লাভ করত না। স্যার কেবল একজন শিক্ষক নন, একজন প্রেরণাদায়ী মনীষী, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। ম্যাডামের সুগভীর, স্পষ্ট এবং সুচিন্তিত মতামত আমার গবেষণায় প্রভূত উন্নতি করছে। এঁনাদের সান্নিধ্য পেয়ে আমি ধন্য বোধ করছি।

আমার গবেষণায় নিযুক্ত আর.এ.সি.'র সভ্য বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা পাপিয়া গুপ্ত মহাশয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর সুচিন্তিত ও পর্যালোচনামূলক পরামর্শ আমায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সহানুভূতিশীল আচরণ এবং সহযোগী মনোভাব আমার চিন্তাচর্চাকে ঋদ্ধ করেছে। যে কোনও সমস্যায়, যে কোনও সময়েই তাঁরা আমাকে যথাযথ সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিকভাবে প্রণাম জানাচ্ছি। দর্শন বিভাগের গ্রন্থাগারিক বিদ্যুৎ দা এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক কাকলী দি'কে ধন্যবাদ এবং মনিকা'দি, টুটু'দি, উত্তরাদি'র প্রতি কৃতজ্ঞ তাঁদের সহায়ক মনোভাবের জন্য।

আমার গবেষণা কার্যে আর্থিক সহায়তার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই আর্থিক সহায়তা না থাকলে গবেষণা সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না।

আমার বন্ধুদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা নানা পর্যায়ে পরামর্শ, উৎসাহ এবং আত্মিক সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নানা সময় মানসিক সহায়তার মাধ্যমে আমার পাশে থেকেছে।

সবশেষে, আমি আমার পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ এবং অনুপ্রেরণা সবসময় আমাকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। তাঁদের আস্থা, আশির্বাদ, ভালোবাসা ও স্নেহ ছাড়া এই পথ চলা সম্ভব ছিল না।

গবেষণার প্রতিটি ধাপে নিজেকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি। নিজের ধৈয্য, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস আবিষ্কার করেছি। এই পথ চলা শুধুমাত্র একটি গবেষণাপত্র রচনা নয়, বরং এক অন্তর্জগতের যাত্রা।

তাপস পাটোয়ারী

দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ভূমিকা		পৃ ক - ড
প্রথম অধ্যায়	বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস	পৃ ১ - ৫২
দ্বিতীয় অধ্যায়	মার্কসীয় বস্তুবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ	পৃ ৫৩ - ৮৪
তৃতীয় অধ্যায়	বস্তুবাদী মানবতাবাদের বিকাশ	পৃ ৮৫ - ১০২
চতুর্থ অধ্যায়	মার্কসবাদ বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়	পৃ ১০৩ - ১২১
পঞ্চম অধ্যায়	মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদ	পৃ ১২২ - ১৮৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	বস্তুবাদী মানবতাবাদের সমালোচনা	পৃ ১৮৮ - ২০৭
উপসংহার		পৃ ২০৮ - ২৫০
গ্রন্থপঞ্জী		পৃ ২৫১ - ২৬৩

ভূমিকা

দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদ (Materialism) একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব যা মনে করে জাগতিক বস্তুই একমাত্র বাস্তব সত্য, সকল কিছুর উৎস। এই বিশ্বাস অনুসারে চেতনা বা মন বস্তু থেকে উদ্ভূত একটি ধর্ম। তাই মন, চিন্তা, চেতনা, ধারণা—এগুলি মস্তিষ্কের মতো বস্তুগত প্রক্রিয়ার উপজাত। অর্থাৎ মন বা চেতনা কোনও স্বাধীন সত্তা নয়, বরং পদার্থ ও তার মিথষ্ক্রিয়ার ফল। বস্তুবাদের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণবাদ বা নির্ধারণবাদ (Determinism) গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই তত্ত্বানুসারে বস্তুগত জগতের ঘটনা, এমনকি মানুষের প্রতিটি চিন্তা এবং কর্ম পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয়, এগুলি স্বাধীন বা আকস্মিক নয়। মহাবিশ্বের বর্তমান অবস্থা পূর্ববর্তী কারণগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়। এই কারণ-কার্যের শৃঙ্খল ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাকে নির্ধারণ করে। বস্তুবাদ এবং নিয়ন্ত্রণবাদ একে অন্যকে সমর্থন করে। যদিও বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্ব বস্তুবাদে পাওয়া যায়। যেমন,

- ভৌত-নিয়ন্ত্রণবাদ (Physical Determinism) যেখানে দাবী করা হয় প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা ভৌত-রাসায়নিক নিয়মে পরিচালিত হয়।
- জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Biological Determinism) যা অনুসারে মানুষের আচরণ ও চরিত্র সম্পূর্ণ জৈবিক বা জিনগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত।
- মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Psychological Determinism) যা মনে করে, মানুষের চিন্তা ও আচরণ পূর্বের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত।
- অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Economic and Historical Determinism) এই মতে সামাজিক কাঠামো, রাজনীতি ও সংস্কৃতি মূলত

অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষের চেতনা নির্ধারিত হয় তার বস্তুগত অবস্থান বা শ্রেণী দ্বারা। আবার এই মতবাদে ইতিহাস বস্তুগত নিয়ম এবং শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয় বলে মনে করা হয়।

- প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণবাদ (Technological Determinism); যে তত্ত্ব অনুসারে প্রযুক্তির উন্নয়ন মানব সমাজ ও চেতনার গঠন নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রযুক্তি একটি বস্তুগত শক্তি যা চিন্তা, সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করে।

এই প্রতিটি নিয়ন্ত্রণবাদ প্রকৃতপক্ষে কারণগত নিয়ন্ত্রণবাদকে (Causal Determinism) সমর্থন করে। কারণ এখানে প্রতিটি ঘটনা বা কার্য কোনও পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নির্ধারিত সেটি বোঝায়। সে প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে অথবা মানসিক ঘটনা হতে পারে। উভয় ঘটনাকে কারণ দ্বারা নির্ধারিত বলে মনে করে। বস্তুবাদ এই নিয়ন্ত্রণবাদী তত্ত্বকে গ্রহণ করে জাগতিক বিষয়কে বস্তুগত কারণ এবং বস্তুগত নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

অন্যদিকে মানবতাবাদের প্রেক্ষিতে মানব জীবনে 'স্বাধীনতা' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি দর্শন, রাজনীতি, নৈতিকতা এবং সমাজজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও স্বাধীনতা শব্দটি কেবল একই অর্থে সবক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। 'স্বাধীনতা' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন,

- নেতিবাচক স্বাধীনতা (Negative Freedom): এই অর্থে স্বাধীনতা বলতে বাহ্যিক হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিকে বোঝানো হয়।
- ইতিবাচক স্বাধীনতা (Positive Freedom): বলতে ব্যক্তির নিজ কর্মের লক্ষ্য ও তা সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে বোঝায়।

- রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Freedom): এখানে ব্যক্তির মত প্রকাশ, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, নির্বাচনের অংশগ্রহণের অধিকারকে বোঝানো হয়।
- নৈতিক স্বাধীনতা (Moral Freedom): এই অর্থে ব্যক্তি নিজের নৈতিক বিবেক অনুযায়ী কর্ম করার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যকে বোঝায়।
- অস্তিবাদী স্বাধীনতা (Existential Freedom): এখানে প্রকৃত অস্তিত্বের অর্থ অনুধাবন করে নিজেকে নির্মাণ করার অধিকারকে বোঝানো হয়।
- অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Freedom): এই ক্ষেত্রে সম্পদ অর্জন, বাণিজ্য করার স্বাধীনতা প্রভৃতিকে বোঝায়।
- আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা (Spiritual Freedom): আত্মার মুক্তি, চিন্তার মুক্তি, বাইরের জগত থেকে মুক্তিকে বোঝায়।

স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য শর্ত হল ইচ্ছার স্বাধীনতা। ইচ্ছার স্বাধীনতা হল মানুষের মানসিক বা অভ্যন্তরীণ অবস্থা। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। কেননা আমাদের ইচ্ছাই যদি স্বাধীন না হয় তাহলে বাহ্যিক স্বাধীনতা ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু যদি আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন হয় তাহলে আমরা আমাদের বাহ্যিক স্বাধীনতাকে নিজেদের মতো ব্যবহার করতে পারি। সাধারণভাবে আমরা মনে করি আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে এবং সেটি মানুষের নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তি। যদি মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী না হতো তাহলে কোনও ভুল কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যেত না। কিন্তু সেখানেই প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তির চিন্তা যদি জড় জগতের নিয়ম অনুসারী হয় তাহলে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে কীভাবে? তাহলে কি বলা যায় প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই? আমরা জানি সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নৈতিকতা অত্যন্ত জরুরী। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচরণের মধ্যে একরূপতা রক্ষার জন্য কোনও একটি নির্দিষ্ট আদর্শ

অনুসারে সকলের আচরণ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট কিছু প্রত্যাশা থাকে—যে প্রত্যাশাগুলি পূরণ সম্ভব হয় ব্যক্তির মানবিক আচরণের দ্বারা। তাই বস্তুবাদকে স্বীকার করলে নৈতিকতার অবস্থান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। নৈতিকতা কতকগুলি আদর্শ নির্ধারণ করে যা ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা গঠনে ব্যক্তিকে সহায়তা করে এবং সেই অনুসারে ব্যক্তি তার কর্ম সম্পাদন করে। কিন্তু সমস্যা হল সবই যদি বস্তু জগতের নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তির ইচ্ছাও অন্য কারণ নির্ভর হওয়ায় স্বাধীন না হয় তবে নৈতিক আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যদি সমস্ত কিছুই ভৌত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাশক্তির অভাব স্বীকার করতে হয়। নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্বাধীন ইচ্ছা এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রূপে স্বীকৃত। যদি আমাদের কর্ম পূর্বনির্ধারিত বলা হয় তাহলে নৈতিক দায়িত্বের ধারণাও অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা আমরা কোনও কাজের জন্য প্রশংসিত বা নিন্দিত হতে পারি না যদি আমাদের বিকল্প নির্বাচনের উপায় না থাকে। ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে বস্তুশক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে ন্যায় বিচার, দয়া, সততা ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধগুলির উৎপত্তি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এই মূল্যবোধগুলি কি কেবল মানুষের মস্তিষ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল? নাকি এগুলির কোনও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে? মানবজীবনে নৈতিকতাকে এমন বস্তুবাদী কাঠামোর মধ্যে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু মানবতাবাদের মূল কথা মানবজাতি বা মানবজীবন সম্পর্কিত চিন্তা। মানুষের কর্মক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত ভাবনা। যেখানে কোনও ঐশ্বরিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পরিবর্তে মানুষকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যে মানুষ নৈতিক সত্তা, যার স্বাধীনতা আছে। সে কোনও অতিজাগতিক সত্তার অধীন নয়। কিন্তু মানুষকে স্বাধীন, কর্মক্ষমতা বিশিষ্ট সৃজনশীল সত্তা বলা যায় তখনই যদি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে। মানুষের যে কোনও স্বাধীনতার প্রাথমিক

শর্ত হল তার ইচ্ছার স্বাধীনতার উপস্থিতি। ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকৃত হলে মানুষ কোনও স্বাধীনতাই উপভোগ করতে পারে না। কিন্তু মানুষের সমস্ত কিছুই যদি বস্তুজগতের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না।

তবে দর্শন শাস্ত্রে নিয়ন্ত্রণবাদের সঙ্গে স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল, সুসংগতবাদ (Compatibilism); এ মতে বলা হয় নিয়ন্ত্রণবাদ এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয়। বরং এগুলি একসঙ্গে থাকতে পারে। স্বাধীনতার অর্থ এমন নয় যে আমাদের কর্মগুলি কোনও কারণ দ্বারা নির্ধারিত নয়, বরং এর অর্থ হল আমাদের কর্ম বাহ্যিক কোনও শক্তি বা বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। স্বাধীনতা হল নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কর্ম করার ক্ষমতা। যদি মানুষ নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কোনও কর্ম করে তাহলে সেই কর্মকে স্বাধীন বলা যায়। যদিও সেই ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ববর্তী কারণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিসংগতবাদ (Incompatibilism) অনুসারে নিয়ন্ত্রণবাদ এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। এই মতবাদে দাবী করা হয় নির্ধারণবাদ সত্য এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি মায়া বা বিভ্রম। যেহেতু সব কিছুই পূর্বনির্ধারিত, তাই মানুষের কোনও প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। সেক্ষেত্রে নৈতিকতার ধারণাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এ প্রসঙ্গে আমরা আধুনিক ভারতীয় চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি মনে করেছিলেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তিনি তাঁর নব মানবতাবাদে বস্তুবাদী নৈতিকতার ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাই আমরা এই গবেষণাপত্রে রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ

নির্ধারণ করার চেষ্টা করব। তাই আমাদের মূল গবেষণামূলক প্রশ্ন হল বস্তুবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদী আলোচনা সম্ভব কীভাবে? মানবতাবাদের মূল কথা যদি স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা হয় তাহলে বস্তুবাদের মাধ্যমে এগুলির ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব?

সমগ্র আলোচনায় আমরা মূলত ঐতিহাসিক (historical), বিশ্লেষণমূলক (analytical) এবং তুলনামূলক (comparative) গবেষণামূলক পদ্ধতি (Research Methodology) ব্যবহার করেছি। ঐতিহাসিক পদ্ধতি গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে প্রয়োগ করে বস্তুবাদের বিভিন্ন ধারাবাহিক বিকাশকে চিহ্নিত করেছি। বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের আলোচনায়। তুলনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে মার্কস সহ অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নির্ণয়ে।

রায় প্রস্তাবিত বস্তুবাদী মানবতাবাদে বস্তুবাদ সম্পর্কে রায়ের ধারণার অনন্যতা নির্ণয়ের জন্য আমাদের গবেষণাপত্রে প্রথম অধ্যায়ে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা প্রথমে 'বস্তুবাদ' শব্দটির অর্থ নিরূপণ করে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের ইতিহাসে বস্তুবাদের ধারাকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করেছি। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দিক থেকেই আলোচনা করা সঙ্গত হবে। কারণ বস্তুবাদী দর্শনের ধারা প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দর্শনে রয়েছে। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় এই মতাদর্শ অদৃষ্টবাদী ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতার দ্বারা মানবজাতির উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে। এ মতে বাস্তব জগৎ বা জড় জগৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি আমরা পাশ্চাত্য

দর্শনের দিকে দেখি তাহলে প্রথমেই যে দর্শনের কথা বলতে হয় তা হল মাইলেসীয় দর্শন। এই দর্শন সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় বস্তু জগৎকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। তারা প্রচলিত ধর্মমত ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা বাতিল করে বিশ্ব সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে একটি বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে প্রাচ্য দর্শন সম্প্রদায় যেমন সাংখ্য, লোকায়ত প্রভৃতি দার্শনিকদের মত বিচার করা হলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের চিন্তাভাবনার একটি বড় অংশ হল বস্তুকেন্দ্রিক। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচীন কাল থেকে কীভাবে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত এই চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাই বস্তুবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার জন্য এই অধ্যায়কে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাগগুলিতে বিভিন্ন সময়ে যে বস্তুবাদী বক্তব্যগুলির বিকাশ হয়েছিল তা উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম বিভাগে প্রাচীন ভারতে দর্শন চিন্তায় যে বস্তুবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী বক্তব্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে আধুনিক সময়ের বস্তুবাদী চিন্তাধারার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রেনেসাঁর পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যে যে বস্তুবাদের ধারার সূত্রপাত হয় তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে আধুনিক যুগের এমন বস্তুবাদী চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হল মার্কসীয় বস্তুবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিস্তারিত আলোচনা। প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ দার্শনিকই যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সমর্থন করেছেন, যা জড়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে জগত ও সমাজ উভয়ের পরিবর্তনের কারণ বলে মনে করেছেন।

ফ্রেডরিক এঙ্গলস মনে করেছিলেন এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ কতকগুলি অযৌক্তিক ও বদ্ধমূল ধারণার ওপর নির্ভর করে গঠিত। তাই সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ। পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস যে বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তার সুদূর প্রসারী প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তাই এই তত্ত্বটির বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন। কারণ আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। যা বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা মার্কসীয় বস্তুবাদে অতিক্রম করা হয়। তাই মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোচনা ব্যতীত বস্তুবাদের বিকাশের ধারা সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেজন্য আমরা মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোচনার মাধ্যমে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশের ধারাকে সমাপ্ত করেছি।

দর্শনের জগতে মানবতাবাদী তত্ত্বের উদ্ভব খুব স্বাভাবিক ভাবে ঘটেনি। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনাতে প্রাচীন ভারত ও পাশ্চাত্যে বস্তুবাদের কথা থাকলেও মানুষ সম্পর্কিত মানবতাবাদী আলোচনা, মানুষের স্বরূপ সংক্রান্ত বক্তব্য সেভাবে ছিল না। থাকলেও তা সাধারণ মানুষের কাছে উপলব্ধ ছিল না। প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায়। পরে আধুনিক যুগের সূচনায় রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রভাবে জ্ঞানের যে স্ফূরণ ঘটে সেখানে প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার পুনরুত্থান ঘটে। এই বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে বিজ্ঞানের সহায়তায়। বিভিন্ন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবনা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে এবং বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি একটি যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব স্থাপন করে। যেখানে পূর্বে ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে বিশ্বতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হতো সেখানে যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব মানুষের মন থেকে ধর্মীয়

চিন্তাকে মুক্ত করে। তাই রেনেসাঁ আন্দোলনের মানুষের যে বৌদ্ধিক উত্থান তা সমগ্র মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মহাবিশ্বের ধর্মতত্ত্ব ব্যবস্থার প্রতি মানুষ অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে নতুন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠন করে যা নতুন বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অনুকূল। সেই বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) দ্বারা পরিচালিত একটি বিশ্বব্যবস্থার ধারণা। তাই বলা যায় বস্তুবাদী দর্শনের ধারায় মানুষ এবং মনুষ্য সমাজ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা অথবা মানবকেন্দ্রিক মতবাদের বিশেষ উত্থান ঘটে। তাই বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে কীভাবে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে সেই সংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। আমরা জানি ‘মানবতাবাদ’ শব্দটি বহু অর্থ বহন করে। তাই এই সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতেই ‘মানবতাবাদ’ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ নিরূপণ করে বিভিন্ন প্রকার মানবতাবাদী তত্ত্বের উল্লেখ হয়েছে।

রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ জানার পূর্বে আমরা মার্কসীয় মতবাদের প্রতি রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করেছি। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নবমানবতাবাদে এক স্বতন্ত্র ভাবনা উপস্থাপন করেছেন যেখানে ব্যক্তি মানুষের অনন্যতা, স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দানের সঙ্গেই তিনি সহযোগিতামূলক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রায় অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, জগতের সৃষ্টি ও সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন যা অনুসারে মানব চেতনা জড় থেকেই আবির্ভূত হয়ে তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। এ শিক্ষা তিনি কার্ল মার্কসের থেকে লাভ করেছিলেন। তাঁর মতে সমাজ ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রায় তাঁর মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী মতাদর্শের উল্লেখ করেন—যা

তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে গ্রহণ না করে তিনি প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা আমরা বর্তমান অধ্যায়ে অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করব। কারণ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাদের প্রধান ভিত্তি মার্কসবাদে নিহিত ছিল। কোন কোন দার্শনিকগত তাত্ত্বিক সমস্যার কারণে রায় মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করে নবমানবতাবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সম্পর্কিত আলোচনা আমরা গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। সেখানে রায়ের দৃষ্টিতে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমাদের গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। মানবতাবাদ হল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব মুক্তি, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। এ মতবাদ হল এমন দার্শনিক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে স্বীকার করে এবং কর্মের কর্তারূপে তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। কোনও প্রকার ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার ওপর নির্ভর না করে এই মতবাদ যুক্তি, বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করে। যুক্তিপূর্ণ নৈতিক আচরণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ, সুখ ও পূর্ণতাকে নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। নিজস্ব পছন্দ অনুসারে জীবন পরিচালনার অধিকারকে সমর্থন করার জন্য রাজনৈতিক জীবনে মানবতাবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। এই মতবাদের অনুসারীগণ মানব সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিকাশের সাহায্যে মানব সামর্থ্যের বিকাশের দ্বারা উন্নত বিশ্ব গঠনে আগ্রহী।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মানবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে ব্যক্তি তার নিজের বুদ্ধির আলোকে স্বাধীনভাবে নৈতিক পথ অবলম্বন করে কল্যাণকর জীবন যাপনে সমর্থ হবে। তিনি মনে করেন, মানবতাবাদ অতি প্রাচীন একটি দর্শন। যেখানে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্যকে (supremacy) স্বীকার করে তার নিরিখে জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। মানবতাবাদকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যে মতবাদে মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তাকে এক রহস্যের আবরণে আবৃত রাখা হয় সে মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেছে বলে রায় মনে করেন। তিনি মনে করেন, যে মতবাদ মানুষের স্বাতন্ত্র্য, তার সৃজনী প্রতিভাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও অতিজাগতিক সত্তাকে কল্পনা না করে বাস্তব বিষয়ের মধ্য দিয়ে মানব সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সেই মতবাদ হল প্রকৃত মানবতাবাদ। রায় তাঁর মানবতাবাদে একটি অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত বিশ্বচিত্র অঙ্কন করেছেন যেখানে ব্যক্তির যৌক্তিক সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মানব অস্তিত্বকে ও তার উদ্দেশ্যকে এক ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব মানবতাবাদের মূল ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর দর্শন ভাবনার অনন্যতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। রায় কীভাবে বস্তুবাদের মাধ্যমে মানবতাবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি আমাদের এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। তাই আলোচনার শুরুতেই আমরা রায়ের নব মানবতাবাদের মূল ধারণা স্বাধীনতাকে উপস্থাপন করব, যে স্বাধীনতাকে রায় বস্তুবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। একই সঙ্গে এখানে রায়ের বস্তুবাদ সম্পর্কিত ধারণা এবং বস্তুবাদ-ভিত্তিক নৈতিকতার ধারণা উপস্থাপিত হবে। এই আলোচনার ভিত্তিতে রায়ের বস্তুবাদী নৈতিকতার স্বরূপ স্পষ্ট হবে। এই অধ্যায়ে আমরা আরোও দুটি প্রশ্নের উত্তর

অনুসন্ধান করব। প্রথমত, রায় প্রদত্ত মানবতাবাদী তত্ত্ব কেন রাজনৈতিক লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হয়েছে? দ্বিতীয়ত, রায় তাঁর মানবতাবাদীতত্ত্বে সমাজ দর্শনের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন? এই সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে রায়ের মানবতাবাদী তত্ত্বের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করব যেগুলি তাঁর মতবাদকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে পারে।

রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও সেখানে কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা থেকে যায়। তাই আমাদের গবেষণাপত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রায় প্রদত্ত বস্তুবাদী মানবতাবাদের সেই সকল তাত্ত্বিক সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করা হবে। তাছাড়াও রায়ের মানবতাবাদের ধারণাকে অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে সমালোচনা করেছিলেন সেগুলির কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হবে। তাই আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করব।

উপসংহারে আমরা রায়ের মতবাদের সেই সমস্ত অংশগুলিকে চিহ্নিত করেছি যার জন্য তাঁর বস্তুবাদী মানবতাবাদ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়াও আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে এই সমস্যাগুলি অতিক্রম করে রায়ের তত্ত্বের পরিমার্জন ভিত্তিক একট বিকল্প প্রস্তাব করা যায়।

উল্লেখ্য, দর্শনের ইতিহাসে এমন কতকগুলি শব্দ রয়েছে যাদের অর্থ নির্ণয়ে কিছু জটিলতা দেখা যায়। সেই সকল শব্দগুলিকে আমরা যখন ইংরাজী ভাষায় ব্যবহার করি তখন সেগুলি নিয়ে সমস্যা থাকে না। কিন্তু ঐ ইংরাজী শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দে জটিলতা তৈরী হয়। যেমন, Materialism, Realism ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রে এই জটিলতা দেখা যায়। সাধারণ ভাবেই এই সব শব্দগুলিরই বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় বস্তুবাদ। *Realism*

হল একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ, যেখানে বস্তু (entities) ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদ বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। যেমন, টমাস রিড, জর্জ এডওয়ার্ড মূর প্রমুখ দার্শনিকগণ অস্তিত্ব বলতে বস্তু, গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য ও তাদের সম্পর্ককে বুঝিয়ে থাকেন। তবে তাঁদের অনেকে সুনির্দিষ্ট (দেশ-কাল সাপেক্ষে) বস্তুর অস্তিত্বের দাবী না করে non- material বিষয়ের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। ফলে তাঁরা অনেক বিমূর্ত বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী বলা যায়। সেই বিমূর্ত ধারণার ভিত্তিতেই এই দার্শনিকেরা নৈতিক বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেমন, প্লেটোর ধারণাবাদ। কিন্তু *Materialism* অনুসারে, কেবলমাত্র ভৌতিক বস্তু বা পদার্থ এবং তাদের অন্তঃক্রিয়ার দ্বারা বাস্তব জগত (reality) গঠিত। যেমন, ডেমোক্রিটাস, হবস, প্রমুখ দার্শনিকেরা বস্তুজগত গঠনের উপাদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমস্ত কিছুকেই জড় (Physical) বলে মনে করেন। এমনকি চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাকেও জড় জগতের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তাই তাঁরা সকল প্রকার বিমূর্ত বিষয়কে অস্বীকার করে বাস্তব জগতের প্রেক্ষাপটে সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করেন। তাই মেটিরিয়ালিস্ট দার্শনিকেরা সর্বদাই রিয়েলিস্ট। কিন্তু রিয়েলিস্ট দার্শনিক মানেই সবসময় মেটিরিয়ালিস্ট হবেন এমন নয়। কোনও কোনও রিয়েলিস্ট দার্শনিক ভাববাদী মতবাদ পোষণ করতে পারেন। তাই মেটিরিয়ালিজম সংক্রান্ত আলোচনাকে রিয়ালিজমের সঙ্গে এক করা যায় না। তাই আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য মেটিরিয়ালিজমের বাংলা প্রতিশব্দ বস্তুবাদ এবং রিয়ালিজমের বাংলা প্রতিশব্দ বাস্তববাদ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস

বস্তুবাদ ভিত্তিক মানবতাবাদ বিষয়ক আলোচনার প্রথমেই বস্তুবাদ বা জড়বাদ বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজীতে ‘Materialism’ শব্দের অর্থ হল জড়বাদ বা বস্তুবাদ। তবে আমার গবেষণার লক্ষ্য এই শব্দটির অর্থ বা তার পরিধি নির্ণয় করা নয়। বস্তুবাদ বিষয়ক আলোচনার প্রয়োজন কারণ আমাদের লক্ষ্য হল এমন মানবতাবাদের প্রকৃতি নির্ণয় করা যার ভিত্তি হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদ কাকে বলে তা বুঝতে হলে ‘বস্তু’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানা জরুরী। জন হসপার্স (John Hospers) তাঁর *An Introduction to Philosophical Analysis* গ্রন্থে একটি শব্দের সংজ্ঞাকে দু’রকম ভাবে প্রদান করা যায় বলে দাবী করেন। যথা, স্টিপুলেটিভ ডেফিনেশন (Stipulative Definition) এবং রিপোর্টিভ বা লেক্সিক্যাল ডেফিনিশন (Reportive or Lexical Definition)। স্টিপুলেটিভ সংজ্ঞায়[১] প্রচলিত অর্থের পরিবর্তে নতুন একটি অর্থ প্রদান করা হয়। কিন্তু রিপোর্টিভ ডেফিনিশন তা নয়। সেজন্য আমরা মেটিরিয়ালিজম্ শব্দের স্টিপুলেটিভ ডেফিনেশন নিয়ে আগ্রহী নই। বরং কোন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য। তাই বলা যায় আমরা মেটিরিয়ালিজম্ শব্দের রিপোর্টিভ বা লেক্সিক্যাল ডেফিনেশন অনুসন্ধান করতে বেশী আগ্রহী। ‘ম্যাটার’ শব্দটির প্রতিশব্দ বস্তু হলেও তার ব্যক্ত্যর্থ কী, ভারতীয় দর্শনে এবং পাশ্চাত্য দর্শনে সেটির

[১] উল্লেখ্য যে দর্শনের আলোচনায় ডেফিনিশন শব্দের প্রতিশব্দ লক্ষণ বলা হলেও এখানে আমরা আভিধানিক অর্থে সংজ্ঞা শব্দটি ব্যবহার করছি।

ব্যাখ্যা কীরূপ, অভিধানেই বা শব্দটির কী অর্থ করা হয়েছে সেগুলি আলোচনা পূর্বক বস্তুবাদী দর্শনের বিভিন্ন ধারাকে এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

কোনও শব্দের লেক্সিক্যাল ডেফিনেশন কি তা জানার জন্য প্রচলিত কোনও অভিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন। *The Oxford paperback Dictionary*-তে 'materialism' শব্দের অর্থ করা হয়েছে—"১. Belief that only the material world exists. এবং ২. Excessive concern with material possessions rather than spiritual or intellectual values."[২] প্রথম অর্থ হল এ মতবাদ কেবল বস্তু বা বাস্তব জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় অর্থ হল যে মতবাদ আধ্যাত্মিক বা বৌদ্ধিক মূল্য অপেক্ষা বস্তুর অধিকারভোগকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। আবার *Webster's New World Dictionary* তে বলা হয়েছে—"৩. The Philosophical doctrine that everything in the world, including thought, will, and feeling, can be explained only in terms of matter. ৪. The tendency to be more concerned with material than with spiritual values."[৩] এখানে মেটিরিয়ালিজম্'কে এমন একটি দার্শনিক তত্ত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে যা জগতের সমস্ত কিছু, এমনকি চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতিও কেবল জড়ের দ্বারা ব্যাখ্যাত বলে মনে করে। এ হল এমন প্রবণতা যা আধ্যাত্মিক মূল্য অপেক্ষা জড়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

[২] Joyce M. Hawkins (compiler), *The Oxford Paperback Dictionary*, p. 392

[৩] David B. Guralnik (ed.), *Webster's New World Dictionary*, p. 462

Materialism-এর এই সংজ্ঞাগুলি প্রাথমিকভাবে বোধগম্য হলেও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কেননা অভিধানে উল্লিখিত শব্দের অর্থ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মৌখিক অভিব্যক্তি। তার মধ্যে দার্শনিক তাৎপর্য অনুপস্থিত। *Materialism* শব্দের দার্শনিক সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে দর্শনের বিশ্বকোষে (*Encyclopedia of Philosophy*) কী বলা হয়েছে তা দেখা প্রয়োজন। *The Encyclopedia of Philosophy* অনুযায়ী—"Materialism is the name given to a family of doctrines concerning the nature of the world which give to matter a primary position and accord to mind (or spirit) a secondary, dependent reality or even none at all."[8] দর্শনের বিশ্বকোষ অনুসারে, মেটিরিয়ালিজম জগতের প্রকৃতি ব্যাখ্যাকারী এমন এক মততন্ত্র যা জড়ের অবস্থানকে প্রাথমিক এবং মন বা আত্মাকে গৌণ, সাপেক্ষ, এমনকি অনস্তিত্বশীল বলেও ব্যাখ্যা করে। এখানে আরো বলা হয়েছে, "all entities and processes are composed of or are reducible to—matter, material forces or physical processes."[৫] সুতরাং *মেটিরিয়ালিজম* বলতে আমরা এমন একটি মততন্ত্রকে বুঝি যা দাবী করে এ বিশ্বজগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল তা সকলই দ্রব্যবিষয়ক। জগতের সকল সত্তা, এমনকি যাবতীয় কার্যধারা জড়ের দ্বারা গঠিত, জড়শক্তিতে বা জড়াত্মক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরযোগ্য। এমন কি চেতনার উৎপত্তিও জড়বস্তুর মিথষ্ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। এই তত্ত্ব জগতের উৎপত্তিতে কোনও আধ্যাত্মিক সত্তার ভূমিকা অস্বীকার করে বস্তুকেই জগতের মূল বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ এ তত্ত্ব অনুসারে জগতের উৎপত্তি প্রক্রিয়ায় জড়ের স্থান প্রাথমিক, মুখ্য; মন, আত্মা বা

---

[8] Keith Campbell, "Materialism" in *The Encyclopedia of Philosophy*, p. 179

[৫] Craig, Edward, *Routledge Encyclopedia of philosophy*, vol.6, p. 170.

চেতনের স্থান গৌণ, কারণ এগুলির উৎস জড়বস্তু বলে তাদের অস্তিত্ব জড়ের উপর নির্ভরশীল।

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ভারতীয় বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*[৬] নামক গ্রন্থে 'মেটিরিয়ালিজম্' শব্দের উৎপত্তির একটি রূপরেখা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, প্রচলিত অভিধান অনুসারে, 'মেটিরিয়ালিজম্' শব্দের প্রতিশব্দ 'জড়বাদ'। এখানে ম্যাটার থেকে মেটিরিয়ালিজম্ কথাটি এসেছে। যে মতানুসারে ম্যাটার পরম সত্য বা আদি কারণ অথবা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান বলে স্বীকৃত হয় তাকেই মেটিরিয়ালিজম্ বলে। অভিধানিকেরা 'ম্যাটার' শব্দের অর্থ করেন জড়—অতএব মেটিরিয়ালিজম্ অর্থে জড়বাদ শব্দকে গ্রহণ করা হয়েছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আরোও বলেন, ভারতীয় দর্শনে 'ম্যাটার' শব্দের প্রতিশব্দ 'জড়' না বলে 'ভূত' বলা হয়। যেমন, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত। ভারতীয় দর্শনের জড়বাদী ব্যাখ্যা অনুসারে 'মেটিরিয়ালিজম্' শব্দের প্রতিশব্দ হল 'ভূতসর্বস্ববাদ'। এখানে দাবী করা হয় ভৌতবস্তুই জগত ও জাগতিক সকল বস্তুর উৎস, এমনকি ভৌতবস্তু থেকেই চৈতন্যেরও উৎপত্তি। এই মতবাদের সমর্থকেরা মাটি, জল, বায়ু, আগুন এমন কি আকাশ নামক ভৌতবস্তুগুলিকে চরম সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি রাহুল সংকৃত্যায়ণও ভারতীয় দার্শনিক প্রথা অনুসরণ করে মেটিরিয়ালিজম্ অর্থে ভৌতিকবাদ শব্দ ব্যবহার করেন।[৭] কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষায় তা স্বীকার করা হয় না। কেননা বাংলা ভাষায় ভৌতিক শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও বর্তমানে মেটিরিয়ালিজম্ অর্থে জড়বাদ শব্দটির পরিবর্তে বস্তুবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই প্রতিশব্দ যথার্থ কিনা

---

[৬] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (১৯৯৩), *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে।*

[৭] তদেব, পৃ. ২৬

সে বিষয়ে অনেক তর্ক থেকে যায়। তবে এখানে বস্তু শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত ইংরাজি 'ম্যাটার'-এর প্রতিশব্দ একথা বলাই যায়।

বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দর্শনের দিক থেকেই আলোচনা করা সঙ্গত হবে, কারণ বস্তুবাদী ভাবনার আলোচনা প্রথম থেকেই এই উভয় দর্শনেই রয়েছে। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় এই মতাদর্শ অদৃষ্টবাদী ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতার দ্বারা মানবজাতির উৎপত্তি ও প্রগতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করে। এ মতে বাস্তব জগৎ বা জড় জগৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদি আমরা পাশ্চাত্য দর্শনের দিকে দেখি তাহলে প্রথমেই যে দর্শনের কথা বলতে হয় তা হল মাইলেসীয় দর্শন। এই দর্শন সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় বস্তু জগৎকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত হয়। তাঁরা প্রচলিত ধর্মমত ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা বাতিল করে বিশ্ব সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে একটি বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে প্রাচ্যে সাংখ্য, লোকায়ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের চিন্তা ভাবনাকে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের চিন্তাভাবনার একটি বড় অংশ হল বস্তুকেন্দ্রিক। বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে প্রাচীন কাল থেকে কীভাবে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত এই চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাই বস্তুবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনার জন্য এই অধ্যায়কে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এই বিভাগগুলিতে বিভিন্ন সময়ে যে বস্তুবাদী বক্তব্যগুলির বিকাশ হয়েছিল তা উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম বিভাগে প্রাচীন ভারতের দর্শন চিন্তায় যে বস্তুবাদী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী বক্তব্যগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিভাগে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী চিন্তাধারার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আলোচিত বস্তুবাদী চিন্তার স্বরূপ

সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শনকে অধ্যাত্মবাদী (ভাববাদী) কিংবা রহস্যবাদী বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদী ভাবধারার পাশাপাশি ভারতীয় দর্শনেও এক বস্তুবাদী ভাবধারার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তার উল্লেখ পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতে পাওয়া যায়। তবে এই সমস্ত প্রমাণ থেকে বস্তুবাদ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেলেও বস্তুবাদী ভাবধারার কোনও বিশদ বিবরণ নেই। ভারতীয় দর্শনে ঘোষিত বস্তুবাদ বলতে যে নামটি আমাদের সামনে উঠে আসে তা হল লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন। তবে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনের বস্তুবাদী পরিচয়কে সঠিকভাবে জানা যায় না। কেননা এই দর্শন সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনও গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়নি। অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে ধারণা গঠন যায়। তবে আধুনিক কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিদের গবেষণা মূলক রচনায় আমরা লোকায়ত দর্শনের বিশদ পরিচয় পাই। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক বা লোকায়ত ঘোষিতভাবে বস্তুবাদী হলেও বস্তুবাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও উপাদান প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকটভাবে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। তাই ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় চার্বাক ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য *চার্বাক চর্চা* নামক গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নামে অথবা ছদ্মনামে বা নাম ছাড়াই ভারতে বস্তুবাদের একটি প্রাক-ইতিহাস আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাধাকৃষ্ণণ ও ফ্রাউভালনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দুজনেই মনে

করেছিলেন যে—(বিষয় হিসাবে) দর্শন যতখানি প্রাচীন, বস্তুবাদও ততখানি।[৮] তাঁদের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে বস্তুবাদ একটি অতি প্রাচীন চিন্তাধারা। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন সম্প্রদায়ের মতামতকে আমরা বস্তুবাদী বলে মনে করবো কেন? অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'লোকায়ত' শব্দটির অর্থ অনুসন্ধানে দুটি প্রস্তাব রেখেছেন। লোকায়ত বলতে বোঝানো হয় "লোকেষু আয়তো লোকায়ত"[৯] অর্থাৎ জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত আছে বলে এই নাম। চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, অধ্যাপক ই. বি. কাওয়েল মাধবাচার্যের *সর্বদর্শন সংগ্রহ* বলে সংস্কৃত পুঁথির ইংরেজী তর্জমা করার সময় এই রকম একটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।[১০] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই দর্শনকে সাধারণ মানুষের বিশ্ববীক্ষা (world outlook) বলে মনে করেন। 'লোকায়ত' শব্দের অপর একটি অর্থ করা হয় ইহলোক সংক্রান্ত দর্শন, যাঁরা পরলোকে ও আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, ধর্ম ও মোক্ষকে অস্বীকার করেন, তাঁদেরই বলে লোকায়তিক। তাঁরা মনে করেন, জল, মাটি, অগ্নি, বায়ু দিয়ে গঠিত পৃথিবী একমাত্র সত্য; আত্মা বলতে দেহভিন্ন কিছুই বোঝায় না। এই অর্থে লোকায়ত বলতে দেহাত্মবাদ, বস্তুবাদকে বোঝায়। ইংরাজীতে যাকে মেটিরিয়ালিজম বলা হয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও একইভাবে 'লোকায়ত' শব্দটির অর্থ নির্ধারণ করেন। এছাড়াও সেন্ট পিটার্সবার্গ অভিধানে 'লোকায়ত' শব্দের অর্থ করা হয় মেটিরিয়ালিজম বা বস্তুবাদ। মানিয়ার উইলিয়ামস-এর অভিধানে পুংলিঙ্গে শব্দটির অর্থ হয় বস্তুবাদী দার্শনিক এবং ক্লীবলিঙ্গে শব্দটির অর্থ হয় নিরীশ্বরবাদী দর্শন। তিনি আরোও কয়েকটি তথ্যসূত্রের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করেছেন

[৮] ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, পৃ ৩৪

[৯] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পৃ ৩৭

[১০] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, পৃ ৪৯

লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শন। পঞ্চম শতাব্দীর চিন্তাবিদ বুদ্ধঘোষের মতে, বস্তুজগতের উপর ভিত্তি করে এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে, কারণ 'আয়ত' বা 'আয়তন' শব্দের অর্থ হল 'ভিত্তি'। অপর এক প্রাচীন চিন্তাবিদ হরিভদ্র 'লোক'-এর সংজ্ঞায় সেই সকল বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলির ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় –"এতাবানের লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ"। টীকাকার মণিভদ্র কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন, লোক অর্থ নিছক পদার্থসমূহ বা যেগুলির বস্তুগত অস্তিত্ব আছে।[১১] হরিভদ্র ও মণিভদ্র তাই মনে করেন, যেহেতু 'লোক' শব্দটির মধ্যেই লোকায়ত দর্শনটির মূল নিহিত আছে তাই এটি একান্তভাবে বস্তুবাদী দর্শন।

ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের আলোচনায় কখনও চার্বাক কখনও লোকায়ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন। পূর্বেই লোকায়ত শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন 'চার্বাক' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের পার্থক্য দেখান যেতে পারে। 'চার্বাক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিও নিশ্চিত নয় বলে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কতকগুলি সংশয় প্রকাশ করেছেন। সেগুলিকে এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর মতে, 'চর্বন' থেকে 'চার্বাক' শব্দের উৎপত্তি একথা ঠিক নয়। চারু+বাক্— চার্বাক এমন একটি প্রস্তাব দেওয়া হলেও ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন বাক্ এর হসন্ত উড়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের যথযথ উত্তর পাওয়া যায় না বলে ভট্টাচার্য্য মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন 'চারু' শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয়। বিশেষণ হিসাবে 'চারু' শব্দের অর্থ শোভন বা সুন্দর। তাই বলা হয় আপাত মনোরম বাক্য দিয়ে লোক ভোলানো হত বলেই এমন নাম হয়েছে। তবে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের পূর্বে বস্তুবাদী দর্শনের নামান্তর রূপে

---

[১১] তদেব, পৃ ৫০

চার্বাক নামটি পাওয়া যায় না। ফলে বস্তুবাদী দর্শনের নাম চার্বাক হল কেন তা স্পষ্ট নয় বলে রামকৃষ্ণ ভটাচার্য্য মনে করেন। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই শব্দ দুটির ব্যবহারের তথ্য প্রমাণ দিয়ে মূলত একটি সম্প্রদায়কেই (বস্তুবাদী দর্শন) বোঝান। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই বস্তুবাদী দর্শনের আদি পর্ব খুঁজতে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফিরে যেতে হবে। কেননা এই বস্তুবাদী দর্শনের নামকরণ চার্বাক বলে গণ্য হয় আনুমানিক খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে। অষ্টম শতক থেকে ভারতীয় দর্শনের যে সমস্ত দার্শনিক আলোচনা বিদ্যমান ছিল সেখানে চার্বাক নামক এক বস্তুবাদী দর্শনের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। এই সময়ের আগে বিশেষ কোনও দার্শনিকের রচনায় এমন উল্লেখ ছিল না। বস্তুবাদী হিসাবে চার্বাক দর্শনের নাম প্রথম ভারতীয় দর্শনে উঠে আসে বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীলের রচনাতে। কমলশীলের গুরু ছিলেন শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিত রচিত *তত্ত্বসংগ্রহ* গ্রন্থটি ব্যাখ্যা করে কমলশীল যে ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তা *কমলশীলের পঞ্জিকা* নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে দার্শনিক কমলশীল নিজস্ব মত উল্লেখের পূর্বে ভারতীয় প্রথা অনুসরণ করে পূর্বপক্ষ রূপে প্রথমেই যে মতগুলি বর্ণনা করেছিলেন সেখানে একটি চরম বস্তুবাদী মতবাদ ছিল। সেখানে তিনি চার্বাক মতের প্রবক্তা হিসাবে পুরন্দর নামে জনৈক দার্শনিকের নাম উল্লেখ করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে জৈন দার্শনিক হরিভদ্র *ষড়দর্শন-সমুচ্চয়* নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে জৈন দার্শনিক গুণরত্ন *তর্ক রহস্য দীপিকা* রচনা করেন। হরিভদ্রের রচিত গ্রন্থের নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ ছয়টি দার্শনিক মতের বিচারমূলক পর্যালোচনা করে জৈন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ মতগুলির মধ্যে অন্যতম মতবাদ ছিল বস্তুবাদী চার্বাক। খ্রিষ্টীয় নবম শতক নাগাদ প্রখ্যাত দার্শনিক জয়ন্ত ভট্ট তাঁর রচনা শৈলীতে বিপক্ষ মত রূপে চরম বস্তুবাদকে নির্দেশ করার জন্য 'চার্বাক' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। বিভিন্ন

দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হল মাধবাচার্য'র *সর্বদর্শন সংগ্রহ*। এই গ্রন্থটির রচনার উদ্দেশ্য হল অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। তাই তিনি তৎকালীন প্রচলিত প্রায় পনেরটি দার্শনিক মতকে বিচারমূলক খণ্ডন করে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সর্বপ্রথম বস্তুবাদ নামক মতবাদটি খণ্ডন করেন, যাকে মাধবাচার্য চার্বাক নামে অভিহিত করেছিলেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল থেকে শুরু করে জয়ন্তভট্ট বা হরিভদ্র প্রমুখ দার্শনিকেরা প্রত্যক্ষ ভাবে 'চার্বাক' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তার পরিবর্তে 'লোকায়ত' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আবার জয়ন্তভট্ট 'লোকায়ত' শব্দটির পরিবর্তে 'ভূতচৈতন্যবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এই সকল দার্শনিকদের মধ্যে মাধবাচার্য প্রথম 'চার্বাক' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, এবং চার্বাক নাম দিয়ে বস্তুবাদ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এই সমস্ত দার্শনিকরা কেন 'চার্বাক' বা 'লোকায়ত' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সেই প্রশ্নে না গিয়ে আমরা এই দাবী করতে পারি যে তাঁদের মতের বিপক্ষ হিসাবে উঠে এসেছে একটি বস্তুবাদী মতবাদ, যে মতবাদ খণ্ডনে তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। তাই প্রাচীন ভারতে একটি বস্তুবাদী মতবাদের প্রচলন ছিল বলে দাবী করা যেতে পারে, যে বস্তুবাদী মতবাদটি চার্বাক বা লোকায়ত নামে পরিচিত ছিল।

চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনটি খ্রিষ্ট্রীয় অষ্টম শতক থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলেও তারও অনেক আগে থেকেই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে লোকায়ত মতের উল্লেখ আছে। যেমন, কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*। এই গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে অনেক মতানৈক্য থাকলেও খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এটি রচনা হওয়া সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। কৌটিল্যের মতে বিদ্যা চার প্রকার। যথা- অন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি। এই অন্বীক্ষিকী অপর তিনটি বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ তা এই সকল বিদ্যার পক্ষেই প্রদীপের মতো। কোটিল্য

অন্বীক্ষিকী বলতে মূলত তিনটি দার্শনিক মতকে বুঝিয়েছিলেন। সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, এবং লোকায়ত। তাই বলা যায়, বস্তুবাদী দর্শন হিসাবে চার্বাক নামটির উল্লেখ না থাকলেও তা লোকায়ত নামে উল্লিখিত ছিল। প্রাচীন ভারতে যে বস্তুবাদী মতবাদ প্রচলিত ছিল তার আরও একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল *ছান্দোগ্য উপনিষদ*। এই উপনিষদে ঋষি উদ্দালক আরুণির মতের সারমর্ম যে বস্তুবাদ তা জ্যকবি (H. Jacobi) ও তাঁর শিষ্য ওয়ালটার রুবেন (Walter Ruben) বিচারমূলক ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[১২] তাঁরা মনে করেন, উপনিষদে অন্যান্য সমস্ত দার্শনিকেরা জগতের আদি কারণ হিসাবে যেখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে উদ্দালক কোথাও এই শব্দটি ব্যবহার করেননি। তার পরিবর্তে তিনি 'সৎ' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁদের মতে, এই সৎ-কে সাংখ্য দর্শনে 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান'—এর মতো অচেতন অর্থে গ্রহণ করা হলে উদ্দালককে বস্তুবাদী বলে স্বীকার করতে হবে। উদ্দালকের মতে, অচেতন বস্তুই জগতের কারণ এবং তা থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ঋষি উদ্দালকের মতবাদকে বস্তুবাদ বলেই স্বীকার করতে হয়। ঋষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণকে 'নিছক সৎ' বলে উপস্থাপন করতে হবে। এই 'সৎ' থেকে পর্যায়ক্রমে অগ্নি, জল ও অন্ন'র উৎপত্তি হয়। আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে বাক, জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে প্রাণ এবং অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে মনের সৃষ্টি হয়। পুত্র শ্বেতকেতুকে আরুণি উপদেশ দিলেন— অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপূরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং মোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ।। (ছা. উ. ৬/৫/১) অর্থাৎ অন্ন ভুক্ত হয়ে ত্রেধা বিভক্ত হয়। সেই অন্নের যা স্থূলতম অংশ তা পুরীষ হয়, যা মধ্যম ভাগ তা মাংস এবং যা

[১২] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পৃ ১৩৪

সূক্ষ্মতম অংশ তা মন হয়। আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ।। (ছা. উ. ৬/৫/২) অর্থাৎ জল পীত হয়ে ত্রেধা বিভক্ত হয়। সেই জলের যা স্থূলতম অংশ তা মূত্র হয়, যা মধ্যম তা রক্ত এবং যা সূক্ষ্মতম অংশ তা প্রাণ হয়। তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্।। (ছা. উ. ৬/৫/৩) অর্থাৎ তেজ (অর্থাৎ ঘৃতাদি তেজস্কর পদার্থ) ভুক্ত হয়ে ত্রেধা বিভক্ত হয়, তার যা স্থূলতম অংশ তা অস্থি হয়, যা মধ্যম অংশ তা মজ্জা এবং যা সূক্ষ্মতম অংশ তা বাক হয়। ... হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজময়। (...অন্নময়ম্ হি সোম্য, মনঃ অপোময়ঃ প্রাণঃ, তেমোময়ী বাক্ ইতি। (ছা. উ. ৬/৫/৪)

এই অন্ন থেকে মন কীভাবে তৈরী হয় সে বিষয়ে পুত্র শ্বেতকেতু পিতাকে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে বললেন। উত্তরে ঋষি উদ্দালক বললেন, ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময় প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি।। (ছা. উ. ৬/৭/১) হে সৌম্য! পুরুষ ষোলকলাযুক্ত। পনেরদিন ভোজন করিও না, কিন্তু যতটা ইচ্ছা জল পান করিও, কারণ প্রাণ জলময়, জল পান করিলে প্রাণ বিয়োগ হবে না। "স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমূপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি"।। (ছা. উ. ৬/৭/২) অর্থাৎ শ্বেতকেতু পনেরদিন ভোজন না করে পিতার নিকট গিয়ে বললেন—'পিতা, আমি কি বলিব?' পিতা বলিলেন, 'ঋক্, যজু ও সাম মন্ত্র উচ্চারণ কর,' শ্বেতকেতু বললেন—ঐ সব আমার মনে পড়ছে না। পিতা তাঁকে বললেন ভোজন কর, পরে আমার কথা বুঝতে পারবে। পরের সূত্রে বলা হয়েছে, "স হাশাথ হৈনমূপসসাদ তং হ যৎ কিংচ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে"।। (ছা. উ. ৬/৭/৪) অর্থাৎ শ্বেতকেতু ভোজন করে পিতার কাছে গেলে, পিতা তাঁকে যা

কিছু বললেন সে সবই তিনি বুঝতে পারলেন। পিতা তাঁকে বললেন, তোমার ষোড়শ কলার এককলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তা অন্ন দ্বারা বর্ধিত হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে। তার দ্বারাই তুমি বেদ বুঝতে পারলে। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক তেজোময়ী। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, উপনিষদ সাহিত্যের রচনাকাল কয়েক হাজার বছর পূর্বে। সেখানে মন, চৈতন্য, স্মৃতির পার্থক্য যথার্থ ভাবে নাও থাকতে পারে। তাই হয়ত মন দিয়ে চেতনা জাতীয় সকল কিছুকে বোঝানো হত।

এখানে আরো একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। জয়ন্তভট্ট লোকায়ত মত খণ্ডন প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষ হিসাবে ভূতচৈতন্যবাদ সমর্থক যুক্তির অবতারণা করেছেন। যুক্তিটি ছিল—

> জ্ঞান ও শরীরের অন্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়ী। প্রায়ই দেখা যায়, অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ঠ শরীরে পট্টী (উৎকৃষ্ট) চেতনা হয় (অর্থাৎ, অন্নপানাদি দ্বারা শরীর পুষ্ট হলে চেতনাও উৎকর্ষ লাভ করে), এবং বিপরীত হইলে বিপরীত হয়। ব্রাহ্মীঘৃতাদি দ্বারা সংস্কৃত কুমারশরীরে পটুপ্রজ্ঞতা (উৎকৃষ্ট চেতনা) জন্মায়। ...চৈতন্যর গুরুলাঘব ব্যবহারও (অর্থাৎ, উৎকর্ষ-অপকর্ষও) ভূতাতিশয়ের সত্তা ও অসত্তা দ্বারা করা যাইবে (অর্থাৎ, ভূতাতিশয়ের বর্তমানতায় চৈতন্যর উৎকর্ষ এবং অবর্তমানতায় অপকর্ষ ঘটে)। অতএব, ভূতচৈতন্যবাদ পক্ষই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।[১৩]

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, জয়ন্তভট্ট প্রদত্ত এইরূপ যুক্তি *ছান্দোগ্য উপনিষদে* ঋষি উদ্দালক আরুণি কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা সেখানে বেদ বুঝতে পারা চেতনার উৎকর্ষের পরিচায়ক এবং বেদ বুঝতে না পারা চেতনার অপকর্ষের পরিচায়ক। এই

---

[১৩] *ন্যায়মঞ্জরী*, চৌখাম্বা সং., ২য় খণ্ড, পৃ ১৩

উৎকর্ষ অন্ন দ্বারা শরীর পুষ্ট হওয়ার ওপর নির্ভর করে এবং সেই পুষ্টির অভাবে চেতনার অপকর্ষও প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে উদ্দালক আরুণির মতবাদকে জয়ন্তভট্ট বর্ণিত পূর্বপক্ষ ভূতচৈতন্যবাদের সঙ্গে এক বলা যায়।

উপনিষদ সাহিত্যের আরও কিছু দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায় প্রাচীন উপনিষদ সাহিত্য অবিমিশ্রিত ভাববাদী নয়। সেখানে ব্রহ্মকে অন্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এখানে অন্ন বাহ্যজগতের বিষয়। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* বলা হয়েছে—'অন্নে হীমানি সর্বানি ভূতানি বিষ্টানি'। (বৃ. আ. উ. ৫/১২/১) অর্থাৎ অন্নেই সমস্ত প্রাণী নিহিত আছে। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'...মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে'। (১/৫/৩) অর্থাৎ মহ হল অন্ন। অন্নের দ্বারা সকল প্রাণ মহিমাণ্বিত হয়। উপনিষদের এই কথাগুলি আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। কারণ উপনিষদের যুগে ব্রহ্মই পরম সত্য হলেও নেহাত তুচ্ছ দৈনন্দিন বাহ্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে অতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র চিন্তার আধার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাহ্যবস্তু বা জড়বস্তুর গুরুত্বকে উপনিষদীয় ঋষি-মুনিরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেননি।

ছান্দোগ্য উপনিষদ-এর পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ খণ্ডে আত্মা সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়। ঔপমন্যব প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন এবং বুড়িল নামক পাঁচ বেদধ্যায়ী 'ব্রহ্ম কী' বা 'আত্মা কী' তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই সমস্যার সমাধান করতে তাঁরা উদ্দালক আরুণির কাছে গেলে তিনি তাঁদেরকে অশ্বপতি কৈকয়র কাছে পাঠালেন। ঋষি আরুণি সহ অন্য সকল মুনি অশ্বপতি কৈকয়র কাছে গেলে তিনি তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন, তাঁরা আত্মা রূপে কাকে উপাসনা করেন? উত্তরে ঔপমন্যব প্রাচীনশাল বলেন, দ্যুলোককে; সত্যযজ্ঞ বলেন আদিত্যকে; ইন্দ্রদ্যুম্ন

বলেন বায়ুকে ; জন ও বুড়িলের উত্তর ছিল যথাক্রমে আকাশ ও জলকে তাঁরা আত্মারূপে উপাসনা করেন। শেষে উদ্দালক আরুণি কৈকয়র প্রশ্নের উত্তরে বলেন—রাজন, আমি পৃথিবীকে আত্মারূপে উপাসনা করি। লক্ষণীয় বিষয় হল সকলেই আত্মাকে বস্তুজাগতিক বিষয়সমূহের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। তাঁরা বস্তু অতিরিক্ত কোনও সত্তা হিসাবে আত্মাকে স্বীকার করেননি। তাই উপনিষদকে কেবল অবিমিশ্রিত ভাববাদী দর্শন বলে না বুঝে বরং তাকে ভাববাদ ও বস্তুবাদ নামক দুটি বিপরীত মতের সমন্বয় বলে মনে করা যেতে পারে।

পরবর্তী কালে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের অজিত কেশকম্বল বা কেশকম্বলীকে ভারতীয় বস্তুবাদের সমর্থক বলে উল্লেখ করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন রচনায় এঁর কথা আছে। কেশকম্বলী অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না। পৃথিবীর সবকিছুকে চারটি ভূত—অগ্নি, বায়ু, মাটি ও জল—এদের মিলনে গঠিত বলে মনে করতেন।[১৪] তিনি ঈশ্বর, পরলোক, ধর্ম-কর্ম, দান-ধ্যান ইত্যাদির বিরুদ্ধেও প্রচার করতেন। তাই তাঁকেও বস্তুবাদী দার্শনিক বলা যায়। জৈন ধর্মগ্রন্থ *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র*-য় বস্তুবাদের দুটি ধারার কথা আছে—তজ্জীবতচ্ছরীরবাদ (যা আত্মা তাই দেহ—দেহ ছাড়া অক্ষয় আত্মা বলে কিছু নেই) এবং ভূতবাদ (সবই পঞ্চভূতে গড়া)।[১৫] অজিত কেশকম্বলীর মতবাদে এই দুটি মতবাদ একসঙ্গে দেখা যায়। পরবর্তীকালে মাধবাচার্যের *সর্বদর্শন সংগ্রহ* গ্রন্থে 'চার্বাক দর্শন' নামক পরিচ্ছেদে কতকগুলি লোকগাথার উল্লেখ আছে, যেখানে চার্বাক বা লোকায়ত মতের একই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে।[১৬] অর্থাৎ শুধুমাত্র মাটি, জল,

---

[১৪] সামঞ্ঞফলসুত্ত', *দীর্ঘনিকায়,* ১: ৬১।

[১৫] মুনি জম্বুবিজয় পুনঃসম্পা, *সুত্রকৃতাঙ্গসুত্র,* পৃ ১৮৫, ১৮৮

[১৬] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে,* পৃ ১০৮

অগ্নি, ও বায়ু চারটি ভূতদ্রব্য বর্তমান। এই চারপ্রকার ভূত বস্তু থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। তাঁদের মতে, চৈতন্য দেহের গুণ বা দেহের ধর্ম। কিন্তু অচেতন জড় বস্তু দিয়ে গঠিত দেহ কীভাবে চৈতন্য বিশিষ্ট হয়? তার উত্তরে বলা হয়—'কিণ্ব-অদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ'। অর্থাৎ যেমন ভাবে কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি থেকে মদশক্তি উৎপন্ন হয় তেমনই ভাবে এই চারটি ভূত বস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন। চার্বাকদের এই মতবাদকে দেহাত্মবাদ বলা হয়। আবার অগ্নি, বায়ু, জল ও মাটি প্রভৃতি জড় বস্তু থেকে কীভাবে চেতনা বা চৈতন্যের উৎপত্তি হয়? তার উত্তরে বলা হয়, মদ্য প্রস্তুতের উপাদানগুলি যেমন তেমন ভাবে একসঙ্গে মিলিত হলে মদ উৎপন্ন হয় না। এই উপাদানগুলির বিশেষ একটি পরিণামের ফলেই মদ উৎপন্ন হয়। তেমনি ভাবে চর্তুভূতগুলির বিশেষ এক পরিণামে চৈতন্য বা চেতনা উৎপন্ন হয়। জয়ন্তভট্ট স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, "বিশেষ পরিণামের ফলে জড় পদার্থগুলিই কোনোরকম বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হলে সেগুলিতেই জ্ঞান বা চৈতন্য উৎপন্ন হয়; যেমন গুড় পিষ্ট প্রভৃতিতে আগে মদ শক্তির পরিচয় না থাকলেও সেগুলিই সুরাকারে পরিণত হলে মদ শক্তি লাভ করে। তেমনি ভূত বস্তুগুলি মাটি প্রভৃতি অবস্থায় অচেতন হলেও সেগুলি দেহাকারে পরিণত হলে চৈতন্য বিশিষ্ট হয়।"[১৭] তাঁদের মতে, চর্তুভূতগুলির স্বভাব দ্বারা বিশেষ পরিস্থিতিতে সেগুলি দেহাকারে পরিণত হয়। এই চর্তুভূতগুলির স্বভাব হল বিশেষ পরিস্থিতিতে দেহাকারে পরিণত হওয়া। তাই বলা যায় চর্তুভূতগুলি মিলিত হয় তাদের স্বভাব দ্বারা। যখন সেগুলি দেহাকারে পরিণত হয় তখন সেখানে চেতনার উদ্ভব হয়। এইভাবে বস্তুবাদী চার্বাকেরা ভূত বস্তু থেকে চেতনার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। চার্বাকদের এই মতবাদ স্বভাববাদ নামে পরিচিত।

---

[১৭] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পৃ ১১৩

চার্বাক বস্তুবাদী মতের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রত্যক্ষপ্রাধান্যবাদ। তাঁরা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে স্বীকার করার সঙ্গেই লৌকিক বিষয় বা ইহলৌকিক প্রত্যক্ষগোচর অনুমানকেও বৈধ বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরলৌকিক অপ্রত্যক্ষ বিষয় যেমন- স্বর্গ, নরক, ইত্যাদি বিষয়ক অনুমানকে অস্বীকার করেন। আসলে বস্তুবাদী চার্বাকদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রাধান্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তৎকালীন সময়ে শ্রুতি, স্মৃতির দোহাই দিয়ে মানুষকে বোঝানো হয়েছিল যে প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানের গুরুত্ব নেহাতই গৌণ বিষয়। আসলে যাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না বা সাধারণ অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না, তাই আসল সত্য। বাস্তব জগত হল মিথ্যা বা মায়ার আশ্রয়। কেবলমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যার সাহায্যে সেই পরম সত্যের উপলব্ধি হয়। এই পরম সত্যের সঙ্গে বাস্তব জগতের কোনও সম্বন্ধ নেই। তাই আমাদের সকলের উচিত পরম সত্যের উপলব্ধির জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা। এই চরম ভাববাদী মতের বিরুদ্ধে গিয়ে চার্বাকেরা দাবী করলেন, যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগত সর্বত ভাবেই সত্য। তাই এরূপ মতকে চার্বাক বস্তুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যে শুধুমাত্র চার্বাকেরা বস্তুবাদী ছিলেন তা কিন্তু নয়। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁদের মতামত সরাসরিভাবে বস্তুবাদী না হলেও বস্তুবাদ সমগোত্রীয়। বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কণাদ বলেছেন, প্রত্যেক পদার্থই নানা অংশে বিভক্ত; পরস্পরের সঙ্গে মিলনে ও মিশ্রণে তারা সক্রিয়। কিন্তু ভাগ হতে হতে যখন আর ভাগ করা যায় না তখন সেই অবিভাজ্য পদার্থকে অণু বলা হয়। একই জাতীয় অণুর সংমিশ্রণে পদার্থ সৃষ্টি হয়, কারণ অণুর মধ্যেই মিশ্রণের ও সৃষ্টির গুণ বর্তমান। এই অণুগুলি পরস্পর মিলিত হয়েই যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। মহর্ষি কণাদের এই মতবাদ পরমাণুবাদ নামে খ্যাত। মহর্ষি কণাদ

বর্ণিত এই পরমাণুবাদে অণু বা পরমাণুগুলি প্রকৃতপক্ষে জড়বস্তু। এই জড়বস্তুর স্বীকৃতি বস্তুবাদী দর্শনের অনুরূপ ব্যাখ্যা। কণাদের তত্ত্বে অধিবিদ্যার আলোচনায় নিত্য চেতনাযুক্ত জীবাত্মার কোনও স্থান ছিল না। চেতনা আত্মার কোনও অনুস্যূত ধর্ম নয়, তা তার আগন্তুক গুণ। কিন্তু কণাদের তত্ত্বে জগৎ অচেতন।

সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কপিল বস্তুগত উৎস থেকে জগতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা জগৎকে প্রকৃতির ক্রমবিকশিত অবস্থা বলে দেখেছিলেন, যেখানে সৃষ্টি ও ধ্বংসকে ব্যক্ত-অব্যক্ত অবস্থার রূপান্তর বলে দাবী করা হয়েছে। সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত অচেতন তত্ত্বকে সাধারণ কথায় ম্যাটার বলা যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে এই দর্শনে পুরুষ নামক একটি সচেতন পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে, যা উদাসীন ও অপ্রধান। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুখলালজী সাংভী দাবী করেন, "চরক সংহিতায় সাংখ্য দর্শনের প্রাচীনতর কোনও সংস্করণের পরিচয় বর্তমান, এবং সেই সংস্করণের প্রকৃতি থেকেই পুরুষের উৎপত্তি—অতএব অচেতন পদার্থ থেকে চেতন পদার্থের উৎপত্তি।"[১৮] সুতরাং তাঁদের দাবী মতো এটাই মনে করা যেতে পারে সাংখ্য দর্শনের আদি কোনও রূপ বর্তমান ছিল যেখানে কেবলমাত্র প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই আদি রূপের পরিবর্তন হয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংখ্য দর্শনের আদি রূপের পরিবর্তন কেন হল সে প্রশ্নে না গিয়ে আমরা শুধু বলতে পারি সাংখ্য দর্শনের যে আদিরূপ ছিল সেখানে যে দাবী করা হয়েছিল তা প্রত্যক্ষভাবে বস্তুবাদ না হলেও বস্তুবাদের সমগোত্রীয়।

---

[১৮] চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতের বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, পৃ ১৩০

আবার ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনকে বিচার বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দাবী করেন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মা স্বীকৃত হলেও তা চেতন পদার্থ হিসাবে স্বীকৃত নয়। এমনকি আত্মায় চৈতন্য নামক গুণটি নিত্যও নয়। তা আসলে জন্য গুণ। অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং চেতন নয়। নির্দিষ্ট একটি পরিবেশে আত্মার মধ্যে চৈতন্য নামক গুণের উদ্ভব ঘটে। সেই নির্দিষ্ট পরিবেশ হল বিশেষ কতকগুলি অবস্থার সমাহার। যেমন, 'আত্মার সঙ্গে দেহের সংযোগ, দেহের মাধ্যমে অন্তঃ-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, অন্তঃ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহিঃইন্দ্রিয়গুলির সংযোগ, বহিঃ-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিষয় বা বাহ্য বস্তুর সংযোগ। এই অবস্থাগুলির সমাবেশ ঘটলে তবেই আত্মায় চৈতন্য নামক গুণের সমাবেশ হয়। এই সংযোগ পরম্পরার অভাবে আত্মা তার স্বীয় স্বভাব অনুসারে যে জড়বস্তু সেই জড়বস্তু থেকে যায়। তা যেন মাটির ঢেলা বা কাঠের টুকরো, যার মধ্যে চৈতন্য নামক কোনও গুণের অস্তিত্ব থাকে না'[১৯]। আমরা জানি যে ন্যায় মতে বহিঃইন্দ্রিয় এবং বিষয় বা বাহ্য বস্তুর উপাদানগুলি পঞ্চভূত নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত নিয়ে বিষয় ও বহিঃরিন্দ্রিয় গঠিত। তাহলে বলা যেতে পারে এই পঞ্চভূতের অভাবে কখনই চৈতন্যের উদ্ভব সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি বস্তুবাদের সরাসরি দাবী এখানে না থাকলেও তার একটা স্পষ্ট প্রভাব এখানে রয়েছে।

অন্যদিকে বৌদ্ধ দর্শনকে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। কেননা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ বিশেষ মতবাদকে অস্বীকার করে এখানে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়। উপনিষদীয় চিন্তা ভাবনা যেমন, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতিকে অস্বীকার করে বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্টকে তাঁরা দূর করতে

[১৯] তদেব, পৃ ১৩০

চেয়েছিলেন। তাঁরা বেদ স্বীকৃত যাগ-যজ্ঞাদির প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকার করা হল আত্মার উৎপত্তি জীবন থেকে; আত্মা থেকে প্রাণের উৎপত্তি নয়। তথাকথিত নিত্য আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে কেবল স্কন্ধ সমূহের সমাহার হিসাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। এই স্কন্ধ সমূহ হল রূপ, সংজ্ঞা, বেদনা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। এখানে রূপ হল স্থূল বিষয়, যা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ রূপ চারটি মহাভূতের সমন্বয়ে গঠিত। এই চারটি মহাভূতের সঙ্গে অন্য চারটি স্কন্ধ যুক্ত হয়ে আত্মা গঠিত। বৌদ্ধধর্মে এই চতুর্ভূতগুলির স্বীকৃতিতে আসলে বস্তুবাদের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ বলতে শুধু যে চার্বাক মতবাদকে বোঝায় তা নয়। উদ্দালক আরুণির মতবাদ থেকে শুরু করে আদি সাংখ্য মতবাদের মধ্যেও বস্তুবাদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুবাদের মধ্যেও বস্তুবাদের একটি ইঙ্গিত আছে। সুতরাং বলা যায় যে চার্বাক ছাড়া উপনিষদের ঋষি আরুণি থেকে আরম্ভ করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী বক্তব্য না হলেও সেখানে বস্তুবাদ সমগোত্রীয় দাবীগুলি করা হয়েছে। এই প্রাচীন বস্তুবাদী মতকে আমরা আধুনিক বস্তুবাদের সঙ্গে সদৃশ বলে মনে করতে পারি কিনা সে প্রশ্ন ভিন্ন। তবুও এই দাবী করা যায় যে প্রাচীন বস্তুবাদী মতবাদটি আত্মাকে অস্বীকার করে জড়দেহকে চূড়ান্ত সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এই মতবাদীরা স্বর্গ, ঈশ্বর প্রভৃতিকে মনুষ্য কল্পনা বলে ত্যাগ করেছিলেন। বেদ ও শ্রুতির প্রামাণ্যকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে বৈদিক যাগযজ্ঞকে প্রবঞ্চনামূলক বলে প্রচার করেছিলেন। তাই বলা যেতে পারে, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্য মোক্ষশাস্ত্র বা অধ্যাত্মবিদ্যা বলে বর্ণিত হলেও তার বস্তুবাদী প্রবণতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় না।

প্রাচীন গ্রীক দর্শনে বস্তুবাদী চিন্তার বিকাশ

ভারতীয় দর্শনের মতো পাশ্চাত্য দর্শনেও বস্তুবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘ। গ্রীসের আদি-বিদ্বান থেলসের (মতান্তরে থেলিস) মতবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে যে বস্তুবাদের চর্চা শুরু হয়েছিল আধুনিক কালে কাল মার্কস পর্যন্ত সেই ধারা বিস্তৃত। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় দর্শনের উত্থানের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতায় বস্তুবাদী ধারা স্থিমিত হলেও রেনেসাঁ আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ধারা পুনরায় জাগ্রত হয়েছিল। রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পুনরায় বস্তুবাদের আলোচনা শুরু হয়। তাই এবার আমরা পাশ্চাত্য দর্শনে আলোচিত বস্তুবাদের ধারার উল্লেখ করব।

এশিয়ার মাইনরের পশ্চিম সীমান্তে আইওনিয়া রাজ্যের মাইলেটাস (Miletus) নগরে গ্রীক দর্শন চিন্তার সুত্রপাত হয়েছিল। এই শহরের নামানুসারে সেখানকার দার্শনিককে মাইলেসীয় দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়। এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটে বস্তু জগতকে কেন্দ্র করে। তাঁদের দার্শনিক আলোচনার মূল প্রশ্ন ছিল দুটি—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল তত্ত্বের স্বরূপ কী? কীভাবে স্থায়ী মূল জগত থেকে দৃশ্যমান বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উৎপত্তি হয়েছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি তাঁরা যেভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন সেটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রশ্নগুলি থেকে মানব মনের স্বাভাবিক কৌতূহল প্রবণতার ইঙ্গিত মেলে। এই মতানুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ প্রকৃত জগৎ নয়। বস্তু যে রূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয় তা এবং তার স্বরূপগত সত্তা এক নয়। তবে তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অলীক বা মিথ্যা বলেননি। বিশ্বের আদি কারণ কী এবং কীভাবে সেই সত্তা থেকে এই বাস্তব জগতের উৎপত্তি হয়—এই প্রশ্নের উত্তর পাশ্চাত্য দর্শনে মাইলেসীয়

দার্শনিক ত্রয়ীর দ্বারা প্রথম সূচিত হয়। এই দার্শনিকগণ হলেন থেলস বা থেলিস (Thales), এনাক্সিম্যান্ডার (Anaximander) ও এনেক্সিমিনিস (Anaximenes)।

পাশ্চাত্য দর্শনের সূচনা হয় থেলিসের চিন্তাভাবনাকে অবলম্বন করে। তাই তাঁকে 'ফাদার অফ ফিলোসফি' বলে অভিহিত করা হয়।[২০] পাশ্চাত্য দর্শনে তিনিই প্রথম স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তা ভাবনা দিয়ে জগতের আদি বস্তু কোনটি তা বোঝার চেষ্টা করেন। থেলিস জলকে বিশ্বের মূল উপাদান বলে স্বীকার করেছেন। কারণ জল থেকে যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং জলেই সমস্ত কিছুর পরিণতি প্রাপ্তি ঘটে। জলই একমাত্র বস্তু যা অতি সহজেই কঠিন, তরল এবং বায়বীয়—এই তিনটি অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে। জলকে যখন গরম করা হয় তা অতি সহজে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাকে ঠাণ্ডা করার সঙ্গে সঙ্গে তা কঠিন বরফে পরিণত হয়। যে কোনও জীবের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য জল আবশ্যক উপাদান। বাষ্পীভবনের সাহায্যে সূর্য প্রথমে জলকে গ্রহণ করে পরে সেই জলই বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। সেখান থেকে প্রথমে কাদায় এবং পরে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। এই মাটি থেকে আবার বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয় বলে থেলিস মনে করতেন। সুতরাং জলই জগতের মূল তত্ত্ব এবং বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্য এই জলেরই বিভিন্ন রূপ। অ্যারিষ্টটলের মতানুসারে, "Thales choose water to be the ultimate stuff, for food is always wet and this liquid food nourishes the body. Even the generating seeds are wet."[২১] ফলে বলা যায় বিশ্বজগতের উৎপত্তি বিষয়ে থেলস প্রথম কোনও জড় পদার্থকে স্বীকার করেছিলেন; জগৎ উৎপত্তি বিষয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনও শক্তির কথা অস্বীকার করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে থেলিসের এই তত্ত্বের

---

[২০] Roy, M.N., *Materialism*, p.94

[২১] Masih, Y., *A Critical History of Western Philosophy*, p.4

মধ্যে কোনও নতুনত্ব আছে বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা পদ্ধতির মধ্যে যে নতুনত্ব আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। পুরাণের প্রমাণহীন বর্ণনাগুলিকে তিনিই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন।

থেলসের পরবর্তী দার্শনিক হলেন এনাক্সিম্যান্ডার (Anaximander)। তিনি জল বা বিশেষ কোনও বস্তুকে জগতের উপাদান বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, সকল বস্তুর উৎস একটি আদিম পদার্থ (Primal substance), কিন্তু তা আমাদের পরিচিত কোনও বস্তু নয়—সে পদার্থ অনাদি, অনন্ত ও কালাতীত এবং জগৎসমষ্টিকে ঐ পদার্থ পরিবেষ্টন করে থাকে। এই আদিম পদার্থ যে জগতের বস্তুগত কারণ (material cause) তা গ্রীক দার্শনিক থিওফ্রাস্টাসের (Theophrastus) বক্তব্যেও স্পষ্ট।[২২] তিনি বহু জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তবে সেই জগৎগুলিসহ অবস্থান করে না ক্রম অনুসারে উদ্ভূত হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি পৃথিবীকে কেবলমাত্র একটি জগৎ না বলে অসংখ্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে একটি বলে মনে করতেন। এনাক্সিম্যান্ডারের মতে, এই আদিম পদার্থ আমাদের পরিচিত নানা বস্তুতে রূপান্তরিত হয় এবং একে অপরের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাঁর মতে, এই আদিম পদার্থ জল হতে পারে না কিংবা অন্য কোনও জ্ঞাত মৌল পদার্থ হতে পারে না। এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, পরস্পর বিরোধী জ্ঞাত মৌলগুলির কোনও একটিকে কখনই মূল উপাদান বলে স্বীকার করা যায় না। কেননা মূল উপাদান সর্বদাই অন্য বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু মৌলবস্তুগুলি পরস্পর বিরোধী ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় এই অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। যেমন, বায়ু শীতল, জল সিক্ত এবং অগ্নি উষ্ণ। সুতরাং এগুলির

[২২] Coplestone, F., *History of Philosophy Greece and Rome*, p. 24

কোনও একটি প্রাথমিক উৎস হলে অন্য পদার্থগুলির বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল পদার্থ অবশ্যই নিরপেক্ষ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এই অসীম পদার্থের গতি চিরন্তন বলে অসীম সত্তা থেকে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সৃটি হয়। মানবজাতির বিবর্তন সম্পর্কেও এনাক্সিম্যান্ডার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদ্‌দের মতো আকস্মিকতাবাদে বিশ্বাস না করে বিবর্তনবাদে বিশ্বাস রেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, সূর্যতেজে বাস্পীভূত সিক্ত উপকরণ থেকে জীবকূলের উৎপত্তি ঘটে। মানুষের আদি পুরুষ হল মাছের মতো অপর এক শ্রেণীর প্রাণী। একথা প্রমাণ করার জন্য তিনি রীতিমত আধুনিক যুক্তি প্রদান করেছিলেন। যুক্তিটি হল: অন্যান্য প্রাণী জন্মের অব্যবহিত পরেই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেও মানুষের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা যায় না। মানব শিশু জন্মের পরে অনেকদিন স্তন্যপান করে, অনেকদিন অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাই মানুষের উৎপত্তি মানুষ থেকে হলে সে কোনওভাবেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারত না। তাই তিনি মনে করেন, আদিতে মানুষ মাছের মত বিশেষ এক অবস্থায় জলে বসবাস করত। এইভাবে অনেকদিন থাকার পরে যখন তারা আত্মরক্ষার উপযুক্ত হল তখন তারা সমুদ্রের তীরে নিক্ষিপ্ত হল এবং স্থলে বসতি স্থাপন করতে শিখলো।[২৩] এভাবেই এনাক্সিম্যান্ডার মানুষের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ক্রমবিকাশের বিবর্তন ধারার তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন বলে অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন। মানুষকে কোনও ঈশ্বরের পুত্র না বলে জগৎ বিবর্তনের মাধ্যমে সে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে এমন একটি ইঙ্গিত আমরা এনাক্সিম্যান্ডারের ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করি।

[২৩] ইসলাম, আমিনূল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, পৃ. ৪৫

মাইলেসীয় দর্শনের সর্বশেষ দার্শনিক হলেন এনেক্সিমিনিস (Anaximenes খ্রি.পূ. ৫৮৮-৫২৪)। তিনি এনাক্সিম্যান্ডারের শিষ্য ও বন্ধু হলেও তাঁর সূক্ষ্ণ ও সীমাহীন মূলবস্তুর ধারণাকে স্বীকার করেননি। কারণ এনাক্সিম্যান্ডারের মতে এই সীমাহীন মূলবস্তু সম্পূর্ণভাবে নির্বিশেষ ও অতীন্দ্রিয় সত্তা। বিপরীতে এনেক্সিমিনিস এমন এক সত্তার কথা স্বীকার করলেন যাকে অভিজ্ঞতায় জানা যায়। তাঁর মতে, বায়ু হল জগতের মূল উপাদান, কারণ জীবনধারণের জন্য বায়ু একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। বায়ু অগ্নি, বাষ্প প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বায়ুকে স্পর্শ ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি তা তরল বা কঠিন আকার ধারণ করতে পারে। বায়ু শুষ্ক ও উষ্ণের মধ্যবর্তী; আবার শীতল ও সিক্তের মধ্যবর্তী। বায়ু অসীম, এর কোনও দৈশিক সীমা নেই। কিন্তু বায়ু থেকে জগতের যাবতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি হয় কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বায়ুর দুটি অবস্থার কথা বলেছিলেন। যথা সূক্ষ্মীকরণ অবস্থা (rarefaction) ও স্থূলীকরণ অবস্থা (condensation)। এই অবস্থা দু'টি থেকে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়েছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। সূক্ষ্মীকরণের মাধ্যমে বায়ু হালকা হয়ে ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে যেমন অগ্নিতে পরিণত হয়, তেমনি ঘণীভূত বায়ু থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়[২৪]। বায়ুকে তিনি 'ঐশ্বরিক' বলে বর্ণনা করেছেন। তবে ঐশ্বরিক বলতে তিনি কোনও দেব-দেবীকে বোঝাতে চাননি। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি উচ্চতর নীতি বা তত্ত্ব রূপে বায়ুকে গ্রহণ করেছিলেন, যার দ্বারা জাগতিক সমস্ত পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়।

[২৪] Copleston, Frederick, *A History of Philosophy Greece and Rome*, p. 26

মাইলেসীয় দার্শনিক ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা কোনও সনাতনী আর্ফিক ধর্মমত[২৫] (Orphism) মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে জগৎ উৎপত্তি বিষয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ে এই চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে যখন প্রশ্ন ওঠে যে মাইলেসীয় দার্শনিক ত্রয়ী বিশ্ব জগতের উৎস রূপ যে জল, বায়ু বা কোনও নির্বিশেষ পদার্থকে মৌল উপাদান বলে স্বীকার করেন। সেই সব মৌল পদার্থ থেকে জগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হয় কিভাবে? কারণ এই মূল পদার্থ থেকে উৎপাদিত যাবতীয় পদার্থের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। প্রধান মৌল পদার্থ থেকে উৎপাদিত বস্তুর স্বভাব ভিন্ন হলে তাকে কি প্রকৃত রূপান্তর বলা যায়? কীভাবে মূল মৌল পদার্থ থেকে জাগতিক পদার্থের রূপান্তরের পরেও তা মূল মৌল পদার্থের সঙ্গে অভিন্ন থেকে যায়—এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে মাইলেসীয় দার্শনিক ত্রয়ীর পরবর্তী দার্শনিকগণ আলোচনা শুরু করেন।

প্রাচীন গ্রীসে আনুমানিক ৫৩৫ খ্রি.পূর্বাব্দে দার্শনিক হেরাক্লিটাসের (Heraclitus) আবির্ভাব হয়। তিনি জগতের মূল বস্তু বলে অগ্নিকে স্বীকার করেন। সেই সঙ্গে জগতে স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, স্থায়ী দ্রব্য বলে জগতে কিছু নেই। দ্রব্য মাত্রই অনিত্য, চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। বস্তুমাত্রই গতিশীল স্রোতের মতো প্রবহমান। পরিবর্তন বা গতিই হল সত্য। কোনও কিছু স্থির নয়, সবকিছুই পরিবর্তনশীল। স্থির নিশ্চল সত্তা বা অপরিবর্তনীয় বিশ্ব উপাদান বলে কিছু নেই। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ‘একই নদীতে দু’বার স্নান করা যায় না’। কারণ প্রতি মুহূর্তেই নদীতে নতুন জল প্রবাহের

[২৫] ধর্ম দর্শন ভিত্তিক একধরনের আধ্যাত্মিক আন্দোলন, যা খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে আত্মা অমর, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম, পূণ্য-পাপ নিয়ে চর্চা হত।

আবির্ভাব ঘটছে। তাঁর মতে, জগতের আদি পদার্থ হল অগ্নি যা কোনও ঈশ্বর বা মানব সৃষ্ট নয়। “Fire,...,is want and surfeit—it is, in other words, all things that are, but it is these things in a constant state of tension, of strife, of consuming, of kindling and of going out.”[২৬] তিনি অগ্নিকে আদি উপাদান বলেছেন কারণ অগ্নি পরিবর্তনের প্রতীক। অগ্নি নিরন্তন ধূমে রূপান্তরিত হয়। অগ্নি শিখায় সকল দ্রব্যের রূপ পরিবর্তন ঘটে। তাই জগতের কোনও কিছু স্থায়ী বা চূড়ান্ত নয়। সমস্ত কিছুই ওঠাপড়া ও ভাঙাগড়ার অধীন। সব কিছুর সৃষ্টি আছে, আবার সমস্ত কিছুর অবসানও আছে। হিরাক্লিটাসের ডায়লেকটিক সূত্র পরবর্তী কালে দার্শনিক হেগেল দ্বারা উপস্থাপিত হয়।[২৭] হেরাক্লিটাসের মতে, পরিবর্তনের ধারা অবাধ কিংবা নিয়ন্ত্রণহীন নয়, তা কতকগুলি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি মনে করেন, বিরুদ্ধভাবাপন্ন শক্তির দ্বন্দ্বই হল পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ। দুটি বিরুদ্ধ শক্তির একটি উর্ধ্বমুখী, অপরটি নিম্নমুখী। উর্ধ্বমুখী শক্তির ফলে অগ্নি পর্যায়ক্রমে বাষ্প, জল ও মাটিতে পরিবর্তিত হয়। নিম্নমুখী শক্তির ফলে সমস্ত পদার্থ মাটি থেকে অগ্নিতে পরিণত হয়। কপলস্টোনের কথায়,

> when fire is condensed it becomes moist, and under compression it turns to water; water being congealed is turned to earth, and this is called the downward path. And again, the earth is itself liquefied and from it water comes, and from that everything else; for he refers almost

[২৬] Coplestone, Frederick, *A History of Philosophy Greece and Rome*, p.41

[২৭] Roy, M.N., *Materialism*, p. 97

everything to the evaporation from sea. This is the upward path.[২৮]

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে এই উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমখী শক্তি একে অন্যের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। হেরাক্লিটাসের ভাষায়, এ যেন একটি চিরঞ্জীব অগ্নির এক অংশের প্রজ্বলিত হওয়া এবং অপর অংশ নির্বাপিত হয়ে যাওয়া। গতির এই বিরোধ ও ভারসাম্য আমাদের মনে স্থায়িত্বের ধারণা সৃষ্টি করে। কোনও অভেদ ও স্থায়ী উপাদানের সমন্বয়ে নয়, একই অভিমুখে চালিত গতিতে হারিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যাগত গতিতে এর ক্ষতিপূরণের মধ্যে যে সারাংশটুকু থাকে, সেটি থেকে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়।[২৯] হেরাক্লিটাসের মতে, বস্তুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনের নিয়মের প্রতি আনুগত্য। তিনি পরিবর্তনের নিয়মের প্রতি যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের চিন্তা যে ঐক্য ও স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করে তা কি ঐ নিয়মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ? এই নিয়ম কি কেবলমাত্র মন নির্ভর আদর্শ মাত্র? যদি সেই নিয়মগুলি কেবল মন নির্ভর আদর্শ মাত্র হয় তাহলে সেগুলি বস্তুজগতে কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। আবার যদি এই নিয়মগুলি কেবল জড় সম্বন্ধীয় হয় তবে অসংখ্য জড়বস্তুর পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাদের নিজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য বিধান আবশ্যক হবে। তাই এই সার্বিক পরিবর্তন ও ঘটনা প্রবাহ ব্যাখ্যার জন্য একটি স্থায়ী সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন হয়। যার দ্বারা জাগতিক সকল বস্তুর ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ হয়। সেজন্য হেরাক্লিটাসের অস্থায়ী সত্তার বিরোধিতা করে এলিয়াটিক দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

---

[২৮] op.cit p. 41

[২৯] ইসলাম, আমিনূল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, পৃ. ৫৯

হেরাক্লিটাসের পরবর্তীকালে পারমেনাইডিস (Parmenides, খ্রি.পূ. ৪৫০) নামক এক বিখ্যাত এলিয়াটিক চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মনে করেন, যেহেতু কোনও দ্রব্য একই সঙ্গে একই সময়ে আছে এবং নেই এমন হতে পারে না সেহেতু এই বিশ্বে পরিবর্তন বলে কোনও কিছু নেই। কপলস্টোনের ভাষায়, “if anything comes to be, then it comes either out of being or out of not-being. If the former, then it already is—in which case it does not come to be; if the later , then it is nothing, since out of nothing comes nothing.”[৩০] এই যুক্তিটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়— সত্তার যদি উদ্ভব হয় তাহলে তা কোনও সত্তা থেকে অথবা অসত্তা থেকে উদ্ভূত। যদি তা অসত্তা থেকে উদ্ভূত হয় তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে তা আসলে শূন্য থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তা অসম্ভব কারণ অসত্তা বা শূন্য থেকে কোনও কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না। অসত্তা কখনই সত্তার উদ্ভবের কারণ নয়। আবার বস্তুটি যদি সত্তা থেকে উৎপন্ন হয় তাহলে বলতে হবে তা আসলে নিজ থেকেই উৎপন্ন। অর্থাৎ তা পূর্বেই অস্তিত্বশীল ছিল। তাকে নতুন সৃষ্টি বলা যায় না। যা আছে তা সদা অস্তিত্বশীল। এইদিক থেকে বলা যায় শুধুমাত্র একটি অনন্ত বিকারহীন সত্তা আছে—যা নিরবকাশ, অবিভাজ্য, অচঞ্চল ও গতিহীন। পারমেনাইডিস সত্তাকে একটি সমতাত্ত্বিক, নিরবকাশ ও অনির্দিষ্ট স্বভাবের পিণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। পারমেনাইডিস স্বীকৃত এই সত্তা আসলে জড়। তিনি একটি অদ্বৈত জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে যাবতীয় পরিবর্তন ও গতি অলীক বলে প্রতিপন্ন হয়। তাঁর মতে, সত্য কেবল বুদ্ধিগম্য। আর বুদ্ধি কেবল জড়কেই জানতে সমর্থ। কপলস্টোন তাঁর *History of Philosophy* গ্রন্থে বলেন,

[৩০] Coplestone, Frederick, *History of Philosophy Greece and Rome*, p.48

> The truth really seems to be that though Parmenides does assert the distinction between Reason and Sense, he asserts it not to establish an idealist system, but to establish a system of Monistic Materialism, in which change and movement are dismissed as illusory. Only Reason can apprehend Reality, but the Reality which Reason apprehends is material. This is not idealism but materialism.[৩১]

অর্থাৎ পারমেনাইডিস এক অদ্বৈত বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যেখানে পরিবর্তন মাত্রেই অসত্তা ও অর্থহীন। তাই পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সত্তা নয়, তা অধ্যাস বা ভ্রম মাত্র। যথার্থ জ্ঞান অর্জন তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ হতে পারে না। সার্বভৌম সর্বজনীন প্রজ্ঞাই কেবল যথার্থ জ্ঞানের উৎস। সত্তার সঙ্গে প্রজ্ঞার সাদৃশ্য আছে। যা প্রজ্ঞা সম্মত নয় অর্থাৎ চিন্তার সঙ্গে যার বিরোধ তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

পারমেনাইডিসের এমন যুক্তির উত্তর পাওয়া যায় এম্পেডোক্লিসের (Empedocles খ্রি.পূ. ৪৯০-৪৩৫) মতবাদে। তিনি দাবী করলেন, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা থাকলেও জ্ঞান অনুসন্ধানের মাধ্যম রূপে ইন্দ্রিয়ের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এম্পেডোক্লিস তাঁর বিশ্বতত্ত্বে পারমেনাইডিসের একক অসীম নিত্য সত্তার পরিবর্তে মাটি, বায়ু, অগ্নি ও জল—এই চারটি মৌল উপাদান স্বীকার করেন। এই চারটি মৌল পদার্থের সমন্বয়েই যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় বলে তিনি দাবী করেন। এই সমস্ত মৌল পদার্থগুলি

---

[৩১] ibid, Vol. I. p.49

নিত্য, অসৃষ্ট, অবিনশ্বর ও পরিবর্তনরহিত। এই চারটি মৌল পদার্থ থেকে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় বলে এদেরকেই মূল পদার্থ (the roots of all) বলে স্বীকার করা হয়। এম্পেডোক্লিস নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। সেই সময় গ্রীসের অধিবাসীরা সাধারণত জলঘড়ি ব্যবহার করতেন। একটি পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নির্গত হওয়ার সময়কাল অনুসারে সময়ের হিসাব করার প্রচলন ছিল। এম্পেডোক্লিস দেখালেন যে জল পড়ার ছিদ্রকে হাত দিয়ে বন্ধ করে রাখা সত্ত্বেও বাতাসের চাপে যে জল নির্গত হয় তা প্রমাণ করে যে অদৃশ্য বায়ুর ক্ষমতা আছে।[৩২] এম্পেডোক্লিস মনে করেন, মাটি কখনই জলে রূপান্তরিত হতে পারে না, আবার জলও কখনও মাটিতে রূপান্তরিত হয় না। আসলে তাঁর স্বীকৃত চারটি মূল পদার্থই অপরিবর্তনীয়। এই চারটি মূল পদার্থ একে অন্যের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যে স্থূল বস্তু গঠিত হয় তা পরিবর্তনশীল। উপাদানগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এই স্থূল বস্তুগুলি মূল ধ্বংস হতে পারে। কিন্তু মূল উপাদানের কখনোই পরিবর্তন হয় না।

এম্পেডোক্লিসের মতো আনাক্সাগোরাসও (Anaxagoras খ্রি.পূ. ৫০০-৪২৮) আদি উপাদানগুলিকে জগতের মূল বলেন। তবে তিনি কেবলমাত্র চারটি মৌল উপাদান স্বীকার না করে অসংখ্য মৌল উপাদান স্বীকার করেন। আনাক্সাগোরাসের মতে, "অসংখ্য বস্তু ও গুণের সমন্বয়ে গঠিত বিচিত্র পৃথিবীকে মাত্র চারটি উপাদানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা চলে না। তাছাড়া মাটি, বায়ু, অগ্নি ও জল মৌল উপাদান নয়, মৌল উপাদানের সমবায়ে গঠিত যৌগিক দ্রব্য।"[৩৩] জগতের এই মৌল উপাদানগুলি অতি সূক্ষ্ম, বহু ও অসংখ্য যাদের তিনি 'বীজ' নামে অভিহিত করেন। এই সকল বীজ অনাদি ও অপরিবর্তনীয়। এরা অন্য

---

[৩২] রাসেল, বার্ট্রাণ্ড, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথমভাগ,* অনুবাদ-দাশগুপ্ত, শত্রুজিৎ এবং শর্মিষ্ঠা রায়, পৃ.৬৯

[৩৩] ইসলাম, ড. আমিনুল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,* পৃ.৭৭

কোনও উপকরণ থেকে উদ্ভূত নয়। এদের গুণ ও পরিমাণের কোনও পরিবর্তন হয় না। এদের সঙ্গে যেমন নতুন গুণের সংযোগ ঘটে না, তেমনি পুরনো গুণেরও বিয়োজন হয় না। আনাক্সাগোরাসের মতে, সাধারণভাবে উৎপত্তি ও বিনাশ বলতে আমরা বুঝে থাকি এই সকল মৌল উপাদানগুলির সংযোগ ও বিয়োগ। প্রত্যেক দ্রব্যের মধ্যে সকল রকম উপাদান থাকে। কিন্তু যে দ্রব্যে যে উপাদানের প্রাধান্য অধিক, সেই দ্রব্যটি সেই গুণের অধিকারী রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন, যে দ্রব্যে তাপের উপাদান বেশি থাকে তা অগ্নি হিসাবে প্রকাশিত হয়। আবার যে দ্রব্যে শৈত্যের আধিক্য বেশি থাকে তা বায়ু হিসেবে প্রকাশিত হয়। পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে এই সকল জড় উপাদানগুলি মিশ্রিত হয়ে একটি পিণ্ড গঠন করেছিল। তখন ঐ জড় উপাদানগুলির মাঝে কোন শূণ্যদেশ ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হয়, ঐ জড় উপাদানগুলি সংযুক্ত হয় কীভাবে? জড় উপাদানগুলি সংযুক্ত হতে গেলে তাদের মধ্যে গতি স্বীকার করতে হয়। এই গতির সৃষ্টি করল কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি নউসকে (nous) স্বীকার করেন। এই নউস একটি চেতন সত্তা; জগতের যাবতীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলার উৎস। আসলে নউস স্বরূপত স্বতন্ত্র যা অন্য কোনও উপকরণের সঙ্গে যুক্ত হয় না; তা কেবল জড়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই নউস একটি স্বতন্ত্র সত্তা, যা পদার্থ মাত্রের কারণ স্বরূপ।

এম্পেডোক্লিসের মতো আনাক্সাগোরাস পথ অনুসরণ করে যেসব দার্শনিক প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে জগতের ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লূসিপাস (Leucippus) ও ডেমোক্রিটাস (Democritus) উল্লেখযোগ্য। এঁদেরকে পাশ্চাত্য পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। এই সকল দার্শনিকেরা পারমেনাইডিসের একত্ববাদ এম্পেডোক্লেস ও আনাক্সাগোরাসের বহুত্ববাদের সমন্বয় সাধন করে পরমাণুবাদী দর্শনের সূচনা করেন। লূসিপাস ও ডেমোক্রিটাসের পূর্ববর্তী

দার্শনিক এম্পেডোক্লিস ও আনাক্সাগোরাস সত্তাকে পূর্ণ অবিভাজ্য ও নিশ্চল বলে মনে করেছিলেন এবং শূন্যদেশকে অসত্তা বলেছিলেন। কিন্তু পরমাণুবাদীরা শূন্যদেশের কথা স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের মতে, শূন্যদেশ ব্যতীত গতি থাকতে পারে না। গতি এবং পরিবর্তনকে স্বীকার করতে হলে অবশ্যই পূর্ণদেশের পাশাপাশি শূন্যদেশকে স্বীকার করতে হয়। তবেই গতি ও পরিবর্তনের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করে পরমাণুবাদীগণ পারমেনাইডিসের অবিভাজ্য গতিহীন একক সত্তার পরিবর্তে অসংখ্য অবিনশ্বর পরমাণুর কথা বলেন। এই পরমাণুগুলির উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নেই; কেবলমাত্র পরিমাণগত ও আকারগত পার্থক্য আছে। পরমাণুগুলির মাঝে শূন্যদেশ থাকে বলে তারা একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত ও বিয়োজিত হতে পারে। এই পরমাণুগুলির সংযোগ, বিয়োগ ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে জগতে যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ঘটে। এই শূন্যদেশের কথা স্বীকার করে পরমাণুবাদীগণ এম্পেডোক্লেস ও আনাক্সাগোরাসের বিরোধী কথা বলেন। কারণ তাঁরা শূন্যদেশকে স্বীকার না করে তাকে অসত্তা বলে দাবী করেছিলেন। তবে আনাক্সাগোরাসের মতো জগতের মূল উপাদানগুলি অসংখ্য সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত বলে পারমাণুবাদীরা দাবী করলেও তাঁদের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আনাক্সাগোরাসের তত্ত্বে পরমাণুগুলি বা মৌলিক উপাদানগুলি গুণগতভাবে স্বতন্ত্র হলেও পরমাণুবাদীদের স্বীকৃত পরমাণুগুলি ছিল পরিমাণগতভাবে স্বতন্ত্র। আনাক্সাগোরাসের মৌল উপকরণগুলিকে অনির্দিষ্টভাবে বিভাজন করা যায়। কিন্তু পরমাণুবাদীরা তাঁদের স্বীকৃত পরমাণুগুলিকে সরল বা অবিভাজ্য বলে মনে করতেন। দ্বিতীয়ত, আনাক্সাগোরাস মূল উপাদানগুলির মধ্যবর্তী কোনও শূন্যদেশ স্বীকার করেননি। কিন্তু পরমাণুবাদীরা পরমাণুর গতির জন্য শূন্যদেশ স্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত, আনাক্সাগোরাস মূল উপাদানের গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য নউসকে স্বীকার

করেছেন—যা একটি চিৎসত্তা। কিন্তু পরমাণুবাদীরা পরমাণুগুলির গতির ব্যাখ্যার জন্য এমন কোনও চিৎসত্তাকে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে, পরমাণুগুলি কোনও এক যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পরমাণুবাদীরা দাবী করেন, পরমাণুগুলির পরিমাণ ও আকারগত পার্থক্য থাকার জন্য প্রথম থেকে তারা গতিশীল ছিল। তখন তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এক আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই আবর্তের ফলে সদৃশ পরমাণু একত্রিত হয়ে অগ্নি, বায়ু, মাটি, জল প্রভৃতির সৃষ্টি করে। এইভাবে আমাদের বিশ্ব জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ডেমোক্রিটাসের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এপিকিউরাস (Epicurus 342-270 B.C.) তাঁর দর্শন রচনা করেছিলেন। তিনি পরমাণুবাদীদের মতবাদকে আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, পরমাণুসমূহের সংঘর্ষের ফলে (collision of atoms) জগতের উৎপত্তি হয়েছে। এই পরমাণুগুলির আকার, আকৃতি ও পরিমাণগত পার্থক্য থাকার জন্য তারা একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। পরমাণুগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল ও স্বাধীন। তারা তাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই পরমাণুগুলির গতির ফলে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় তাতে তারা সংযুক্ত হয়ে জগতের সৃষ্টি করে। এই দিক থেকে ডেমোক্রিটাসের মতের সঙ্গে এপিকিউরাসের মতের পার্থক্য। ডেমোক্রিটাস জগতের যাবতীয় বিষয়কে এক আবশ্যিক নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করতেন। সেখানে এপিকিউরাস পরমাণুগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করেছিলেন। পরমাণুগুলি স্বাধীন বলে তারা নির্দিষ্ট পথ থেকে বিপথে চালিত হতে পারে। তিনি এমন কোনও আবশ্যিক নীতিতে বিশ্বাস রাখেননি। যা নির্দিষ্ট নিয়মে যাবতীয় বস্তুকে চালিত করবে। কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করলে সেখানে নৈতিক শিক্ষার কোনও গুরুত্ব থাকবে না। সমস্ত কিছু যদি পূর্ব নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন

হয় তাহলে তা প্রকান্তরে নিয়ন্ত্রণবাদ তথা অদৃষ্টবাদকে সমর্থন করা হয়, যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কোনও অবকাশ থাকে না। আর স্বাধীন ইচ্ছা না থাকলে নৈতিকতার ভূমিকা থাকে না। এপিকিউরাসের এইরূপ মতবাদ আধুনিককালের দার্শনিকগণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমরা পরবর্তী বিভাগে আধুনিককালের বস্তুবাদী মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

আধুনিকযুগের বস্তুবাদী চিন্তার প্রকৃতি

চোদ্দশতকের শেষভাগ থেকে ষোলশতক পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা রেনেসাঁ বা নবজাগরণ নামে খ্যাত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় রেনেসাঁ নামক ভাব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে প্রাচীন দর্শন ও সংস্কৃতির চর্চা ক্রমশ স্থিমিত হয়ে যায়। মধ্যযুগে ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষমতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা যে কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে যায় সেই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য ইউরোপীয়রা জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানে নতুন করে উদ্যমী হয়। তারা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী পুনরুদ্ধার করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে। ফলস্বরূপ অতিপ্রাকৃত বিষয়াদির পরিবর্তে প্রকৃতিকে জানা এবং প্রাকৃতিক সমস্যাগুলি সমাধানের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে দেখা যায়। এর ফলে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তারা জগতের স্বরূপ ও জগতে মানুষের স্থান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। সেই সময়ে ইতালিতে জেরোলামো কার্ডানো (Gerolamo Cardano 1501-1596) নামক এক বিখ্যাত গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি জগতের সমস্ত বস্তু বা ঘটনাকে প্রাকৃতিক

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন[৩৪]। তাঁর মতে, জগতের মূল উপকরণ তিনটি—মাটি, বায়ু এবং জল। তিনি অগ্নিকে একটি উপকরণ বলে স্বীকার না করে তাকে উত্তাপের একটি বিশেষ গুণ বলে স্বীকার করেছিলেন। কার্ডেন তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তাবিদ প্যারাসেলসাসের (Paracelsus 1493-1541) বক্তব্যকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। কারণ প্যারাসেলসাস মাটি, অগ্নি, জল ও বায়ুকে মূল উপকরণ বলে স্বীকার করেছিলেন। এই চারটি মৌল উপকরণ জড়ের পৃথকীকরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে, এই চারটি মৌল উপকরণের সমষ্টিই হল জড়বস্তু। এই প্রত্যেকটি উপকরণ একটি উচ্চতম সত্তা বা spirit দ্বারা পরিচালিত বলে প্যারাসেল্সাস মনে করতেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য বার্নাডিনো টেলিসিও (Bernardio Telesio 1509-1588) অস্বীকার করেন। টেলিসিও পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণের ওপর ভিত্তি করে একটি অভিজ্ঞতাবাদী ভাবনার সূচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি উচ্চতম সত্তা বা spirit-কে অস্বীকার করে জড় ও শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক সমস্তকিছুর সৃষ্টি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি জড়কে নিষ্ক্রিয় বলে মনে করতেন এবং এই নিষ্ক্রিয় জড়ের পাশাপাশি দুটি সক্রিয় শক্তি স্বীকার করতেন, যে সক্রিয় শক্তি দু’টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর সকল প্রকার সৃষ্টি ও পরিবর্তন নির্ভর করে। এই শক্তি দুটি হল—উত্তাপ ও শৈত্য। এই শক্তি দু’টির প্রথমটি জড়কে বিস্তৃত করে এবং দ্বিতীয়টি জড়কে সংকুচিত করে। উত্তাপ শক্তি প্রাণ ও গতির উৎস এবং শৈত্য জড়ের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার কারণ। এই দুটি শক্তির অবিরাম সংঘর্ষের ফলে জগতের সকল প্রকার পরিবর্তন সংঘটিত হয়। টেলিসিও অজড়ীয়, অমর আত্মায় বিশ্বাসী হলেও তাকে যান্ত্রিক ও জড়ীয় নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন।

---

[৩৪] Roy, M.N. *Materialism*, P. 229

তাঁর মতে, আত্মা উত্তাপ দ্বারা গঠিত একটি মসৃণ পদার্থ বিশেষ যার অবস্থান মস্তিষ্কে, এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে সমগ্র দেহে পরিব্যপ্ত থাকে। আত্মা এমনই একটি শক্তি স্বরূপ যা প্রাণী দেহের সকল অংশকে সংহত ও গতিশীল রাখে।[৩৫]

নব্য ইউরোপের স্বাধীন চিন্তাবিদ ও বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon 1561-1626)। ইংরেজ দার্শনিক বেকন ছিলেন বস্তুবাদ ও আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। বেকন সক্রেটিস পূর্ব দু'জন দার্শনিকের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন—আনাক্সাগোরাস এবং ডেমোক্রিটাস। বেকন অ্যরিষ্টটলীয় যুক্তির পরিবর্তে নতুন এক পদ্ধতির কথা বলেছিলেন যা বিজ্ঞানের পক্ষে খুব উপযোগী। যে যুক্তিটিকে তিনি নোভাম অরগানাম (novum organum) নামে চিহ্নিত করেন—যা ছিল মূলত আরোহযুক্তি। এই যুক্তির প্রধান ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা। এই যুক্তি প্রয়োগের পূর্বে তিনি আমাদের মনকে কুসংস্কার মুক্ত করার কথা বলেন। বেকনের মতে, মানুষের মন প্রাধানত চার ধরণের কুসংস্কার (prejudices or idols) দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেগুলি হল 'the idols of the tribe, the idols of the den, the idols of the market and the idols of the theater.' তাঁর মতে, বিশুদ্ধ জ্ঞান গঠন করতে হলে এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে হয়। কুসস্কার মুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রকৃতিকে জানা অসম্ভব। তাই তিনি প্রকৃতিকে জানার জন্য আরোহ পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আকার (forms) আবিষ্কার করা। অধ্যাপক থিলি (Thilly) বলেন, আকার বলতে কিন্তু বেকন বাস্তববাদীরা যা বুঝেছেন তাকে বলেননি। এ কোনও বিমূর্ত আকার বা ধারণা নয়। বেকন

---

[৩৫] ibid, p. 215

আকার বলতে মূর্ত বস্তুকে বুঝেছেন—যা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। কারণ এ জগতে নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা চালিত স্বতন্ত্র বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই।[৩৬] এই বস্তুর নিয়ন্ত্রক নীতিগুলিকে তিনি ফর্ম বলেছেন। বেকনের মতে এই ফর্ম (form) হল গতি। এই ফর্মকে বা গতিকে জানা গেলে প্রকৃতির ঐক্যবদ্ধতাকে জানা যায়। তাঁর বক্তব্য হল—বস্তু জগতের শুরু বা শেষ নেই, তার অস্তিত্ব চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। বস্তুর মধ্যে গতি চিরন্তন ভাবে থাকে বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন।

ফ্রান্সিস বেকনের পরবর্তী সময়ে থমাস হবস (Thomas Hobbes 1588-1679) বস্তুবাদের কথা বলে। হবস জগতের প্রথম নীতিকে (first principle) জানার চেষ্টা করেছিলেন। এই নীতিকে তিনি গতির (motion) মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, সত্তার প্রধান তিনটি উপকরণ —দেশ (space), পিণ্ড (body) এবং গতি (motion)। তাই প্রত্যেক বস্তুই বিস্তৃত (extended) এবং প্রতিরোধক্ষম (resistant) এবং তাদের দৈহিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তনশীল, গতির দ্বারা তা নির্ণীত হয়। এক বস্তুর (one body) নিকটবর্তী হওয়া এবং অন্য বস্তুর (another body) সঙ্গে সংযোগের ফলেই গতির সৃষ্টি হয়। এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে গতির স্থানান্তরের জন্য যে নাম ব্যবহার করা হয় তাই কারণ ও কার্য। এই গতি যেমন প্রাকৃতিক বস্তুতে থাকতে পারে তেমনি তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। মানুষের স্বভাব, মানসিক জগৎ এবং প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই এই গতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মাত্র। *Leviathan* গ্রন্থের ভূমিকাতে হবস বলছেন,

[৩৬] Thilly, F., *A History of Philosophy*, p. 258

> ...life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principal part within; why may we not say, that all "automata" (engines that move themselves by springs and wheels as doth a watch) have an artificial life? For what is the "heart" but a "spring;" and the "nerves," but so many "strings;" and the "joints," but so many "wheels," giving motion to the whole body[৩৭]....

তাই তিনি বাহ্যজগত থেকে মানসিক জগতকে অধিক গতিময় বলে চিহ্নিত করেন। হবস মনের পৃথক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের কিছু ভৌতিক পদার্থের গতি বলে চিহ্নিত করেন। এই গতির দ্বারা জগতের সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। হবসের মতে জড় (matter) একমাত্র দ্রব্য (Substance), কিন্তু আমরা জড়কেই পিণ্ড (body) রূপেই জানি। তিনি বলেন, জ্ঞানের উৎপত্তি হয় সংবেদনের মাধ্যমে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনও না কোনও বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শের দ্বারা এই সংবেদন তৈরী হয়। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংবেদন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গতি (motion) তৈরী হয় এবং তা আমাদের স্নায়ুর দ্বারা প্রথমে মস্তিষ্কে ও পরে হৃদ্‌পিণ্ডে পৌছায়। এই সংবেদনকে তিনি মস্তিষ্কের গতি ছাড়া আর কিছু বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, জগত গতিময়—এই গতিময় জগতকে আমরা রঙ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদির দ্বারা জানি। তবে বাহ্যজগত, যাকে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি তা আসল নয়। কিন্তু হবসের এই কথা স্বীকার করলে প্রশ্ন ওঠে বাস্তব জগতের প্রকৃত স্বরূপ কী? তাকে আমরা কীভাবে

[৩৭] Hobbes, Thomas, *Leviathan*, p. 5

জানতে পারি? হবস এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দেননি। পরবর্তী সময়ে রেনে ডেকার্ত তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি চেতনার সুনিশ্চয়তা থেকে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন।

দেকার্ত, নিজের নিশ্চিত অস্তিত্ব প্রতিপাদন দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর বাহ্যজগতের স্বরূপ বর্ণনা করলেন। তাঁর মতে, ঈশ্বর কেবল সর্বশক্তিমান না, তিনি পরম শুভও বটে। তাই তিনি আমাদের মনে যে সব ধারণা বপন করেছেন তার কোনওটিই অমূলক নয়। ঈশ্বরের দেওয়া ধারণাগুলির মধ্যে বাহ্যজগতের ধারণাও একটি। এই ধারণা এতই স্পষ্ট ও বিবিক্ত যে তা মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং এই ধারণার উৎস রূপে বর্হিজগৎ অস্তিত্বশীল। এই বর্হিজগতের স্বরূপ বলতে গিয়ে তিনি ওজন, বর্ণ, প্রভৃতি গুণকে জড় থেকে পৃথক করেন এবং বিস্তৃতিকে জড়ের স্বরূপ বলে চিহ্নিত করেন। দার্শনিক ফ্রেডরিখ অ্যালবার্ট ল্যাঙ্গে (Friedrich Albert Lange) তাঁর *History of Materialism* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে দেকার্ত এই বিস্তৃতি ও দেশ (space) কে অভিন্ন বলে মনে করায় তাঁর কাছে শূন্যদেশের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর কাছে দেশ মাত্রই পূর্ণ অর্থাৎ দেশ ও জড় এক ও অভিন্ন। দেশ থেকে সব পদার্থ অপসারণ করা হলে দেশের অস্তিত্ব থাকবে না, কেননা বস্তুর উপস্থিতি না থাকলে দেশের বিভিন্ন বিন্দু ও স্থানকে পরস্পর থেকে ভিন্ন বলে বর্ণনা করার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি দেশকে অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য বলে মনে করতেন এবং এর কোনও মৌলিক অংশ স্বীকার করতেন না। তাই দেকার্ত পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে, বিস্তৃতির কোনও শেষ নেই, কারণ জড় ও জগৎ অসীম। এই জড় বা বিস্তৃতি নিষ্ক্রিয় ও গতিহীন। তাই স্বীকার করে নিতে হয় যে জড় সৃষ্টি করতে গিয়ে ঈশ্বরকে এর প্রতিটি অংশে গতি প্রদান করতে হয়েছে। তবে দেকার্তের বক্তব্যকে সুসংগত বস্তুবাদ

বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ তিনি জড় জগত স্বীকার করার পাশাপাশি একটি চেতন জগতকেও স্বীকার করেন। এই দুই জগত সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর নির্ভর। তাই দেকার্তকে বস্তুবাদী বলার থেকে দ্বৈতবাদী বলাই শ্রেয়। তবে তিনি যখন প্রাকৃতিক কারণগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করছেন তখন তিনি বস্তুবাদী বক্তব্য রেখেছিলেন। আবার সত্তার ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তিনি ঈশ্বর বা আত্মাকেই সত্তার একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করেছেন। দেকার্তের দর্শনের প্রধান সমস্যা হল তিনি পদার্থ বিদ্যায় যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যানীতি গ্রহণ করেছিলেন তাকে জীববিদ্যায় ও শরীরবিদ্যা সহ প্রকৃতির প্রতিটি বিভাগে ব্যবহার করেন। ফলে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাণী মাত্রই চেতনাবিহীন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (automata) স্বরূপ। প্রাণীর আচরণে যে চেতনা বা বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করা যায় তাকে তিনি একটি জটিল যন্ত্রের ক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই ধারণা পরবর্তী চিন্তাবিদদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

দেকার্তীয় দর্শনের প্রভাব তাঁর পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যদিও দেকার্তীয় দ্বৈতবাদ তাঁরা গ্রহণ না করে পরমাণুবাদকে স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন—হার্টলি (১৭০৪-১৭৫৭), প্রিস্টলি (১৭৩৩-১৮০৪), লা মেট্রি (১৭০৯-১৭৫১), হেলভেসিয়াস (১৭১৫-১৭৭১), দ্য এ্যালেমবার্ট (১৭১৭-১৭৮৩), হলবাখ (১৭২৩-১৭৮৯), দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) এবং ক্যাবানিস (১৭৫৭-১৮০৪) প্রমূখ। এই দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই প্রকৃতির অস্তিত্ব চিরন্তন ভাবে আছে বলে ধরে নিয়ে প্রকৃতিকে বিস্তৃতি, ওজন, পরিমাণ ও গতি বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সংমিশ্রণের এক বিশাল মিশ্রণ বলে দেখতে চেয়েছিলেন। ডেনি দিদেরো (Denis Diderot 1713-84) অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকের দার্শনিক। যিনি কিছু ক্ষেত্রে ‘ডেইষ্ট’ (Deist), কেননা তাঁর প্রথমদিকের লেখা *Philosophical Thoughts* (1746)-এ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন এবং

বলেছিলেন যে নৈতিকতা ও ধর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত যুক্তি ও প্রকৃতির নিয়ম। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করে বস্তুবাদী ধারণার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ *Rameau's Nephew* এবং *D' Alembert's Dream* -এ স্পষ্টভাবে বস্তুবাদী চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, বিশ্বজগৎ সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত (material) এবং নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়মে চালিত হয়। তিনি বলেন, চেতনা এবং জীবন জটিল বস্তুগত প্রক্রিয়ার ফল। প্রকৃতি নিজেই সর্বশক্তিমান, এটি কোনও বাহ্যিক সত্তার দ্বারা পরিচালিত নয়। তাই প্রকৃতির নীতি (law of nature) ব্যাখ্যা করতে কোনও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির উপস্থিতি স্বীকারের প্রয়োজন নেই। তাই বলা যেতে পারে তিনি বস্তুবাদকে অদ্বৈত প্রকৃতিবাদের (naturalistic pantheism) দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। ১৭৫৪ সালে প্রকাশিত *On the Interpretation of Nature (Pensees Sur I'interpretation de la nature)* গ্রন্থের শুরুতে বলা হয়েছে "It is nature that I wish to describe; nature is the only book for the philosopher।"[৩৮] অর্থাৎ আমি প্রকৃতিকে বর্ণনা করতে চাই; প্রকৃতিই দার্শনিকের একমাত্র গ্রন্থ। এই বক্তব্যের দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রকৃতিই একমাত্র বাস্তবতা। সমস্ত জ্ঞান ও সত্য প্রকৃতির মধ্যে নিহিত বলে কোনও ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি নিজেই সমস্ত কিছুর উৎস বলে প্রকৃতির নিয়মগুলি অনুধাবন করা দার্শনিকের প্রধান কাজ। তাই তিনি অধিবিদ্যা বা ধর্মীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতি ও বস্তুবাদী চিন্তার ওপর জোর দিয়ে দর্শনকে কেবল যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

[৩৮] Will Durant, *The Story of Civilization*, Vol. 9, p. 700

লা মেট্রির (Julien Offray de La Mettrie 1709-51) ছিলেন পেশায় চিকিৎসক ও চরম বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি মানুষের চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে শারীরিক প্রক্রিয়ার ফল বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর *Natural History of the Soul*-এ পরবর্তী সময়ে *Treatise on the Soul* নামে অভিহিত হয়, বলেন যে মানুষের মনোগত চিন্তা এবং ইচ্ছার কারণ হল সংবেদন। তাঁর মতে, মন বা আত্মা অপরিহার্যভাবে শারীরিক সংগঠনের ওপর নির্ভর করে। তিনি অদ্বৈত বস্তুবাদী (monistic materialist) দার্শনিক ছিলেন। কারণ তাঁর মতে, চেতনা, আত্মা বা ঈশ্বর বলে কিছুই নেই—শুধুমাত্র বস্তু (matter) এবং তার গতি-বিধি বাস্তব। তাই মন বা আত্মার প্রকৃত ইতিহাস শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার যথার্থ পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায়। তিনি শরীরের অতিরিক্ত কোনও অতীন্দ্রিয় আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। *Man a Machine* (1747) গ্রন্থে লা ম্যাট্রির দার্শনিক ডেকার্ত-এর মতবাদকে উল্লেখ করে বলেন, মানুষ একটি জৈবিক মেশিন বা যন্ত্র, যার সমস্ত চিন্তা, আবেগ, চেতনা মস্তিষ্ক ও শরীরের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের ফল। তবে তিনি ডেকার্তের দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে মানুষকে দৈহিক সংগঠনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। আসলে ডেকার্ত মানুষকে দেহ-মনের সংগঠন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অর্থাৎ ডেকার্তের মতে দেহ ও মন দুটি পৃথক সত্তা। কিন্তু লা ম্যাট্রির কেবল শরীর বা দেহকে বাস্তব বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, এবং বুদ্ধিমত্তা সম্পূর্ণভাবে মস্তিষ্কের গঠন ও ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, পশুদের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে মানুষের সঙ্গে পশুর কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। মানুষ উন্নত মস্তিষ্কের কারণে বেশি বুদ্ধিমান হয়। তিনি যেহেতু পেশায় চিকিৎসক ছিলেন তাই মানুষের মানসিক ও শারীরিক অবস্থার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন। এবিষয়ে চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণাগুলি তাঁকে সাহায্য করেছিল।

হলবাখ (Baron Paul Von Holbach 1723-89) জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করলেও বড় হয়েছিলেন প্যারিসে। তিনি সাধারণভাবে ডি' হলবাখ (d'Holbach) নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। হলবাখ মনে করেন, দার্শনিক দেকার্ত মতাদর্শভাবে ভুল ছিলেন কারণ তিনি জড়বস্তুকে স্বভাবগত ভাবে স্থির বলে ধরে নিয়েছিলেন। ফলে সেই জড়ের গতিকে বাইরে থেকে স্থাপন করা হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে—তা কিন্তু নয়। তাঁর মতে, বস্তুর সত্তার (essence) মধ্যেই গতি নিহিত থাকে। এই জগত যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু দ্বারা গঠিত তার মধ্যেই গতি নিহিত রয়েছে। তিনি বলেন, "Descartes was also wrong in thinking that matter is all of a piece, all of the same kind. Leibniz's principle of indiscernible contains much more truth than Cartesian notion of the homogeneity of matter."[৩৯] হলবাচ মনে করেন, জগতের অণুগুলির বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াশীলতা থাকে এবং সেসব ক্রিয়াশীলতা গতির নীতিকে (law of motion) আবশ্যকভাবে মেনে চলে। আসলে লা মেট্রি যেখানে জড়ের মধ্যে গতি আছে বলে স্বীকার করছেন সেখানে হলবাখ গতিকে একরকম না বলে ভিন্ন ভিন্ন গতি বলে স্বীকার করছেন। এই ভিন্ন ভিন্ন গতিগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলে। এই ভিন্ন ভিন্ন গতির দ্বারা তিনি জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে বাহ্যান্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ বস্তুগুলি আসলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অণুর সমষ্টি। এই বস্তুগুলির গঠনের ভিন্নতা অনুসারে তাদের স্বভাব বা ধর্মের পার্থক্য ঘটে। সমস্তক্ষেত্রে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি একে অন্যকে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ করে। তবে সমস্ত কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ঘটে থাকে। তাই তাঁর মতবাদ প্রকৃতির নির্দেশ্যবাদী তত্ত্বের

[৩৯] Coplestone, F., *History of Western Philosophy*, vol.6, p. 49

ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির নির্দেশ্যবাদী তত্ত্বে গতিকে বাহ্য কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয় না। বরং তাকে বস্তুর একটি অত্যাবশ্যক গুণ (essential property) বলে গণ্য করা হয়। কোনও ঈশ্বর বা অতিজাগতিক সত্তার সাহায্য ছাড়াই জগত সৃষ্টি হয় বলে দাবী করা হয়। জাগতিক শৃঙ্খলাকে কোনও ঐশ্বরিক পরিকল্পনা না বলে বরং বস্তুর প্রকৃতি ও তার নিজস্ব নিয়মগুলির ওপরে নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। হলবাখ মনে করেন, প্রকৃতির অতিরিক্ত কিছু নেই। প্রকৃতি আসলে গতির মধ্যে থাকা জড়গুলির ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন একটি ব্যবস্থা, যাকে কার্য-কারণ সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। তাঁর মতে, জড় সর্বদা অস্তিত্বশীল ও গতিশীল। এই জড় ও গতির ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাস থেকে পৃথক পৃথক জগত তৈরী হয়[৪০]। জড় আসলে চার ধরণের যথা—পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল। এই চারটি মূল জড়ের বিবিধ অনুপাতে সংযোগ অথবা পরস্পরের বিচ্ছিন্নতাই সকল পরিবর্তনের কারণ। কিন্তু দেশ এবং কালের পরিবর্তন হয় না। হলবাখ যান্ত্রিক কারণকে বুদ্ধিগম্য ও প্রকৃত কারণ বলে মনে করেছিলেন। কেননা প্রকৃতির সমস্ত কিছুই যান্ত্রিকভাবে কাজ করে, এবং এতে কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত নেই। তাই তিনি বলেন, যেহেতু মানুষ প্রকৃতিতেই আছে এবং প্রকৃতির অংশ হিসাবে আছে সেহেতু মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ প্রকৃতি থেকে নিঃসৃত হয়। সেজন্য হলবাখ মুক্ত ইচ্ছার (free will) ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, মানুষ প্রকৃতির কঠোর নিয়মের অধীন এবং তার সমস্ত চিন্তা ও কার্যকলাপ পদার্থের কার্য-কারণ সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত। আমরা যা করি, তা প্রকৃতির নিয়মের বাইরে নয়, বরং এটি আমাদের শরীর ও পরিবেশের প্রভাবের ফল। তাই তাঁর মতবাদে ঈশ্বর চিন্তা নেই এবং পরকালীন বিচার

[৪০] Roy, M.N. *Reason, Romanticism and Revolutions*, p. 250

নেই। তাই তিনি নৈতিকতার ভিত্তি রূপে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সামাজিক প্রয়োজন এবং যুক্তিকে (Reason) গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, ধর্মীয় নৈতিকতা ভিত্তিহীন কারণ সেটি কেবল ভয় ও কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মানুষের উচিত বিজ্ঞান, যুক্তি এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠন করা। হলবাখের এমন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আধুনিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় দাবী করা হয় জড় বা জড় বস্তুই হল একমাত্র সৎ বস্তু। প্রত্যক্ষগম্য কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুকে বিশ্লেষণ করা হলে যে অপ্রত্যক্ষযোগ্য পরমাণুপুঞ্জ পাওয়া যায় তাই একমাত্র সৎ। এই সৎ বস্তুগুলির মিলন ও সংঘাতের ফলে অন্য সকল বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। এই বিশেষ মতানুসারে মন ও প্রাণকে জড়ের একটি বিশেষ রূপ বলে মনে করা হয় যেখানে মনের দেহভিন্ন অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ভৌতিক স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের বিকাশ রূপে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁদের মতে, যুগ যুগ ধরে ক্রমবিকাশের ফলে জড়বস্তু থেকেই প্রাণীদেহ সৃষ্টি হয়েছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র মনন ও মানসিকতাকে সম্ভব করে বলে জড়, প্রাণ ও মনের মধ্যে কোনও গুণগত ভেদ নেই। এগুলি আসলে একই ভৌতিক পদার্থের স্থূল অথবা সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র। তাঁরা মনে করেন জড়কণাগুলির গতি, মিলন, বিকাশ ও সংঘাত কেবলমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা জড়কণাগুলির মিলন, বিকাশ ও সংঘাত কোনও স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। তাঁদের মতে, আদিমতম স্তর থেকে জড়বস্তুর যান্ত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রাণ ও মনের বিকাশ ঘটেছে। একটি ভৌতিক শক্তি (উত্তাপ) যেমন অন্য ভৌতিক শক্তিতে (আলো) রূপান্তরিত হতে পারে, তেমনি জড়শক্তি জীব বা মানস শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। জীব ও মানস শক্তি জড় থেকে ভিন্ন নয়; জড়ের আরো সূক্ষ্ম, জটিল ও উন্নততর স্তর মাত্র। এই মতানুসারে জাগতিক ক্রমবিকাশে সম্পূর্ণ নতুন কিছুর

উৎপত্তি ঘটে না; আদিমতম জড়বস্তুই ক্রমবিবর্তিত হয়ে জটিলতম রূপ ধারণ করে। জীবন ক্রিয়া তার পূর্ববর্তী ভৌত রাসায়নিক ক্রিয়ার মিলনে উৎপন্ন হয় আর চেতন ক্রিয়া স্নায়ুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়। চেতনক্রিয়াকে স্নায়বিক ক্রিয়া থেকে ভিন্ন বলে মনে করা হলেও চেতনা মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন একটি উপবস্তু (epi-phenomenon)।

অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী বক্তব্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করা হলে তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবুও তাঁরা প্রত্যেকেই এক বিষয়ে সহমত ছিলেন যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি অর্থাৎ মানসিক বা দৈহিক ঘটনাগুলি এক নিয়ম বা নীতির (law) দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তন থেকে মানব জীবনের সমস্ত ঘটনা ঐ নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আধুনিক বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার হওয়ার মূল কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ভৌগোলিক আবিষ্কার, যানবাহনের অত্যাধুনিক উন্নতি, উন্নতর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ইত্যাদি প্রাকৃতিক অনুসন্ধানে বস্তুবাদী চিন্তার প্রসারে সাহায্য করে। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের মতে, "বিজ্ঞান ও শিল্পের শক্তিশালী ও প্রচণ্ড বেগে ধাবমান অগ্রগতিই বস্তুবাদী তত্ত্বকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল।"[৪১] এই তত্ত্বের অগ্রগতির প্রথম ধাপে যন্ত্রবিজ্ঞানই সর্বাধিক বিকাশ লাভ করেছিল। ডেভিড গেস্ট তাঁর Dialectical Materialism[৪২] গ্রন্থে দেখান, বিজ্ঞানের সহায়তায় যে বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছিল তার প্রথম স্তরে যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যার অগ্রগতি হয়। বিজ্ঞানী নিউটনের হাত ধরে এই অগ্রগতি নিপূণতার চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। সেই সময় ভৌতবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও জীববিদ্যা

---

[৪১] মার্কস ও এঙ্গলস *রচনা সংকলন*, ২য় খন্ড, পৃ ২৫০

[৪২] Guest, David, *A Text Book of Dialectical Materialism*, 1989.

প্রাক-উন্নতির স্তরেই ছিল। এবং এই বিজ্ঞানগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে এই যন্ত্রবিজ্ঞান নিরূপিত দর্শন ভাবনাকে যান্ত্রিক বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা যায়। এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ জগতকে জটিল যন্ত্র রূপে দেখার চেষ্টা করে। গেস্ট বলেন,

> Mechanical Materialism looked upon the world as on some very complicated machine, which has been wound up some time and then set going according to fixed, unalterable laws to all eternity. There was no room in such a scheme for evolution or any sort of real change. This mode of thinking was metaphysical (in the sense used by Hegel and later by Marxists).[৪৩]

এখানে অধিবিদ্যা কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতির বিরুদ্ধে, একপেশে ও বিষয়ীসর্বস্ব যে ধারণা—যা জগতের সব বস্তু ও ঘটনাকে চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় ও পরস্পর নিরপেক্ষ বলে মনে করে তাই অধিবিদ্যামূলক চিন্তা বলে পরিচিত। এই বস্তুবাদকে যান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন তা বুঝতে হলে আমাদের কয়েকটি প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়োজন। যেমন, যন্ত্র কাকে বলে? যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী? এই প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে যান্ত্রিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রকৃতি স্পষ্ট হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, জড়পদার্থ দ্বারা গঠিত অংশগুলি (parts) অবস্থিতি, আয়তন, আকৃতি ও গঠনভঙ্গী অনুসারে যখন যথাযথ স্থানে স্থাপন করা হয়

---

[৪৩] ibid, p.29

এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কৃত্রিম ব্যবস্থার দ্বারা এক যৌথ ফল লাভ করা যায় তখন সেইসকল অংশের সমাহারকে যন্ত্র বলা যায়।[৪৪] যন্ত্রের সাহায্যে লব্ধ ফল কাঙ্খিত যন্ত্রের অন্তঃস্থ অথবা অভ্যন্তরীণ কোনও অংশের লক্ষ্যের সমতুল্য নয়। বহিঃস্থ কোনও নিয়ামকের দ্বারা যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। সুতরাং যন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত ফল বহিঃস্থ নিয়ামকের লক্ষ্যবস্তু। যন্ত্রের নিজস্ব কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে না। যন্ত্রের অংশগুলি প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে, পরে সেগুলি কোনও এক নিয়ম অনুসারে সজ্জিত হলে তবেই তা সমগ্ররূপে একই সঙ্গে ক্রিয়া করতে পারে। যন্ত্রের সঙ্গে তার অংশগুলির বাহ্যিক সম্পর্ক থাকে বলে একটি অংশকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে আরও একটি উপযুক্ত অংশ সরাবরাহ করলে যন্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না। যন্ত্রের একটি অংশকে সমগ্র যন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সেই অংশটিও অক্ষুণভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। যন্ত্র চালনার জন্য বিশেষ এক চালিকা শক্তির প্রয়োজন। যন্ত্র চালিত হলে অংশগুলি একে অন্যের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল প্রদান করে—যে নিয়মগুলিকে আমরা সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ ঘড়ির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ঘড়ির অনেক অংশ থাকে। যে অংশগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঘড়িটি তৈরী হয়। যেমন, লিভার, পিন, স্প্রিং, খাঁজ কাটা চাকা প্রভৃতি। ঐ ঘড়ি চালনা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে দম দিতে হয় অথবা ব্যাটারি যুক্ত করতে হয়। পরে সেই স্প্রিং এর প্যাঁচ যত খুলতে শুরু করে ঘড়ির ওপরের অংশের কাঁটাগুলিও তত ঘুরে ঘুরে ফলাফল প্রদান করতে থাকে। যন্ত্র কীভাবে ক্রিয়া করে তা জানতে হলে প্রথমেই যন্ত্রটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পরে সেই অংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে কিভাবে চালিকা শক্তির সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে তা

---

[৪৪] পাল, শ্রীরামচন্দ্র, *দর্শন পরিচয়*, পৃ ১৬৫

পর্যবেক্ষণ করলে যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা যায়। যান্ত্রিক বস্তুবাদীগণ প্রকৃতিকে একই রকম ভাবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা প্রকৃতিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে সেই অংশগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন কীভাবে অংশগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা জগতের পরিবর্তন ঘটে এবং কীভাবে জাগতিক ঘটনাবলী ঐ অংশগুলির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফল রূপে নির্ণীত হয়। যন্ত্রের কার্যকারিতা জেনে কীভাবে সেটি মেরামত করা যায়, তা যেমন নির্ণয় করা যায় তেমনি মানুষের প্রয়োজন অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় কীভাবে ফল প্রদান করতে পারে তা বিবেচনা করে প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতিকে যন্ত্র হিসাবে দেখা হলে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, প্রকৃতি যন্ত্র বিশেষ হলে সেই যন্ত্রের উদ্ভাবক কে? যন্ত্র সচল করতে যে চালিকা শক্তির প্রয়োজন হয় সেই চালিকাশক্তি প্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। প্রকৃতির চালিকা শক্তির উৎস বাহ্যিক কোনও কিছু হলে জড় বা অণুকে আর জগতের মূল বলা যায় না। আবার অণু পরমাণুর অন্তঃস্থ শক্তির পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার সাহায্যে জাগতিক ঘটনার পরিবর্তনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা হলে প্রতিটি পরিবর্তনকে অনুরূপ বলতে হয়, যেহেতু যান্ত্রিক প্রক্রিয়া একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন আর কোনও কিছু হতে পারে না। কিন্তু সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে কখনই একই যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। কেননা বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া দ্বারা নতুন নতুন বস্তুর উদ্ভব ঘটছে। তাই জাগতিক ঘটনার পরিবর্তনকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলা হলে নতুন বস্তুর উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বলা হয় বিশেষ যন্ত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় এবং চালিকা শক্তির সাহায্যে তা সচল রাখা হয়। ফলে যন্ত্র ঐ বিশেষ উদ্দেশ্য অতিরিক্ত অন্য কোনও কিছুই করতে পারে না। যন্ত্রের নিজেকে পরিবর্তন করার অথবা

নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। তাই জগতে নতুন গুণসম্পন্ন কোনও বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি ব্যাখ্যা যান্ত্রিক বস্তুবাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলিকে কেবলমাত্র যান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। তাই প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ অনুধাবনের জন্য যান্ত্রিক বস্তুবাদ ত্রুটিশূন্য মতবাদ নয়। যান্ত্রিক বস্তুবাদ সামাজিক বিকাশ সম্পর্কেও একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা সামাজিক বিবর্তনকে এক প্রক্রিয়া রূপে দেখেন যা যন্ত্রের মতো, যেখানে পরিবর্তনসমূহ পূর্বনির্ধারিত নিয়ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে ঘটে। তাঁদের মতে, সমাজের মূল চালিকা শক্তি হল বস্তুর অবস্থা ও তার উৎপাদন প্রক্রিয়া। যেভাবে পদার্থবিজ্ঞানে বিভিন্ন পরিবর্তন এক নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা মেনে ঘটে সেভাবেই সামাজিক পরিবর্তনগুলি পূর্বনির্ধারিত ও স্থির নিয়মাবলী অনুসরণ করে ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনকে এক সরলরৈখিক এবং পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া রূপে বিবেচনা করে বলে মানবিক ইচ্ছা, চেতনা এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা গৌণ হয়ে পড়ে। সমাজ সম্পর্কে এমন দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তনের জটিলতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কারণগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। কারণ সমাজ একটি জটিল ব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানসিক উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে। যান্ত্রিক বস্তুবাদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি এই আন্তঃক্রিয়াগুলির যথার্থ প্রকৃতি ও পরিবর্তনের গতিশীলতাকে উপেক্ষা করে। তাই লেলিন বলেন, যান্ত্রিক বস্তুবাদ মানুষের সামাজিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। যান্ত্রিক বস্তুবাদের এই সীমাবদ্ধতা কীভাবে মার্কসীয় বস্তুবাদে অতিক্রম করা হয়েছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

সুতরাং সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবী করতে পারি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন থেকে আরম্ভ করে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের মধ্যে স্পষ্টভাবে বস্তুবাদী আলোচনা

থাকলেও মানবতাবাদী আলোচনা তেমন সুপষ্ট ভাবে উপস্থিত ছিল না। মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন, ভারতীয় মানবতাবাদী আলোচনার উত্থান ঘটে বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমে। বৌদ্ধদর্শনে আত্মার প্রচলিত ধারণাকে খণ্ডন করে মানুষকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদিও বৌদ্ধ দর্শন আধ্যাত্মবাদী ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের বস্তুবাদী আলোচনা নিহিত থাকলেও মানবতাবাদের ধারণা উঠে আসে এপিকিউরাসের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। যদিও এপিকিউরাসের পূর্ববর্তী চিন্তাবিদরা মানুষ সম্পর্কে অর্থাৎ মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে বস্তুবাদী বক্তব্য প্রদান করেছেন, কিন্তু তাঁরা নৈতিকতার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হননি। সেই ব্যাখ্যা আধুনিক যুগের বস্তুবাদী দার্শনিকদের অভিমতে লক্ষ্য করা যায়। তবে আধুনিক যুগের বস্তুবাদী ভাবনায় মানবতাবাদী ব্যাখ্যা যান্ত্রিকভাবে করা হয়েছে। সেই যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে কীভাবে মার্কসবাদে অতিক্রম করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মার্কসীয় বস্তুবাদকে বিশ্লেষণ করে যান্ত্রিক বস্তুবাদের সমস্যাগুলি কীভাবে সমাধান করেছেন সেই আলোচনা করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তথা মার্কসীয় বস্তুবাদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ দার্শনিকই যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সমর্থন করেছেন, যা জড়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে জগত ও সমাজ উভয়ের পরিবর্তনের কারণ বলে মনে করেছেন। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মনে করেছিলেন এই যান্ত্রিক বস্তুবাদ কতকগুলি অযৌক্তিক ও বদ্ধমূল ধারণার ওপর নির্ভর করে গঠিত। তাই সামাজিক পরিবর্তন বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ। পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস যে বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তার সুদূর প্রসারী প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস অনেকাংশ এই বস্তুবাদ অনুসারী। তাই এই তত্ত্বটির বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের গবেষণাপত্রের আলোচ্য বিষয় যে মানবতাবাদ তা মার্কসের বস্তুবাদী ভাবনাকে কীভাবে ব্যবহার করেছে তা জানাও প্রয়োজন। তাই এই অধ্যায়ে মার্কসীয় বস্তুবাদ তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। মার্কসের বস্তুবাদকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয় কেন সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এঙ্গেলস *ল্যাডভিগ ফয়েরবাখ* গ্রন্থে ১৮৯২ সালে 'বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক' (materialistic dialectic) কথাটির উল্লেখ করেছিলেন। পরে জর্জি প্লেখানভ (Georgi Plekhanov) দ্বারা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' (Dialectic materialism) নামটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। মার্কসীয় বস্তুবাদকে কেবলমাত্র বস্তুবাদ না বলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা প্রয়োজন। কেননা মার্কসীয় বস্তুবাদকে কেবল বস্তুবাদ বলা হলে পূর্ববর্তী বস্তুবাদের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয় না। ফয়েরবাখকে যে অর্থে বস্তুবাদী বলা হয় মার্কসকে সেই অর্থে বস্তুবাদী বলা

যায় না। অন্যদিকে হেগেল যে অর্থে দ্বান্দ্বিকতাবাদী (ডায়লেকটিশিয়ান) ছিলেন মার্কস সেই অর্থে দ্বান্দ্বিকতাবাদী ছিলেন না। তাই পূর্ববর্তী বস্তুবাদ থেকে মার্কসীয় বস্তুবাদকে পৃথক করার জন্য 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামে অভিহিত করা প্রয়োজন। এই প্রাথমিক পার্থক্যকে বোঝানোর জন্য মার্কস ফয়েরবাখ বিষয়ক দশম থিসিসে পুরোনো বস্তুবাদ ও নতুন বস্তুবাদের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, "পুরনো বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল নাগরিক সমাজ; নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ হল মানব সমাজ বা সমাজীকৃত মানবজাতি।"[১] অর্থাৎ পুরোনো বস্তুবাদে সমাজের সমগ্র অংশ ব্যাখ্যাত না হয়ে বিশেষ কিছু অংশের ব্যাখ্যা হয়। কিন্তু নতুন বস্তুবাদে সমাজের সমগ্র অংশ তথা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হয়।

এখন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করা যাক। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে 'Materialism' শব্দের অর্থ আলোচনা করা হয়েছে। এখন 'Dialectics' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করা দরকার। 'Dialectics' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হল দ্বন্দ্ব, তাই Dialectical বলতে দ্বান্দ্বিক বোঝায়। আমরা জানি একই শব্দের অনেক অর্থ হয় এবং অর্থগুলি পরস্পর বিরোধীও হয়। যেমন, 'দ্বন্দ্ব' শব্দটির দুটি অর্থ হয়। 'দ্বন্দ্ব' অর্থ হল ঝগড়া বা কলহ। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে বলা হয় "দুই বা বহু পদার্থ মিলিত হয়ে এক অর্থে অন্বয় হলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়'[২]। অর্থাৎ এখানে দ্বন্দ্ব বলতে মিলন বা অন্বয়কে বোঝায়। বাংলা ভাষায় 'দ্বন্দ্ব' কথাটি কেবল বিরোধকে বোঝায় না ক্ষেত্র বিশেষে তা মিলনাত্মক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাংলা ব্যাকরণে 'ব্যাজস্তুতি' বলে যে বিশেষ অলঙ্কার আছে তা নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দাকে বোঝাতে

[১] *মার্কস ও এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি*, ১ম খণ্ড, পৃ ১২

[২] *শব্দসার*, ২০০৩

ব্যবহৃত হয়। ভরতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে তার বেশ কিছু পরিচয় মেলে। যেমন, দেবী অন্নদা বলছেন, তাঁর স্বামী "কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।/ কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।"[৩] এখানে দ্বন্দ্ব ভিন্ন অন্যান্য শব্দগুলির দুটি করে অর্থ আছে। যেমন, পঞ্চমুখ মানে বেশি কথা বলা এবং শিব, কণ্ঠ ভরা বিষ মানে কটুভাষী এবং নীলকণ্ঠ। আবার দ্বন্দ্ব শব্দটি ঝগড়া বা মিল—নিন্দা বা প্রশংসা—দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। তাই Dialectic শব্দটির প্রতিশব্দ দ্বন্দ্ব বলে গ্রহণ করলে শুধু বিরোধ নয় অথবা শুধু ভাবও নয়, বিরোধ ও ভাব উভয় ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ হয়। বাংলা অভিধানে 'দ্বন্দ্ব' শব্দটির দ্বারা এমন যুগল বা যুগ্মকে বোঝানো হয়েছে। আবার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ একত্রে বোঝাতে (শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি) দ্বন্দ্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৪] Dialectic শব্দটি গ্রীক শব্দ ডায়ালোগো (Dialogue) থেকে এসেছে, যার অর্থ আলোচনা করা বা তর্ক করা অথবা দুই বা তার অধিক ব্যক্তির তর্কধারায় নিহিত অসঙ্গতিগুলি প্রকাশ ও খণ্ডন করে সত্যে পৌঁছানোর উপায়। প্রাচীন কালে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মনে করতেন যে চিন্তাধারার মধ্যে অসঙ্গতিগুলি আবিষ্কার করে পরস্পর বিরোধী মতের সংঘাতের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছানোই হল শ্রেষ্ঠ পথ। পরবর্তী সময়ে এই যুক্তিবিচারের পদ্ধতি প্রকৃতির ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হওয়ার ফলে প্রকৃতি বিশ্লেষণে দ্বান্দ্বিক (Dialectic) পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে—যে পদ্ধতি অনুসারে বাহ্য জগত সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীল এবং বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশ হল প্রকৃতির মধ্যস্থ পরস্পর বিরোধী প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলাফল। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল একটি তাত্ত্বিক পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে মার্কস সমাজতন্ত্রের কাল্পনিক ধারণাকে বাস্তবে রূপায়ন করেছেন। তিনি এর ভিত্তিতে বস্তুজগৎ ও মানুষের

---

[৩] ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল*, পৃ ১৫৭

[৪] বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ ১১৪১

ভাবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যার বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করেছেন। এই পদ্ধতি হল মার্কসবাদের অন্যতম একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি। মার্কসবাদের এই মূল দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিকে বিচার করতে হয় তার পূর্ববর্তী জার্মান দর্শনের নিরিখে, যেখানে মার্কস এবং এঙ্গেলস দু'জনই পূর্ববর্তী জার্মান দর্শনের ঋণ স্বীকার করেছিলেন। জার্মান চিরায়ত দার্শনিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল দার্শনিক জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিখ হেগেলের। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেন বলে মার্কস মনে করেছিলেন। তাই আমরা প্রথমেই দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।

হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব

হেগেলীয় দর্শনে মূলতত্ত্ব হল ডায়ালেকটিক নীতি, যাকে এক কথায় "বিরুদ্ধ-সমন্বয়-নীতি" (Synthesis of opposites) বলা হয়[৫]। ম্যাক্ টাগার্ট (Mc Taggart) বলেছেন, দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের সমন্বয় সাধনই হেগেলের তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য। হেগেল বলেন, বাহ্যজগত ও অন্তর্জগতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও পার্থক্য নেই। আমরা আমাদের বোধের (understanding) সীমাবদ্ধতার কারণে জড় ও চেতন, বাহির ও ভিতর—এই দু'টিকে পৃথক বলে মনে করি। তবে এই দুই জগত এক ব্যাপক সত্তার প্রকাশ বলে জড় জগত ও চেতন জগত একই ধারায়, একই নীতি অনুসারে চালিত হয়। এই দুই জগতের সকল ঘটনা, সকল পরিবর্তন একই তত্ত্বের নির্দেশে ঘটে। সেই নীতি বা তত্ত্ব হল 'ডায়ালেকটিক বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি'।

---

[৫] Russell, B. *History of Western Philosophy*

হেগেলের মতে, সংকীর্ণ বোধের প্রকৃতি হল বিশ্বের সমস্ত কিছুকে সীমায়িত করে দেখা। যার জন্য বিশ্বের যাবতীয় বস্তু খণ্ডিত, অচল, অনড় বলে বিবেচিত হয়। আবার এই সমস্ত খণ্ড সত্তাকেই আমরা স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ সত্তা বলে ভুল করি। বস্তুকে এরূপ অনড় বিচ্ছিন্ন বলে মনে করাই খণ্ডবুদ্ধির (Understanding) স্বধর্ম। কিন্তু হেগেলের মতে, বিশ্বে কোনও বস্তুই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। খণ্ডবুদ্ধির কারণে যাদের স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় তারা প্রকৃতপক্ষে তেমন নয়। প্রত্যেকটি বস্তু বিশ্বলোকের অন্য প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত। ফলে তাদের কোনও একটিকে অগ্রাহ্য করে অন্যটিকে দেখা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি অণু পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও আসলে তারা নিখিল বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল সকল কিছুই দ্বন্দ্ব জনিত বলে হেগেল ঘোষণা করেন। আমরা মনে করি স্থায়ী, চরম বস্তু ভিন্ন সকল সীমিত বস্তুই পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। হেগেল দ্বন্দ্ব বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বুঝেছেন যার দ্বারা এই সকল সীমিত বস্তুগুলি তার নিজস্ব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়। হেগেল প্রতিষ্ঠিত ডায়ালেকটিক নীতি প্রযোজ্য হয় জড় জগতের প্রতিটি বস্তুতে। এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিটি বস্তু ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জড় জগতের কোনও বস্তুকে বুঝতে হলে অপরাপর বস্তুগুলিকেও বুঝতে হয়, যেহেতু জড় জগতের প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই একটিকে অস্বীকার করে অন্যটিকে জানা বা চেনা সম্ভব নয়। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনও পরম বিরোধ নেই। সবাই একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তাই একটি বস্তুকে বুঝতে হলে দেখা যায় সে অন্য বস্তুর দ্বারা খণ্ডিত (contradicted) হচ্ছে। অর্থাৎ কোনও বস্তুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি

বস্তুর অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় তদতিরিক্ত অন্য বস্তুর দ্বারা। হেগেলের ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর বিরোধী হল সেই বস্তুর 'বিপরীত সত্তা' (counterpart)। আবার এটাও দেখা যায় যে সেই বস্তু এবং তার বিপরীত সত্তা উভয়েই তাদের থেকে ব্যপকতর কোনও সত্তায় অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেই ব্যপকতর সত্তাও আবার খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হয় তার বিপরীত সত্তা দ্বারা। এবং এরা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে আরো বৃহত্তর সত্তার মধ্যে। এই ক্রম অনুসারে ধীরে ধীরে বহু স্তর অতিক্রম করে মানুষের জ্ঞান এমন এক দ্বন্দ্বহীন অবস্থায় উত্তীর্ণ হয় যেখানে সত্য জেগে থাকে অনাদি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য রূপে। হেগেলের মতে, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ধাপের পর ধাপকে নিরসন করে এই যাত্রা এগিয়ে চলে। এই পদ্ধতিকে ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বলা হয়। হেগেল বলেন, এই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসনের পরম্পরার একটি বিশেষ রীতি বা ধরণ আছে, যার প্রথম স্তর হল থিসিস (স্থিতি); এই ধাপকে যে স্তর খণ্ডন করে বা নিরসন করে বা বিরোধিতা করে তা হল অ্যান্টিথিসিস (প্রতিস্থিতি)। এরপর প্রতিস্থিতিকে নিরসন করে যে স্তর তা হল সিন্থেসিস (সংস্থিতি)। এই শেষ ধাপে পূর্বের দুই ধাপের অর্থাৎ স্থিতি ও প্রতিস্থিতির বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবসান হয়। কারণ এই তৃতীয় স্তর পূর্বের দুই স্তরের থেকে ব্যপকতম সত্তা এবং এখানে স্থিতি-প্রতিস্থিতি বৃহত্তর সাম্যে অবস্থান করে। এইভাবে হেগেল তাঁর ডায়ালেকটিক নীতিকে ব্যাখ্যা করেন।

হেগেল বস্তুজগতে যেরূপ পরিবর্তনকে স্বীকার করেছেন অনুরূপ পরিবর্তন ভাবজগতেও ঘটে বলে দাবী করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের বুদ্ধি তাকে যথার্থ জ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়। তার সীমিত বুদ্ধি যখনই কোনও বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে তখনই নিজের অসম্পূর্ণতা তার কাছে ধরা পড়ে এবং ওই বস্তুর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্য বস্তুর দিকে মানুষের মনন চেতনা ধাবিত হয়। খণ্ডবুদ্ধি নিজেই নিজেকে পরিত্যাগ

করে বা অতিক্রম করে সীমার অতীতে জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তার করে। হেগেলের মতে, এই খণ্ডবুদ্ধিও এমনই যে চরম বা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছলে তার বিপরীত অবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। খণ্ডবুদ্ধি নিজেকে অতিক্রম করে আত্মবিরুদ্ধতার দ্বারা তার বিপরীত মননের দিকে ধাবিত হয়। হেগেলের মতে, আমাদের বুদ্ধি বা মননের সকল ক্রিয়ার মূলে এক বিশেষ প্রবণতা থাকে। যার ফলে নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে যা তার স্বভাব বিরুদ্ধ (own opposite) সেখানে তার উত্তরণ ঘটে। আত্মবিরুদ্ধ সত্তার প্রতি এই উন্মুখতাকে হেগেলীয় ভাষায় চিন্তার ডায়ালেকটিক পদ্ধতি বলা হয়। এই তত্ত্বে বলা হয় প্রত্যেক চিন্তাই নিজেকে নিরসন (negating) করে অনবরত বিকশিত হয়। আসলে হেগেল প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে কোনও বস্তুই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নয়। কারণ নিখিল বিশ্বের সঙ্গে তার ঐক্য আছে। তাই এর কোনও অংশকে বিচ্ছিন্ন করে, খণ্ডিত করে দেখা যায় না। প্রত্যেক খণ্ডিত সত্তা বা চিন্তা এই জন্য বিরুদ্ধতা দোষ যুক্ত। সে সর্বদাই নিজের সীমার বাইরে স্থিত অপরাপর সত্তার দিকে ধাবিত হয়। তাকে জানতে হলে তাকে অতিক্রম করে বা তাকে নিরসন করে তার বিভিন্ন বিপরীত সত্তাগুলিকে জানতে হয়। বলা হয় যে,

> Dialectic is the very nature and essence of everything predicated by mere understanding, the law of things and of the finite as a whole...But by Dialectic is meant the *indwelling tendency outwards* by which the one-sidedness and limitation of the predicates of understanding is seen in its true light, and shown to be the *negation* of them.

> For anything to be finite is just to suppress itself and put itself aside.[৬]

এই দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি মানুষের সকল মননের মধ্যে নিহিত থাকে। প্রত্যেক চিন্তাই নিজের ভিতরের প্রেরণায় নিজের বিরুদ্ধতা করে অপরে ব্যাপ্ত হয় বলে একে "indwelling tendency outwards" বলা হয়। খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানুষের মনন আবদ্ধ (স্থির) থাকতে পারে না বলে পূর্বের অবস্থাকে অতিক্রম করে মনন 'অপর' সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। এই 'অপর' সত্তাটি আবার একটি খণ্ডিত সত্তা। তাই তাকে নিরসন (negate) করে মনন এর থেকে ভিন্ন সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। এইরকম ভাবে মানুষের খণ্ডবুদ্ধি (Understanding) একটির পর একটি খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয় পূর্ণতর জ্ঞানের প্রতি। এভাবেই মনন ক্রমাগত নিজের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পূর্বাবস্থাকে অতিক্রম করে বা অস্বীকার করে নতুন নতুন অবস্থাতে পৌছায়। মননের স্বভাব হল এমন এক বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি অনুসরণ করে চলা। বলা হয়েছে "...thought in its very nature is dialectical and that, as understanding, it must fall into contradiction—the negative of itself."[৭]

হেগেলের মতে খণ্ডিত সত্যে মানুষের বুদ্ধির তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না বুদ্ধি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত মননশক্তির অগ্রগতি চলতে থাকে। সে কেবল ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করে নতুন এক ভূমিতে পৌঁছায় যেখানে সকল দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবসান হয়। বুদ্ধি যেমন খণ্ডিত সত্যকে জানে, তেমনি আবার সেই খণ্ড সত্যকে অতিক্রম করে

---

[৬] Wallace, W., *Logic of Hegel*, p. 147

[৭] Ibid, p. 18

যাবার তাগিদও তার থাকে। মনন শক্তির এই ধর্মকে হেগেল সমন্বয়ী বুদ্ধি (Reason) বলেছেন। খণ্ডবুদ্ধি (understanding) যেমন বিশ্লেষণাত্মক তেমনি ঐক্যবুদ্ধি সমন্বয়ী ধর্ম বিশিষ্ট (synthetic)। মানুষ এই সমন্বয়ী প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সকল অসংগতিকে অতিক্রম করে যেতে চায়। সকল প্রকার বিরোধের প্রতি মানুষের গভীরতম চেতনায় উপস্থিতি পরম বিরাগের উৎস এই ঐক্যবুদ্ধি। খণ্ডবুদ্ধির কারণে মানুষ যখন আত্মবিরোধিতায় আক্রান্ত হয় তখনই মানুষের এই উচ্চতর গভীরতম মনোবৃত্তি খণ্ডবুদ্ধিকে বাধা দিয়ে সকল বিরোধের সমাধান করে উচ্চতর সত্যে মানুষের মননকে নিয়ে যায়। মানুষের গভীর মনন খণ্ড সত্যকে অতিক্রম করে এমন এক ভূমিতে উত্তীর্ণ হয় যেখানে বিশ্বলোকের পরম ঐক্য ও চরম সংগতি প্রতীত হয়। এই সকল দ্বন্দ্বের অতীতে যে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা ছিল বা আছে তা সমগ্র দৃষ্টিতে বৃহৎ ঐক্য রূপে প্রকাশিত হলে এই নিতান্তই ক্ষুদ্র, সসীম ও অসম্পূর্ণ সত্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় এবং এদের পরস্পর বিরোধিতা সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। আমরা উপলব্ধি করি এই খণ্ডিত সত্য যে ঐক্যে বিধৃত হয়ে আছে তাই কেবল চরম সত্য। এই চরম সত্য অনাদি, অনন্ত ও চিরব্যাপক। হেগেল একেই পরম সত্য বলেছেন। মানুষ সত্যকে জানতে চায় বলে তার অনুসন্ধানের পথে মানুষের মনন পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। সীমিত, খণ্ডিত, আংশিক, ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করে সে বৃহৎ কোনও কিছুতে, পূর্ণতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃহৎ বলে যাকে সে মনে করেছিল সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পায় বৃহৎ নিজে খণ্ডিত। বৃহৎকে উত্তীর্ণ হতে হয় বৃহত্তরে। আবার বৃহত্তরকে উত্তীর্ণ হতে হয় বৃহত্তমে। এই রকম বহু স্তর অতিক্রম করে মানুষের মনন এক ব্যপকতম সত্তায় উন্নীত হয়। প্রতিটি স্তরে যেমন বিরোধ থাকে, তেমনি পরক্ষণে পরের স্তরের যাত্রা আরম্ভ হয়। এই পরের স্তরটি পূর্বতম

স্তরের থেকে উন্নততর ও পূর্ণতর। কিন্তু এটিও অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত বলে বোধ হয়। এইভাবে ক্রমানুসারে মানুষের জ্ঞান এক দ্বন্দ্বাতীত পর্যায়ে স্থিতি লাভ করে।

মার্কসবাদে হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা:

হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যাকে মার্কস ও এঙ্গেলস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে, হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে ভাববাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। হেগেল দেখাতে চেষ্টা করেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোনও কিছু স্থির নয়। বস্তুজগৎ থেকে শুরু করে সমস্ত সত্তা ও ধারণা এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার দ্বান্দ্বিক প্রকাশের পরিণতি মাত্র। এই পরমাত্মা প্রতি মুহূর্তে নতুন সত্তাকে সৃষ্টি করে এবং পুরনো সৃষ্টিকে অতিক্রম করে। এই অবিরাম সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় সে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই জগতের সমস্ত কিছু চলমান ও পরিবর্তনশীল। এই দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রেক্ষিত থেকে হেগেল আত্মার ক্ষমতাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার, যা মানুষের যাবতীয় চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু হেগেল এই পদ্ধতিকে 'পরম ভাবসত্তা' আবিষ্কারের উপায় বলে ব্যবহার করার ফলে তিনি দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভাববাদী উপস্থাপনা করেছেন। হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বের নিয়মকে বস্তুজগত থেকে নিঃসৃত না করে ধারণা বা চেতনার মৌলিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা তাঁর কাছে প্রকৃতি ও ইতিহাসের যাবতীয় পরিবর্তনের মূলে আছে চেতনা, যে চেতনাকে তিনি পরম চেতনা (Absolute) বলেছেন। জগতের সমস্ত কিছু পরম চেতনার অংশ বলে তিনি একে জড়জগতের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এঙ্গেলস বলেন, হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিকাশের নিয়ম বলে গণ্য করেছিলেন। যে নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতিও বিকাশের ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু পরম ভাবসত্তায় এই বিকাশ

প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটার ফলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি এক সমাপ্তি বিন্দুতে এসে থেমে যায়।[৮] এই সমাপ্তি বিন্দু হল পরম ভাবসত্তা (absolute)। ফলে হেগেল এক পরম ভাব সত্তার ধারণায় বিকাশের নিয়মকে বিলীন করেছেন যেখান থেকে আর অগ্রসর হওয়া অপ্রয়োজনীয় ও অসম্ভব। এই ধারণায় পৌঁছে বিকাশের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। আসলে তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিকাশকে স্বীকার করলেন ঠিকই, কিন্তু যখন তিনি পরম সত্তা আবিষ্কার করলেন তখন সেই বিকাশকে অস্বীকার করলেন। এখানেই হেগেলের দর্শনের স্ববিরোধিতা বলে মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করেছিলেন।

এঙ্গেলস বলেন, হেগেলের দর্শন একদিকে যেমন বৈপ্লবিক অন্য দিকে তা রক্ষণশীল। তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির ধারণা বৈপ্লবিক; আবার পরমসত্তার ধারণা রক্ষণশীল। একদিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সকল রকমের গোঁড়ামির অবসান ঘটে, অন্যদিকে পরম সত্তার ধারণায় দর্শনের বৈপ্লবিক দিকটি আবৃত হয়ে যায়। এটি শুধুমাত্র দার্শনিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও সত্য।[৯] এঙ্গলসের মতে, হেগেলের দর্শনে রক্ষণশীলতার স্পষ্ট রূপ হল “যা কিছু বাস্তব সবই যুক্তি সঙ্গত”, এবং ইতিহাসের সমস্তকিছুই সার্বিক প্রজ্ঞার (পরম সত্তার) প্রকাশ। ফলে যা কিছু ঘটছে তা পরম সত্তার মানদন্ডে যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গতা নির্ধারিত হয় পরম সত্তার মানদন্ড অনুযায়ী। হেগেলের এই মতকে মান্যতা দিলে যে কোনও স্বেচ্ছাচারি রাজতন্ত্রকে যুক্তিসঙ্গত বলতে হয়। কারণ তা সার্বিক প্রজ্ঞার (পরম সত্তার) প্রকাশ।[১০]

---

[৮] মার্কস ও এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪৩

[৯] তদেব, পৃ ১৪২-১৪৩

[১০] মার্কস ও এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলী*, ১০ম খণ্ড, পৃ ১৪০-৪১

ফয়েরবাখ: বস্তুবাদের আত্মপ্রকাশ

হেগেলের এই দর্শন ভাবনার মূলে আঘাত করলেন জার্মান দার্শনিক লুডভিগ ফয়েরবাখ। তিনি এই ভাববাদী দর্শনকে সমালোচনা করে বস্তুবাদী দর্শনের কথা বলেছিলেন[১১]। ফয়েরবাখের চিন্তাধারা ও রচনাসমূহের বৈশিষ্ট্য হল, তিনি ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ বিশ্লেষণ করে ভাববাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রমাণ করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার মূল চরিত্র যে ভাববাদ তাও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। ফয়েরবাখের মতে, আত্মা জাতীয় কোনও বিমূর্ত সত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে হেগেল যে দর্শন রচনা করেছিলেন তা কখনই বাস্তবমুখী দর্শন নয়। কেননা হেগেলীয় পরম ভাবসত্তা আসলে বিশ্ববহির্ভূত এক স্রষ্ঠা ভিন্ন কিছুই নয়। ফয়েরবাখ বলেন, আমরা যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের অন্তর্গত তাই একমাত্র সত্য, এবং আমাদের চিন্তা ও চেতনা যতই অতীন্দ্রিয় বলে প্রতীত হোক না কেন তা একটি পদার্থময় অঙ্গ—মস্তিষ্কের সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ যখন তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে, অসহায় বোধ করে, সেই বোধ থেকেই এমন অতীন্দ্রিয় অধিবিদ্যক ধারণার জন্ম হয়, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবোধের জন্ম হয়। এই প্রেক্ষিতে *Essence of Christianity* গ্রন্থে ফয়েরবাখের বিখ্যাত উক্তি হল "ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে না, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে"[১২]। এই গ্রন্থে ফয়েরবাখ বলছেন, মানুষ প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন, এবং প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে বেড়ে ওঠে। তাই প্রকৃতি ও মানুষের অতিরিক্ত কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমাদের ধর্মীয় কল্পনায় যে সমস্ত উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয় সেগুলি মানুষের নিজেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্ব। ফয়েরবাখ ধর্ম ও অতিপ্রাকৃত শক্তির মূলে

---

[১১] মার্কস ও এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬

[১২] Feuerbach, Ludwing, *The Essence of Christianity*, trans. by Marian Evans, p. 12

আঘাত করে তাকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি ও মানুষ একমাত্র বাস্তব ও স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল। তার অতিরিক্ত আর কোনও শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা হলে তা কল্পনা বিলাসিতা বলে গণ্য হয়। তাই তিনি হেগেলের ভাববাদকে ধর্মতত্ত্বের নতুন সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই বলতে চাননি। ফয়েরবাখ বলেন, হেগেলের দর্শন শুরু হয়েছে একটা স্থির নির্দিষ্ট পরম ও বিমূর্ত ধারণা থেকে; স্পষ্টভাবে বললে হেগেলের দর্শন শুরু হয়েছে ধর্মতত্ত্ব থেকে।[১৩] তাই ফয়েরবাখ হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বাতিল করেছিলেন।

মার্কস দ্বারা ফয়েরবাখের দর্শনের সমালোচনা:

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করেছিলেন ফয়েরবাখ উনিশ শতকের বস্তুবাদের পথিকৃৎ হলেও তাঁর চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাঁদের মতে, ফয়েরবাখ ইতিহাস ও সমাজের ব্যাখ্যায় ধর্মের উৎপত্তি নির্দেশ করে সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মকে মানব চেতনার উচ্চতম স্তর বলে মনে করে ধর্মের ভাববাদী রহস্যে মানব অস্তিত্বকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। মানুষের নীতিবোধকেও তাই তিনি বাস্তব পরিবেশ ও সমাজ নির্দিষ্ট বিষয় থেকে আহৃত আদিম সুখান্বেষী মানব স্বভাবের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে কারণে বস্তুবাদী ভিত্তি হওয়া সত্ত্বেও ফয়েরবাখের তত্ত্ব প্রাচীন ভাববাদী সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাঁর ধর্মীয় ও নৈতিক দর্শনে এই ভাববাদী মতাদর্শ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে অস্বীকার না করে তাকে আরোও উন্নত করতে চেয়েছিলেন। ফয়েরবাখ যে ধর্মকে অস্বীকার করতে আগ্রহী ছিলেন না সেই ব্যাখ্যা Eugena Kamenka তাঁর *ফয়েরবাখের দর্শন* নামক গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা

[১৩] Marx, K., *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*, p 135-136.

করেন। সেখানে তিনি বলছেন, ফয়েরবাখের ধারণায় মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে ধর্ম হল প্রাথমিক বিষয়—যাকে বুঝতে হলে মানুষকে বুঝতে হবে। ধর্মকে এভাবে গুরুত্ব দানের অর্থই হল তিনি ধর্মকে অস্বীকার করার পরিবর্তে সেই অর্থটি প্রাঞ্জল করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই তিনি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করতে চাননি। কামেনকার কথায়,

> ...religion became for Feuerbach the fundamental phenomenon in the history of human culture; to understand it was to understand man. It was for this reason that Feuerbach was anxious to deny that he was an atheist: he had not come to destroy religion but to explain it.[১৪]

প্রকৃতপক্ষে কামেনকা ফয়েবাখের *Essence of Christianity* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে বলা কথাগুলিকে এখানে উপস্থাপন করেছেন মাত্র। সেখানে ফয়েরবাখ বলেছিলেন যে তিনি আস্তিকতা, অনুমান-নির্ভর দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে কাল্পনিক বিষয়গুলির বাস্তব রূপ দানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর কথায় "...hence I do nothing more religion—and to speculative philosophy and theology as well—then to open its eyes...i.e., I change the object as it is in the imagination into the object as it is in

[১৪] Kamenka, Eugene, *Philosophy of Ludwing Feuerbach*, p. 35

reality."[১৫] ফয়েরবাখ মানব হৃদয় নির্ভর নতুন এক ধর্মের কথা বলতে চেয়েছিলেন, এ ধর্ম মানুষকে একে অন্যের সঙ্গে প্রীতিমূলক সম্পর্কে সম্পর্কিত করবে এবং সেই ধর্ম তথাকথিত ধর্ম থেকে পৃথক হবে। শুধু তাই নয় মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগকে কেবল মানব হৃদয়ের ধর্মের পরিবর্তন দিয়েই পৃথক করতে হবে বলে তিনি মনে করতেন।[১৬] কিন্তু এঙ্গেলস বলেন ফয়েরবাখের এই দাবী ভ্রান্ত। কেননা কিছু ক্ষেত্রে ধর্মের পরিবর্তন বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সহযোগী হলেও সব ক্ষেত্রেই তার ভূমিকা ছিল এমন বলা যায় না। কেবলমাত্র খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ইসলামধর্মের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু প্রাচীন উপজাতীয় ধর্মগুলির ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতা লোপ পাওয়া মাত্রই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই মানুষের ইতিহাসকে কখনওই ধর্মের পরিবর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বলা যায় প্রকৃতি বা জগতের ব্যাখ্যায় ফয়েরবাখ বস্তুবাদী মত পোষণ করলেও মানব ইতিহাস ব্যাখ্যা করার সময় ভাববাদী মত প্রদান করেন।

এছাড়া এঙ্গেলস বলেন, ফয়েরবাখ হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা করতে গিয়ে একটি ভুল করেন। তিনি হেগেলের ভাববাদকে খণ্ডন করার সঙ্গেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকেও বর্জন করেন। ফলে ভাববাদের প্রভাব থেকে দর্শনকে মুক্ত করলেও সেই দর্শনকে তিনি যান্ত্রিকতার শিকলে বেঁধে ফেলেছিলেন। অর্থাৎ হেগেলের দর্শন সম্পর্কে ফয়েরবাখের মত যান্ত্রিক ও একপেশে বলে উপস্থাপিত হয়েছিল। এঙ্গেলসের মতানুযায়ী হেগেলের দর্শনের প্রভাব এত বেশী ছিল বলেই মানুষের মনোজগতের ওপরে তার গভীর প্রভাব পড়ে। কাজেই তাকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। আসলে প্রচলিত মতবাদকে সমালোচনা করতে হলে তার নেতিবাচক দিককে সরিয়ে রেখে ইতিবাচক দিকের

---

[১৫] Feuerbach, L. *The Essence of Christianity*, Preface. P. xiv

[১৬] মার্কস ও এঙ্গেলসের *রচনাসমগ্র*, ১০ ম খণ্ড, পৃ ১৬৩

আলোচনাও করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আধারকে ধ্বংস করে তার নতুন আধেয়টি রক্ষা করা দরকার।[১৭] ফয়েরবাখ সেই কাজটি যথার্থ ভাবে করতে পারেননি। তিনি হেগেলের দর্শনের আধার (ভাববাদ) ও আধেয় (দ্বন্দ্বতত্ত্ব) দুটিকেই উপেক্ষা করেছেন।

মার্কসের মতে, ফয়েরবাখের বস্তুবাদের অন্যতম ত্রুটি হল সেখানে বস্তুকে কেবল বিষয় (অবজেক্ট) রূপে দেখা হয়, বিষয়ী (সাবজেক্ট) হিসেবে নয়। এই বস্তুবাদ বস্তুকে কেবল নিষ্ক্রিয় বস্তু রূপে গ্রহণ করে, মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া হিসেবে, ব্যাবহারিক কর্ম বলে গ্রহণ করে না। অর্থাৎ ফয়েরবাখের বস্তুবাদ সংবেদনশীল বস্তুর (sensuous object) মাধ্যমে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু তিনি মানুষের কার্যকলাপকে ব্যাবহারিক ও রূপান্তরকারী রূপে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মার্কস ফয়েরবাখের এমন বস্তুবাদকে চিন্তাশীল বস্তুবাদ (contemplative materialism) বলে সমালোচনা করেছিলেন যা বাস্তবতাকে স্থির এবং মানব সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে বিবেচনা করে। মার্কসের মতে, ফয়েরবাখের দৃষ্টিভঙ্গি শ্রম, উৎপাদন এবং সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের বস্তুগত অবস্থান গঠনে মানুষের সক্রিয় ভূমিকাকে উপেক্ষা করেছিল। মার্কস ফয়েরবাখ সংক্রান্ত থিসিসের পঞ্চম সূত্রে বলছেন, Feuerbach, not satisfied with abstract thinking, wants sensuous contemplation (*Anschauung*); but he does not conceive sensuousness as practical, human-sensuous activity. অর্থাৎ বস্তুকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে (objectively) ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু কর্তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে (subjectively) উপেক্ষা করা হয়েছে।[১৮] তাই তিনি বিষয় ও বিষয়ীর

[১৭] এঙ্গেলস, *ল্যুটভিগ ফয়েরবাখ ও চিরায়ত জার্মান দর্শনের অবসান*, পৃ ৫১

[১৮] মার্কস, কার্ল, "ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ", *রচনা সংকলন*, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৬

(বস্তু ও চেতনা) দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে যথার্থ ভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। সেজন্য ফয়েরবাখের বস্তুবাদ নিষ্ক্রিয় বস্তুবাদ তথা যান্ত্রিক বস্তুবাদে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস চিরায়ত জার্মান দর্শনের দু'জন বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল ও ফয়েরবাখের মতবাদকে অংশত গ্রহণ ও অংশত বর্জনের মধ্যে দিয়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণাকে গঠন করেন। মার্কস হেগেলের দ্বান্দ্বিকতাবাদকে সাদরে গ্রহণ করলেও তাঁর ভাববাদী মনোভাবকে গ্রহণ করেননি। আবার ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে গ্রহণ করলেও তিনি যে দ্বান্দ্বিকতা বিরোধী মত দিয়েছিলেন সেটি অস্বীকার করেন। এই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক দ্বয়ের প্রভাবে মার্কস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধারণায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্বরূপ

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এই দর্শনের দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় বস্তুবাদের ভিত্তিতে, আর বস্তুবাদ সমৃদ্ধ হয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের মাধ্যমে। বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মাধ্যমে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তথা মার্কসীয় দর্শন গড়ে ওঠে। এই দর্শনকে দ্বান্দ্বিক বলা হয় কারণ তা বস্তুজগতকে প্রতিনিয়ত গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের ধারায় বিচার করে। ষ্ট্যালিন বলেন, "একে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলা হয় কারণ, বস্তুজগতের ঘটনা প্রবাহের প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি ও সেগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার পদ্ধতি হল দ্বান্দ্বিক। আর বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, সে সম্পর্কে এর ধারণা ও তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী।"[১৯] তাই আমরা মার্কসীয় দর্শনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে উপস্থাপন করব। মার্কসীয় দর্শন ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এক ও অভিন্ন বলে গ্রহণ করব।

[১৯] স্ট্যালিন, *দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, পৃ ৩

মার্কসীয় দর্শন অনুসারে বস্তুজগৎ বস্তুসমূহের পূর্বগঠিত কোনও জটিল সমবায় নয়। তা নানান প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার, যেখানে প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি ও ধ্বংস ক্রিয়ার মাধ্যমে অবিরাম পথ পরিক্রমা করে। এই মতানুসারে বস্তু সর্বদা গতিশীল এবং এই গতিশীলতা বস্তুর স্বরূপ। বস্তুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। গতি বস্তুর স্বরূপ বলে তা বাহ্যিক শক্তির কারণে সঞ্চারিত না হয়ে তার অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে সঞ্চারিত হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ জগতের অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন, স্বতন্ত্র একক বলে মনে করে না। এই মতাদর্শ পরিবর্তন ও বিকাশের অবিরত প্রক্রিয়ায় যুক্ত বস্তুসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভিত্তিতে জগতকে ব্যাখ্যা করে।[২০] দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একটি বিকাশের তত্ত্ব যা জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনাগুলিকে নিশ্চল অপরিবর্তনীয় বলে না দেখে সমস্ত কিছুকেই প্রতিনিয়ত বিকাশমান সত্তা বলে বিচার করে। সেখানে যেহেতু চূড়ান্ত বা অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই তাই তা অধিবিদ্যা বিরোধী এক মতবাদ। অর্থাৎ তা স্থির পরম সত্তার ধারণার বিরোধী। জগতের সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল বলে তা অধিবিদ্যক নয়, তা হল দ্বান্দ্বিক বিকাশ। বস্তুজগতের সমস্ত কিছুই উদ্ভব ও বিলয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বিকশিত হয়। এঙ্গেলসের মতে,

> দ্বান্দ্বিক দর্শনের কাছে চূড়ান্ত, পরম বা পূত বলে কিছু নেই। এ দর্শন সমস্ত কিছুর মধ্যে অনিত্যতা প্রকাশ করে। তার সামনে উদ্ভব ও বিলয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা ছাড়া, নিম্ন থেকে উচ্চতর অবস্থায় শেষহীন উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই টিঁকতে পারে না। এবং দ্বান্দ্বিক দর্শন নিজেই আসলে চিন্তাপরায়ণ মস্তিষ্কে এই পদ্ধতির প্রতিবিম্ব মাত্র। তার একটি রক্ষণশীল

---

[২০] কর্ণফোর্থ, মরিস, *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ,* অনু- ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৫১-৫২

দিকও অবশ্যই আছে; এ দর্শন অনুসারে জ্ঞান ও সমাজের বিকাশের নির্দিষ্ট এক-একটা পর্যায় তাদের কাল ও পরিস্থিতির পক্ষে সংগত, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির রক্ষণশীলতাটুকু আপেক্ষিক, এর বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনাপেক্ষিক—একমাত্র এই পরমটুকু দ্বন্দ্বতাত্ত্বিক দর্শনে স্বীকৃত।[২১]

বস্তু বা প্রক্রিয়াকে তার গতি ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক সম্বন্ধ দিয়ে বিচার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে স্তালিন বলেন, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে প্রতিনিয়তই "আবর্তন ও বিবর্তনের ক্রিয়া চলছে; প্রতিক্ষণেই কোন না কোন নতুন বস্তুর আর্বিভাব ও বিকাশ হচ্ছে।"[২২] উৎপত্তিশীল ও বিকাশশীল কোনও কিছু যখন ফললাভ করে এবং যখন পতনশীল কোন কিছু চিরতরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই নতুন কিছুর উদ্ভব হয়। এটি হল বিকাশ (development) শব্দের প্রকৃত অর্থ। নতুন কিছু যখন ক্রমপর্যায়ে অগ্রসর হয় তখন আমরা বিকাশের কথা বলি। নিছক পরিবর্তন (change) আর বিকাশের (development) মধ্যে পার্থক্য আছে। নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়মে ক্রম পরিবর্তনের নামই বিকাশ।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিকাশ বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। মরিস কর্ণফোর্থ (Maurice Conforth) বিকাশকে বোঝার জন্য পরিমাণগত পরিবর্তন এবং গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করার কথা বলেছেন। পরিমানগত পরিবর্তনে কেবল বস্তুর আয়তনের পরিবর্তন ঘটে, যেহেতু সেটি বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুণগত পরিবর্তনে বস্তুটির প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়, সেটি নতুন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হওয়ায় তার

---

[২১] মার্কস ও এঙ্গেলস, *নির্বাচিত রচনাবলী,* খণ্ড ১০, পৃ ১৪৩

[২২] স্তালিন, *দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ,* পৃ ১৫

অবস্থান্তর ঘটে। এই পার্থক্যকে বোঝার মধ্য দিয়েই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিকাশের স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিকাশ বলতে উন্নতিকে (growth) বোঝায় না। উন্নতি বলতে কেবল পরিমাণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। কিন্তু বিকাশ কেবল পরিমাণগত পরিবর্তন না; এ হল গুণগত ভাবে নতুন এক অবস্থায় রূপান্তর।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বস্তুজগতের বিকাশের নিয়মগুলিকে অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। বস্তু ও ঘটনা প্রবাহের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সার্বজনীন সম্পর্কের মধ্যে যে সাধারণ দিক ফুটে ওঠে তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রতিফলিত করে। কিন্তু বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহ বহুমুখী হওয়ায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ বহুমুখী হয়। কিন্তু এই দর্শন সমস্ত বহুমুখী দিকগুলিকে অধ্যয়ন না করে যেগুলি সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত সেই সাধারণ ঘটনাগুলির প্রতিই কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অর্থাৎ এই দর্শন অনুযায়ী বস্তু ও ঘটনা প্রবাহের যে কোনও সম্পর্ককেই নিয়ম বলা যায় না। কেবল যে সম্পর্কগুলি স্থায়ী, যাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের সর্বক্ষেত্রে যে সম্পর্কগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলিকে নিয়ম বলা হয়। অর্থাৎ অনিবার্য ও সার্বজনীন সম্পর্কই নিয়ম বলে চিহ্নিত হয়। বিকাশের এই সাধারণ নিয়ম বিষয়গত (objective), তা বিষয়ীগত (subjective) নয়। কেননা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই নিয়মগুলি বস্তুজগতের নিয়ম; এগুলির চেতনা নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তাই মানুষ নিজের ইচ্ছামত এই নিয়মের সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই নিয়মগুলি হল- পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের নিয়ম, বিপরীত ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়ম এবং নেতির নেতিকরণের নিয়ম।

বিপরীত ঐক্য ও সংগ্রামের নিয়ম: বস্তুজগতের এই নিয়ম বিকাশের মূল উৎসকে প্রকাশ করে। বস্তু বা ঘটনাপ্রবাহের সহজাত বৈশিষ্ট্য হল বৈপরীত্য বিরোধী ঝোঁক বা

প্রবণতা। এই সহজাত বৈশিষ্ট্যের ফলে বস্তুজগতে গতি ও পরিবর্তনের সঞ্চার হয়। স্ট্যালিনের মতে, “প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যেকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব হল সহজাত ব্যাপার। কারণ তাদের সকলের মধ্যে একটি নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক আছে, অতীত ও ভবিষ্যতের দিক এবং ধ্বংস ও সৃষ্টির দিক আছে।”[২৩] বস্তু বা ঘটনার এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য কোনও আকস্মিক বা বাহ্যিক কারণের ফল নয়। তা বস্তু বা ঘটনাপ্রবাহের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের ফল। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তু দুটি বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অপর বস্তু থেকে পার্থক্য বজায় রাখার প্রবণতা থাকার সঙ্গেই সমরূপ ঘটনা বা বস্তুর সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের প্রবণতা বর্তমান। এই বৈপরীত্য হল বস্তুজগতের সাধারণ ও সার্বজনীন প্রকৃতি। এমন কোনও বস্তু বা ঘটনা নেই যেখানে এই বিরোধ থাকে না। প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে চুম্বকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্য যুক্ত বলে তারা একে অন্যের থেকে ভিন্ন। অথচ এই দুই মেরু একত্রিত হলে চুম্বক পরিণত হয়। একটি চুম্বককে যতই খণ্ডে বিভক্ত করা হোক না কেন তার এই দুটি মেরু থাকবে। এই দুই মেরুকে পৃথক করা কখনও সম্ভব নয়। একই ভাবে বস্তুজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈপরীত্য ও ঐক্যের প্রক্রিয়া থাকে। ঐক্য প্রক্রিয়ায় দু’টি বিরুদ্ধ দিক একে অপরের থেকে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের জন্য অপরিহার্য। বস্তুজগতের বা ঘটনায় বিপরীত প্রবণতাগুলি এমন ভাবে থাকে যে তাদের একটিকে অস্বীকার করে অপরটি অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই অবস্থাকে বস্তু বা ঘটনার অন্তর্দ্বন্দ্ব বলা হয়। তাই বলা যায় বস্তু বা ঘটনার প্রকৃতিতেই প্রকৃত অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত থাকে। বস্তু বা ঘটনার

---

[২৩] স্ট্যালিন, *দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, পৃ ৯-১০

প্রবাহের এই বিরোধী প্রবণতাগুলি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকলেও তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করে না। বৈপরীত্যের ঐক্যে বিরোধী শক্তিগুলিই বিপরীত সংগ্রামের জন্ম দেয়। তাই বলা যায়, যেহেতু বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ তাই বিপরীত সংগ্রাম অনিবার্য। বৈপরীত্যের ঐক্যের কাঠামোর মধ্যেই বিপরীতের সংগ্রাম নিহিত থাকে। এই সংগ্রাম তীব্রতর হয় নতুন ও পুরনোর মধ্যে। বৈপরীত্যের সংগ্রামে এই পুরনো ঐক্যের পরিবর্তন হয়ে নতুন ঐক্যের জন্ম হয়। এই নতুন ঐক্য আবার নতুন সংগ্রামের জন্ম দেয়। এই ভাবে বস্তুজগতের বিকাশ ঘটে। লেনিন তাই "বিপরীতের সংগ্রামকেই বিকাশ"[২৪] বলেছেন।

পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তর: এই নিয়মের মাধ্যমে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এই নিয়মের দ্বারা পরিবর্তন বা বিকাশ কেমন করে ঘটে তা বলা হয়। প্রতিটি বস্তুর গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থাকে। বস্তুর গুণগত দিক হল এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে বস্তুকে চিহ্নিত করা যায়, তাকে অন্য বস্তু থেকে পৃথক করা যায়। এই গুণ বস্তুর অভ্যন্তরীণ ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য যা তার পরিচয় সুনিশ্চিত করে। এই গুণ প্রকাশিত হয় বস্তুর বিশেষ ধর্মে। বস্তুর বিশেষ ধর্ম হল এমন বৈশিষ্ট্য বা উপাদান বা দিক যা বস্তুর একটি বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করে। বস্তুর এই বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্মিলিতভাবে যে সমগ্রের ধারণা তৈরী হয় তা হল বস্তুর গুণ। অন্যদিকে পরিমাণ বস্তুর বিকাশের মাত্রাগত দিককে নির্দেশ করে। যার দ্বারা বস্তুর ওজন, আয়তন ও সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাই পরিমাণ বলতে কোনও বস্তুর আয়তনগত পরিবর্তনের ফলে তার হ্রাস-বৃদ্ধিকে বোঝায়।

---

[২৪] Lenin, *Philosophical Notebook*, p. 360

গুণ ও পরিমাণ একই বস্তুর দুটি দিক। তাই তারা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার বস্তুর গতি ও পরিবর্তনের ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রত্যেকটি পরিবর্তনের গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে। গুণগত পরিবর্তন হল বস্তুর নিজের পরিবর্তন, অন্য বস্তুতে রূপান্তর। অন্যদিকে পরিমাণগত পরিবর্তন হল একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত বস্তুর বৃদ্ধি বা হ্রাস। এর ফলে কিন্তু বস্তুর স্বরূপের পরিবর্তন হয় না। বস্তুর গুণ ও পরিমাণের মধ্যে যে ঐক্য তাকে নির্দিষ্ট মাত্রা বা পর্যায় বলা যায় যা বস্তুর অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে বজায় রাখে। পরিমাণগত পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে কেননা তা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে হঠাৎ করে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিমাণগত পরিবর্তন নির্দিষ্ট পর্যায়ে না এলে গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হয় না। যেমন, জলকে যখন উত্তপ্ত করা হয় বা শীতল করা হয় তখন স্ফূটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক হল জলের সেই নির্দিষ্ট পর্যায় বা মাত্রা যখন স্বাভাবিক চাপে পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হয়।[২৫]

পরিমাণগত পরিবর্তন সংগঠিত হয় ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে, সেখানে কোনও রকম ছেদ থাকে না। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন সংঘঠিত হয় আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ করে বা উল্লম্ফনের আকারে। পরিমাণগত পরিবর্তনে নির্দিষ্ট পর্যায়ে এমন একটি গুণের আবির্ভাব হয় যা আগে ছিল না। এভাবে অবিরাম ভাবে ধীর লয়ে পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে হঠাৎ করে গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হয়। কেবল পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন নয়, গুণগত পরিবর্তন থেকে পরিমাণগত পরিবর্তনও ঘটতে

---

[২৫] এঙ্গলস, *এ্যান্টি ড্যুরিং*, পৃ ১৬০

পারে। কর্ণফোর্থ বলেন "একটি শুঁয়োপোকা যেমন লম্বা আর মোটা হতে হতে নিজেকে পাকিয়ে রেশম গুটিতে পরিণত করে অবশেষে প্রজাপতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।"[২৬]

নেতির নেতিকরণের নিয়ম: এই নিয়মের সাহায্যে বস্তুজগতের প্রবণতাকে প্রকাশ করা হয়। বিকাশের প্রক্রিয়ায় এমন কিছুর সৃষ্টি হয় যা পূর্বাবস্থা থেকে উন্নত বা শ্রেষ্ঠ হলেও পূর্বেই সুপ্তভাবে ছিল। পূর্বাবস্থায় যা সম্ভাবনা রূপে সুপ্ত ছিল তাই প্রকাশিত হয় নতুন সৃষ্টিতে। নেতির নেতিকরণের নিয়মের দ্বারা নতুন সৃষ্টির এরূপ প্রবণতাকে বোঝায়। এই নিয়মকে বুঝতে হয় নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়ায়। কেননা বস্তুজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভব ও বিলয়ের প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ্বে পুরনো কখনোই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না, নতুন সৃষ্টির সঙ্গেই তাকে বিদায় নিতে হয়। এভাবেই নতুনের দ্বারা পুরনোর নেতিকরণ হয়। তাই বলা যায় বিকাশ সম্ভব হয় পুরনো অবস্থার নেতিকরণের মাধ্যমে। নেতিকে তাই বিকাশের একটি অপরিহার্য শর্ত বলা হয়। নেতি ভিন্ন কোনও বিকাশ হতে পারে না। মার্কস লিখছেন, "No development can take place in any sphere unless it negates its old forms of existence."[২৭] এই বিকাশ হল নতুনের দ্বারা পুরনোর প্রতিস্থাপন, পুরনোর ধ্বংস আর নতুনের সৃষ্টি। আর নেতি হল নতুনের দ্বারা পুরনোকে অতিক্রম। পুরনো অবস্থার মধ্যে নতুন অবস্থার উদ্ভব ও পরিপূর্ণতা অর্জন। তাই নেতিকে নতুন উচ্চতর গুণগত পর্যায়ের আবির্ভাব বলা হয়। বিকাশের ধারায় এই নতুন পর্যায় যখন পুরোনো পর্যায়কে অস্বীকার করে তখন পুরোনো পর্যায় ও তার প্রতি বিরোধিতা থেকে নতুনের উদ্ভব হয়। পুরোনো পর্যায়ের ভিতরে নতুন

---

[২৬] কর্ণফোর্থ, মরিস, *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ*, অনু- ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৭১

[২৭] Marx K., "Moralising Criticism and Critical Morality", *Marx and Engels collected works*, vol. 6, p 317.

পর্যায়ের শর্তগুলির সৃষ্টি হয় ও পূর্ণতা লাভ করে। এভাবে নেতি প্রগতির শর্ত রূপে ক্রিয়া করে।[২৮]

এই নেতি বাহ্যিক কোনও কারণের দ্বারা সম্ভব নয়, তা বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিকাশের ফল। প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরীণ বিকাশের দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে বস্তু বিকশিত হয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণেই বস্তু নিজের পূর্বাবস্থার বিনাশ করে নতুন উন্নততর গুণগত অবস্থা সৃষ্টির শর্তাবলীর জন্ম দেয়। এভাবে নেতি হল বস্তুর নিজস্ব গতি ও বিকাশের ফল। তাই বলা হয়েছে,

> Negation is not something introduced into an object or phenomenon from outside, but is the result of the object's or phenomenon's own internal development. Objects and phenomena are contradictory and develop on the basis of their internal opposites; they themselves create the conditions for their destruction, for the passage into a new, higher quality.[২৯]

বস্তুর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে বিকাশের শর্ত। তাই নতুনের দ্বারা পুরনোকে অতিক্রম করার সময় পুরনোকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে না। অধিবিদ্যায় নেতি-কে নঞর্থক অর্থে গ্রহণ করা হয়। সেখানে নেতি বলতে পূর্বাবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করাকে বোঝায়, সেখানে পুনরায় বিকাশের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে নেতি সম্পূর্ণভাবে

---

[২৮] কর্ণফোর্থ, মরিস, *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ*, অনু- ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৩৫

[২৯] Afanasyev, V., *Marksist Philosophy: A Popular Outline*, p. 124

নঞর্থক অবস্থা নয়।[৩০] সেখানে নেতির একটি ইতিবাচক দিকও থাকে। সেখানে পুরনোকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা না করে তার মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ, যা উন্নত, উপযুক্ত তাকে গ্রহণ করা হয়, তাকেই উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। নেতিকরণের ফলে পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং নতুনের সৃষ্টি হয়। নতুনের এই সৃষ্টি কিন্তু অবিরাম ধারায় চলতে থাকে, কোনও পর্যায়ে তা স্তব্ধ হয়ে যায় না। তাই নতুন সব সময় নতুন থাকে না। বিকাশের প্রক্রিয়ায় তা পুনরায় নতুন কিছু সৃষ্টির পূর্বশর্ত প্রস্তুত করে। এই পূর্বশর্তগুলি যখন পরিপক্কতা অর্জন করে তখন আবার নেতিকরণ ঘটে। পূর্বের পুরনোকে নেতি করে যে নতুনের সৃষ্টি হয়েছিল এই নতুন হল তারই নেতিকরণ। অর্থাৎ আরো নতুন কিছুর দ্বারা নতুনের প্রতিস্থাপন ঘটে। একেই নেতির নেতিকরণ বলা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় নবতর বস্তু বা ঘটনার উদ্ভব হয়। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অগণিত নেতির ফলে বিকাশ সম্ভব হয়।

অধিবিদ্যা ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের স্বরূপকে বোঝার জন্য তাকে অধিবিদ্যামূলক মতবাদ থেকে পৃথক করে বোঝা প্রয়োজন। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে মার্কসীয় বস্তুবাদ অধিবিদ্যামূলক মতবাদ থেকে ভিন্ন। এই অধিবিদ্যামূলক মতবাদ ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয়ই হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হল অধিবিদ্যা কী? অথবা অধিবিদ্যামূলক চিন্তা পদ্ধতি কাকে বলে? দর্শন শাস্ত্রে অনেক সময় অধিবিদ্যা বলতে বিশ্বের চরম মৌলিক উপাদান অনুসন্ধানকে বোঝানো হয় বলে মার্কসবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন।[৩১] বিশ্বের এই চরম

[৩০] এঙ্গেলস, *অ্যান্টি ড্যুরিং*, পৃ ১৮০

[৩১] মরিস কর্ণফোর্থ, *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ*, পৃ ৫০

মৌলিক উপাদান কি সে বিষয়ে দর্শনে বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। সেই অনুযায়ী তাঁদেরকে আমরা নির্দিষ্ট প্রকারে বিভক্ত করে থাকি। তবে দার্শনিকেরা প্রত্যেকেই বিশ্বের চরম উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যদিও সেই সূত্র সকলের নিকট সমান ছিল না। তবে অনন্ত পরিবর্তনশীল বিশ্বকে এমন কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা যায় না বলে মার্কসীয় মতবাদ মনে করে। মরিস কর্ণফোর্থ তাঁর *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ* গ্রন্থে অধিবিদ্যামূলক চিন্তা পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, "অধিবিদ্যা মূলত চিন্তা করার এক বিমূর্ত পদ্ধতি।"[৩২] তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। যদি বলা হয় 'মানুষের দুটি হাত আছে'—তাহলে মানুষের অন্যান্য যে সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি থাকে সেগুলি থেকে পৃথক করে কেবল বিমূর্ত হাত নিয়ে চিন্তা করা হয়। এক্ষেত্রে রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি বিশেষ ব্যক্তির হাতের স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে সাধারণত সকল মানুষের হাতের সাধারণ ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করা হয়। তাই অধিবিদ্যা আমাদের ভ্রান্ত ও বিপথগামী বিমূর্তন সৃষ্টি করে বলে কর্ণফোর্থ মনে করেছেন। আসলে অধিবিদ্যা হল এমন এক চিন্তা পদ্ধতি যেখানে প্রতিটি বিষয়ের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি চিরকালের জন্য স্থির ভাবে নির্ধারিত হয়। অধিবিদ্যা মনে করে যে প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট চরিত্র ও নির্দিষ্ট গুণাবলী আছে যা অপরিবর্তনীয়।[৩৩] আসলে এই অধিবিদ্যা 'প্রক্রিয়া' নয়, 'বস্তুর পরিপ্রেক্ষিত' থেকে চিন্তা করে। এই বিদ্যা এক নির্দিষ্ট সূত্রের মধ্যে সমস্ত কিছুর সারসংক্ষেপ করতে চায়—যে সূত্র অনুযায়ী বিশ্বকে অথবা বিশ্বের অংশগুলিকে কিছু নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন ও নির্দিষ্ট বস্তুর সমষ্টি বলে গণ্য করতে চায়। এই ধরণের সূত্রকে

---

[৩২] তদেব, পৃ ৪৮

[৩৩] মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবেই অধিবিদ্যাকে দেখা হয়।

কর্ণফোর্থ ‘অধিবিদ্যক সূত্র’ বলতে চেয়েছেন। তবে এমন ধরনের সূত্রকে অধিবিদ্যক বলে প্রথম চিহ্নিত করেন দার্শনিক হেগেল।[৩৪]

কিন্তু সমস্ত বস্তু বা ঘটনা সমূহের গুণাবলি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থির একক বলে বিবেচনা করলে একটি ভ্রান্তি হয়। জগতের প্রতিটি বস্তু বা ঘটনাসমূহের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের অপরাপর বস্তুর সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক থাকে। তারা কখনওই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ও স্থিরভাবে থাকতে পারে না। সেজন্য আমরা যখন ‘ক’ বস্তুর পরিবর্তে ‘খ’ বস্তুকে শ্রেণীভুক্ত করি তখন তাদের মধ্যে বিপরীত বৈশিষ্ট্য থাকার ফলে সেই সূত্রটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কর্ণফোর্থ একটি বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন, পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবের পার্থক্য হিসাবে প্রকৃতিবাদীরা একটি সূত্রে বিশ্বাস করেন। এই সূত্রের ভিত্তিতে বলা হয় পাখিরা ডিম পাড়ে এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা শিশুর জন্ম দেয় ও স্তন্যপান করায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন প্লাটিপাস্ (Platypus) নামক জীব আবিষ্কৃত হল তখন এই সূত্র সেটিকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হল। কারণ প্লাটিপাস্ হল পাতিহাঁসের মত ঠোঁট যুক্ত এমন এক স্তন্যপায়ী অণ্ডজ প্রাণী যে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাদের স্তন্যপান করায়। এখন প্লাটিপাসের এই নিয়ম বহির্ভূত আচরণের ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদীদের পূর্বনির্ধারিত নিয়ম দ্বারা সম্ভব নয়। এই আচরণের ব্যাখ্যায় বলা যায় পাখি এবং স্তন্যপায়ী জীব উভয়ই আদিম অণ্ডজ প্রাণীর বংশধর। তাদের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই তারা এই অবস্থায় এসেছে। ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে পাখিরা ডিম পাড়লেও স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্লাটিপাসের মত কিছু প্রাণী আছে যারা পূর্বের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে আছে। তাই

[৩৪] এঙ্গেলস, *ল্যুটভিগ ফয়েরবাখ*, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ১৪৭

প্রকৃতিবাদীদের এমন শ্রেণীবিভাগ সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যক চিন্তা পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল সাবেকী যুক্তিবিদ্যা (Formal Logic)।[৩৫] যে যুক্তিবিদ্যাকে প্রথম সূত্রাকারে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল। এই সাবেকী যুক্তিবিদ্যা তিনটি সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত—যাদের ওপর ভিত্তি করে অধিবিদ্যামূলক[৩৬] চিন্তা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রগুলি হল—

ক। স্বকীয়তার সূত্র (Principle of Identity): এই নিয়ম অনুসারে 'ক' সর্বদা 'ক' রূপেই অবস্থান করে এবং এই অবস্থিতি অপরিবর্তনীয়।

খ। অ-বিরোধীতার সূত্র (Principle of Non-Contradiction): এই নিয়ম অনুসারে 'ক'-এর অবস্থিতি একইসঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে না।

গ। নির্মাধ্যতার নিয়ম বা মধ্যভাগ অবলুপ্তির নিয়ম (Principle of Excluded Middle): এই নিয়ম অনুসারে 'ক'-এর অবস্থিতি হয় ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক হবে। অর্থাৎ স্থিতি বা নেতি যে কোনও অবস্থাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত। স্থিতি ও নেতির মধ্যবর্তী অবস্থানকে সাবেকী যুক্তিবাদ স্বীকার করে না। সেজন্য এই দুই অবস্থা পরস্পর নিরপেক্ষ ও উভয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা (Dialectic Logic)। এই যুক্তিবিদ্যা অনুযায়ী 'ক'-এর অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই। কারণ 'ক'-এর অবস্থিতি এক মুহুর্তের জন্যও চূড়ান্তভাবে স্থায়ী নয়। 'ক' যেহেতু চলমান বস্তুজগতের

[৩৫] যাকে সাধারণ ভাবে অ্যারিষ্টটলিয়ান লজিক বা ক্যাটাগরিক্যাল লজিক বলা হয়।

[৩৬] এখানে মেটাফিজিক্সের আলোচ্য বলতে কেবল স্থির সত্তার কথা বলা হয়েছে, প্রক্রিয়াও মেটাফিজিক্সের আলোচ্য বলা হলেও মার্কসীয় দর্শনে তা বলা হয় না।

অংশ সেহেতু তা নিজেও পরিবর্তনশীল। তাই একটি বিশেষ মুহূর্তে 'ক'-এর যে অবস্থিতি তা আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল বলে মনে হলেও পরমুহূর্তে সেই অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ 'ক'-এর প্রতি মুহূর্তের অবস্থান তার পূর্বাবস্থার নেতিকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। তাই 'ক'-এর বাহ্যিক অবস্থিতি অপরিবর্তনীয় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থিতি একই সঙ্গে ইতিবাচক ও নেতিবাচক। দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তি হল বস্তজগতের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বস্তুজগতের পরিবর্তন সাধিত হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকে গতির সৃষ্টির হয় এবং গতিই পরিবর্তনের সূচনা করে।

এভাবেই মার্কস ও এঙ্গেলস বস্তুর দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে জাগতিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তাঁরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে এক সামগ্রিক দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতি যখন সমাজের প্রকৃতি ও রূপান্তরের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism) বলা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তার উৎপাদন কর্মে নিহিত বলে চিহ্নিত করা হয়। মানুষ যেহেতু চিন্তাশীলজীব সেহেতু যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে তার জগৎকে গঠন করে। সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনকে এক উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ ইমারত তৈরী করে। কিন্তু মার্কস মনে করেন, এই সমস্ত কিছুর মূলে আছে তার অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ভাবনা। এগুলি হল মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক উপকরণ। এই জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করাই হল তার প্রাথমিক কাজ। এই প্রাথমিক কাজকে অবহেলা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে মানুষের ইতিহাসকে জানতে হয়। এই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে সর্বপ্রথম জানতে হবে কীভাবে মানুষ তার জীবনধারণের উপকরণগুলি সংগ্রহ

করত। অর্থাৎ এখানে মানুষের বৈষয়িক কর্মের প্রকৃতি অনুসন্ধানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এককথায় মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রকৃতিকে জানার কথা বলা হয়। এই উৎপাদন কর্মে প্রাথমিক ও মৌলিক হাতিয়ার হল মানুষের শ্রম। এই শ্রমের সাহায্যে সে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে। তাই মার্কসবাদে বলা হয় কর্মের সঙ্গে মানুষের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তবে সে সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। কারণ প্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করার সময় মানুষ কেবল প্রকৃতির পরিবর্তন করে না, তার সঙ্গে নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। এইভাবে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে সে সামগ্রিক পরিবর্তনের নায়ক হয়ে ওঠে। তাই মার্কসের দৃষ্টিতে শ্রম কেবল জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, এটি মানুষের সত্তাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। শ্রমের মধ্যে দিয়েই মানুষ প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে এবং নিজেকে নির্মাণ করে। তাঁর ধারণায় ‘Labour is the expression of man’s species-being, a self-conforming activity through which man realizes himself as a human being.”[৩৭] অর্থাৎ মানুষ শ্রমের সাহায্যে নিজেকে চিনতে এবং গঠন করতে পারে। এটি কেবল একটি কার্যকলাপ নয়, বরং মানুষের অস্তিত্বের কেন্দ্র। তাই মার্কস শ্রমকে মানব প্রকৃতির রূপান্তরের সামর্থ্য বলে বিবেচনা করেছেন। এই শ্রমের দ্বারা মানুষ তার মানবিক প্রকৃতি প্রকাশ করে। তাই মার্কস মনে করতেন, প্রকৃত নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব তখনই হবে যখন মানুষ শ্রমের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

[৩৭] Fromm, Erich, *Marx’s Concept of Man*, p. 68

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোচনার মাধ্যমে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশের ধারা সম্পূর্ণ হয়। যদিও মার্কস পরবর্তী বিভিন্ন বস্তুবাদী দার্শনিক নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আমরা সেই সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা না করে এখানেই আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করছি। কারণ মানবেন্দ্রনাথ রায় কৃত বস্তুবাদী মানবতাবাদ আলোচনায় মার্কসীয় বস্তুবাদের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাই রায়ের বস্তুবাদ সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বেই তাঁর পূর্ববর্তী বিভিন্ন বস্তুবাদী ব্যাখ্যাগুলির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন প্রয়োজন ছিল। তবে আমাদের গবেষণায় কেবলমাত্র বস্তুবাদের ধারাকে চিহ্নিত করা লক্ষ্য নয়। বস্তুবাদী দর্শনের মাধ্যমে কীভাবে মানবতাবাদের উত্থান হয়েছে সেই সম্পর্কিত আলোচনা খুবই জরুরী। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে বস্তুবাদী মানবতাবাদের বিকাশ কীভাবে হয়েছে সেই সম্পর্কিত আলোচনা করব। পূর্বেই যেহেতু বস্তুবাদের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে তাই সেখানে কেবল মানবতাবাদের অর্থ নির্ণয় করেই বস্তুবাদী মানবতাবাদের বিকাশকে চিহ্নিত করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তুবাদী মানবতাবাদের বিকাশ

'মানবতাবাদ' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'হিউম্যানিজম্' (Humanism)। এটি ল্যাটিন শব্দ 'হিউম্যানাস' (Humanus) থেকে এসেছে। হিউম্যানাস শব্দটির অর্থ মানব-সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিষয়ক চিন্তাধারা। *Everyman's Dictionary*-তে Humanism শব্দের বিবিধ অর্থ করা হয়—"১. মানবজাতি বা মানব জীবন সম্পর্কিত চিন্তা বা চর্চা; মানবজাতির ইহজীবন, মনন, নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কিত ভাবনা। ২. মানব দরদী মনোভাব; মানবিকতা, মানবতাবাদ."[১] আবার, *The New Oxford Dictionary*-তে Humanism শব্দের অর্থ করা হয়েছে—"an outlook or system attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters."[২] অর্থাৎ মানবতাবাদ একটি এমন দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্ব যা কোনও ঐশ্বরিক বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পরিবর্তে মানুষকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। এটি রেনেসাঁর কালে উদ্ভূত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা মধ্যযুগের পণ্ডিতীয় ভাবনাকে বর্জন করে গ্রীক ও রোমান চিন্তার পুনরুত্থানে আগ্রহী ছিল। ১৮০৬ সালের দিকে "হিউম্যানিসমাস" শব্দটি জার্মানীতে পঠিত ধ্রুপদী পাঠ্যসূচীকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। ১৮৫৬ সালে জার্মান ইতিহাসবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানী Georg Voigt "হিউম্যানিজম" শব্দটিকে রেনেসাঁর সময়ে উদ্ভূত মানবকেন্দ্রিক ভাবনাকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। 'মানবতাবাদী' শব্দটির উপরিউক্ত ব্যবহার পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় শব্দ 'ইউমানিস্তা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে

---

[১] Ghosh, Gouri Prasad (ed.) *Everymans Dictionary*, P. 721

[২] Pearsall, Juddy (ed.) *The New Oxford Dictionary of English*, p. 893

মনে করা হয়, যা সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যিনি প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য নিয়ে শিক্ষকতা বা গবেষণা করেন। আবার *Routledge Encyclopedia of Philosophy*-তে হিউম্যনিজ্‌ম বা মানবতাবাদ কথাটিতে দর্শন সম্বন্ধীয় অর্থ প্রদান করা হয়। এখানে হিউম্যানিজ্‌ম বলতে পরস্পর সম্পর্কিত ধারণার পরম্পরাকে (series of interrelated concept) বোঝায়—যা মানুষের ক্ষমতা, শিক্ষা, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিতে হিম্যানিজ্‌মকে সুসঙ্গত এবং স্বীকৃত দার্শনিক মততন্ত্রকে (coherent and recognizable philosophical system) বলা হয়েছে যা বাস্তব সত্তাবিষয়ক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, নান্দনিক, শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক দাবীগুলির অগ্রগতির কথা বলে।[৩] দর্শনের অন্যান্য শাখার মতো আমরা মানবতাবাদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ এই ধারণাটি এতই বিস্তৃত যে কে মানবতাবাদী নয় তা নির্ধারণ করা কঠিন। তাই মানবতাবাদ বলতে ঠিক কী বোঝানো হয় সেটি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যেমন, কোনও এক ব্যক্তি মানবতাবাদ বলতে প্রাচীনকালের মানবতাবাদকে বুঝতে পারে; কেউ বা মানবতাবাদ বলতে রেনেসাঁ যুগের মানবতাবাদকে বুঝতে পারে। কেউ আবার কোনও বিশেষ একজন দার্শনিককে অনুসরণ করে তাঁর তত্ত্ব বা অন্দোলনকে মানবতাবাদ বলে দাবি করতে পারে। কারণ এই সব অর্থগুলিই উপরিউক্ত আলোচনাতে উঠে এসেছে। তাই মানবতাবাদের নির্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন। আমরা মানবতাবাদ বলতে মানুষ সম্পর্কিত আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। এই মানুষ নৈতিক সত্তা, যার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে; যে মানুষ কোনও অতিজাগতিক সত্তার অধীন

[৩] Craig, Edward (ed.) *Routledge Encyclopaedia of Philosophy*, Vol. 4, p. 528

নয়। নীতি অনুসারে স্বাধীনতার ভিত্তিতে মানুষের কার্যক্ষমতাকে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে সেই তত্ত্ব হল মানবতাবাদী তত্ত্ব।

দর্শনের জগতে এই মানবতাবাদী তত্ত্বের উদ্ভব খুব স্বাভাবিক ভাবে ঘটেনি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করার সময় দেখেছি প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্যে বস্তুবাদী ভাবনার উল্লেখ থাকলেও মানবতাবাদী কথা, মানুষের স্বরূপ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি। যে সামান্য আলোচলা সেখানে লক্ষ্য করা যায় তা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে নি। প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রভাবে ঢাকা পড়ে যায়। পরে আধুনিক যুগের সূচনায় রেনেসাঁ কালে জ্ঞানের যে স্ফূরণ ঘটে সেখানে প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার পুনরুত্থান সম্ভব হয়। এই বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার ঘটে বিজ্ঞানের হাত ধরে। বিভিন্ন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটলে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ভাবনা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে থাকে এবং বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি একটি যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব স্থাপন করে। পূর্বে ধর্মীয় চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে বিশ্বতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হলেও সেখানে যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব মানুষের মনকে ধর্মীয় চিন্তা মুক্ত করে। তাই রেনেসাঁ আন্দোলনে মানুষ যে বৌদ্ধিক সামর্থ্যে আস্থশীল হয় তার প্রভাব সমগ্র মানবজাতিকে আন্দোলিত করে। ফলে মহাবিশ্বের ধর্মতত্ত্ব ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষ এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে যেখানে সে বুদ্ধির আলোকে জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়। সে যে বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তা হল প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural Law) দ্বারা পরিচালিত একটি বিশ্বব্যবস্থার ধারণা।

মানবতাবাদী শিক্ষা প্রসারের ফলে মানুষের মন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভিমুখী হয়ে ধর্মীয় চিন্তার প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়। সেখানে বলা হয়,

> The sense of human dignity was the chief moral agent of antiquity, and sense of sin medievalism....It was not till the revival of learning had been considerably advanced, that a perception of the nobility of the heroic character dawned upon man's mind. Then, for the first time, the ecclesiastic type was obscured, a new standard and aspiration appeared, and popular enthusiasm taking a new direction achieved that political liberty which, once created, intensified the tendency that produce it.[8]

এই নতুন যুগের সূচনা হয় এমন মানুষদের দ্বারা যাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তিত না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা মানুষের অস্তিত্বের সমস্যাকে ধর্মতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করে যৌক্তিক ও নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছিলেন। সেখানে অতিপ্রাকৃতিক সত্তা প্রদত্ত অনুমোদনের কল্পকাহিনীকে অস্বীকার করে মানব বিষয় পরিচালনার জন্য বাস্তব সম্মত এবং ধর্মনিরপেক্ষ কোনও যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী সত্তার সন্ধান করেছিলেন। কিছু দিন পূর্বে যেখানে ঈশ্বরকে মানুষের সকল সমস্যা পরিত্রাণের উপায় বলে মনে করা হতো, আত্মা মুক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো সেখানে নতুন চিন্তা মানুষকে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী করেছিল। নতুন চিন্তায় শিক্ষিত মানুষ মনে করে,

---

[8] Lecky, W.E.H., *History of the Rise and influence of the Spirit of Rationalism in Europe*, p. 74

we have now to find human authority promoting intellectual advancement, and accepting as its maxim that the lot of man will be ameliorated and his power and dignity increased, in proportion as he is able to comprehend the mechanism of the world, the action of natural laws, and to apply physical forces to his use.[৫]

নতুন চিন্তাধারার অপর প্রাধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজনীতি থেকে ধর্মের বিযুক্তি। এ সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলিকেও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। এই রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকশিত হয়। পূর্বে মানুষ তথা সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে এক ঈশ্বরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা ছিল। যেমন, ১৪৮৬ সালে ইতালীর রেঁনেসীয় দার্শনিক জিওভানি পিকো ডেলা মিরান্ডোনা (Giovanni Pico della Mirandola) তাঁর *On the Dignity of Man* গ্রন্থে বলেছেন, মানুষকে যথার্থই বিস্ময়কর প্রাণী বলে গণ্য করার কারণ আছে। মানুষই ঈশ্বরসৃষ্ট শেষ জাতি যাকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন নিজেকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে গঠন করার। তিনি বলেছেন,

We have given to thee, Adam, no fixed seat, no form of thy very own, no gift peculiarly thine, that thou mayest feel as thine own, have as thine own, possess as thine own the seat, the form, the gift which thou thyself shalt

[৫] Draper, J.W., *A History of The Intellectual Development of Europe*, p. 5

desire. A limited nature in other creatures is confined within the laws written down by Us. In conformity with thy free judgment, in whose hands I have placed thee, thou art confined by no bounds; and thou wilt fix limits of nature for thyself. I have placed thee at the centre of the world, that form there thou mayest more conveniently look around and see whatsoever is in the world. Neither heavenly nor earthly, neither moral nor immortal have We made thee. Thou, like a judge appointed for being honourable, art the molder and maker of thyself; thou mayest sculpt thyself into whatever shape thou dost prefer. Thou canst grow downward into the lower natures which are brutes. Thou canst again grow upward from thy soul's reason into the higher natures which are divine.[৬]

অর্থাৎ আদম, তোমাকে কোনও নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট রূপ, সামান্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়নি যাতে তুমি তোমার নিজের মতো করে, তোমার ইচ্ছানুসারে নিজের স্থান, আকার, স্বাভাবিক গুণ অর্জন করতে পারো। অন্যান্য প্রাণী তাদের সীমাবদ্ধ প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে এবং আমাদের নির্ধারিত নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত বা

[৬] Mirandola, Giovanni Pico della, *On the Dignity of Man and Other Works*, trans. by Charles Glen Wallis, pp 4-5

বিচার কখনই সীমিত নয়। তোমার জন্য আমি কোনও সীমা নির্ধারণ করিনি। আমি তোমাকে পৃথিবীর কেন্দ্রে রেখেছি যাতে চারপাশের পরিবেশকে তুমি পর্যবেক্ষণ করতে পারো নিজের সুবিধা অনুসারে। তুমি স্বর্গীয় নও, জগতেরও নও; নৈতিক বা অনৈতিক বলেও তোমাকে সৃষ্টি করিনি। তোমাকে একজন বিচারকরূপে সম্মান করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। পিকোর মতে, মানুষের উচ্চ মর্যাদা তার নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে নিহিত নেই বরং মানুষের পছন্দ করার সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত। পিকো মানুষকে সেই বৌদ্ধিক স্বাধীনতা ব্যবহার করার কথা বলেন যা মানবেতর প্রাণীর আকাঙ্ক্ষার ন্যায় বর্বর নয়, আবার তা দেবদূতের ঐশ্বরিক প্রকৃতির ন্যায় উচ্চ মার্গেরও নয়। তাছাড়া ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন অধ্যয়নের জন্য বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে তোলা যায়। যার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া যায়। তাই পিকো ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলেছেন যাতে সে আত্ম-নির্মাণে সমর্থ হয়। সুতরাং এখানে মানবতাবাদের অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতার কথা থাকলেও মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট।

এই ধর্মকেন্দ্রিক ধারণার বিরুদ্ধে Hugo Grotius (1583-1645) তাঁর *The Law of War and Peace* (1625) গ্রন্থে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাবনা করেন। তিনি এই গ্রন্থে আধুনিক মানবতাবাদী চেতনা লালন করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের একচেটিয়া কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও সম্মানকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ধর্ম এবং রাষ্ট্র বা শাসকের অধিকার নেই মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার লঙ্ঘন করার। ফলে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমিত। তিনি ধর্মীয় কর্তৃত্বের বাইরে গিয়ে মানব চেতনার স্বাধীন বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক নীতির জ্ঞান (natural law) রয়েছে, যা যুক্তির (রিজন) মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাসের অতিরিক্ত এই সামর্থ্য সব মানুষের মধ্যে

বিদ্যমান। একই সঙ্গে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা যেমন, হেলভেটিয়াস, লা ম্যাটি, দিদেরো, হলবাখ প্রমুখ মানুষের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং যুক্তির উপর জোর দিয়েছিলেন। মানুষের নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও যুক্তির ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। মনুষ্যকেন্দ্রিক বিষয়সমূহকে প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের (natural law) ধারণাকে মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন[৭]। কারণ এমন ধারণা মানুষকে অতিপ্রাকৃত কোনও সত্তায় বিশ্বাস থেকে মুক্ত করেছিল। কারণ অতিপ্রাকৃত সত্তা হল এমন এক কাল্পনিক শক্তি যা মানুষ অনুধাবন করতেও পারে না, আবার তাকে অতিক্রম করতেও পারে না। অন্যদিকে প্রাকৃতিক নিয়ম (natural law) মানুষের জগতের অন্তর্গত বলে মানুষ এই নিয়মকে বুদ্ধির মাধ্যমে বুঝতে পারে। সেই নিয়ম কীভাবে কাজ করে তা জানতে পারে। ফলস্বরূপ এই নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণাটি অভিজ্ঞতালব্ধ বলে এতে রহস্যময় কিছু থাকে না। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক নিয়ম হল মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের (natural law) ধারণা মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিবাদীতা (innate rationality) থেকে উদ্ভূত। তবে এই স্বাভাবিক যুক্তিবাদিতা থেকেই ধর্মীয় চিন্তাভাবনার উদ্ভব বলে মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন। কিন্তু মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সময় তা ভিন্ন রূপে অবির্ভূত হয়েছিল। সেই জন্য রায় ধর্মকেও মানব ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে মনে করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের ফলে ধর্মীয় চিন্তাভাবনা সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক সভ্যতা আদর্শবাদে পরিণত হয়। রায় বলেন,

---

[৭] Roy, M.N., *Materialism,* p. 112

> The notion of Natural Law, therefore, results from the innate rationality of man. Religion also originated in that notion. In course of man's intellectual development, it appeared in different forms. It is human heritage and as such, enrich by expending scientific knowledge, entered into the structure of the ideological foundation of modern civilization.[৮]

তাই আধুনিকযুগের বিভিন্ন দার্শনিক এমন আদর্শমূলক দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বস্তুবাদী দার্শনিকেরা এই আদর্শমূলক তত্ত্বকে পরিহার করে, যদিও এই আদর্শমূলক দার্শনিক তত্ত্ব সর্বদা ক্ষতিকর এমন নয়। হেগেলের আদর্শবাদী চিন্তায় 'আত্মবিকাশের' ধারণা মানব মুক্তির চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই আদর্শমূলক ধারণার বিপরীতে ফয়েরবাখ ধর্মীয় বিমূর্ততা ভেঙে মানুষের অস্তিত্ব ও প্রেমকে বস্তুগত বাস্তবতায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। ফয়েরবাখ এবং হেগেলীয় ধারণা পরবর্তী সময়ে মার্কসকে মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করে।

মার্কস হেগেল ও ফয়েরবাখ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষকে এক সামাজিক ইতিহাস নির্ভর সত্তা রূপে দেখেন যার প্রকৃতি গঠিত হয় শ্রম, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমাজের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। মানুষের প্রকৃতি ব্যাখ্যায় মার্কস *থিসিস অফ ফয়েরবাখ* -এ বলেন, "The human essence is no abstraction inherent in each single

---

[৮] Roy, M.N., *Reason Romanticism and Revolution*, p. 111

individual. In its reality, it is the ensemble of the social relations."[৯] মানব সত্তা বলতে এমন কোনও বিমূর্ত ধারণাকে বোঝায় না যা প্রতিটি ব্যক্তিতে উপস্থিত। এ কোনও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়। এ হল সামাজিক সম্পর্কের ঐকতান। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে গঠিত। শ্রম, সমাজ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সমস্ত কিছু মিলিয়ে মানুষ নিজেকে তৈরী করে। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই আলোচনা করেছি যে মার্কস মনে করেন, শ্রমের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কারণ তা কেবল জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, সৃজনশীল শ্রম মানুষের সত্তাকে গঠন করে। শ্রমের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে এবং নিজেকেও নির্মাণ করে। কিন্তু সমাজব্যবস্থায়, বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মানুষ নিজেই নিজের শ্রম ও উৎপন্ন বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয় বলে নিজের স্বসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মানুষের সৃজনশীলতা হারিয়ে যায়। ফলে মানুষের মর্যাদা, চেতনা ও সম্ভাবনার অবমূল্যায়ন ঘটে। বিভিন্ন মার্কসবাদী দার্শনিক মার্কসের এই শোষণ ও বৈষম্য বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে এক ধরণের নৈতিক প্রতিবাদ বলে মনে করেন। তাই মার্কসীয় মানবতাবাদ মার্কসের দর্শনের একটি বিশেষ অংশ, যা মুক্তি, মর্যাদা ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তব জগতের প্রেক্ষাপটে মানুষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। তবে মার্কসীয় মানবতাবাদী ধারণা ঐতিহ্যবাহী মানবতাবাদ থেকে পৃথক। কারণ এখানে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য শ্রেণীসংগ্রাম, বৈপ্লবিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমিল বার্ণসের মতে, মার্কসবাদ হল জগৎ, জীবন এবং মানব সমাজ সম্পর্কে এক সাধারণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব মানুষের বাস্তব

[৯] Marx, K., *Theses on Feuerbach*, Theses VI.

অভিজ্ঞতার বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১০] তবে মার্কসীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যা বাস্তব জগৎ, চিন্তার জগৎ এবং রাজনৈতিক অনুশীলনে প্রযোজ্য। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক দিক হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজ ব্যাখ্যার পদ্ধতি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। মার্কস মনে করতেন সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্যই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদে মার্কস সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদে উৎপাদন বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মূল ভিত্তি বলে গণ্য করেন। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হল উপরিকাঠামো। তাই মার্কসবাদীরা প্রথমে ভিত্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে পরে উপরিকাঠামোতে মনোনিবেশ করেন। অর্থাৎ আগে অর্থনীতি, পরে সংস্কৃতি। তাঁরা মনে করেন, মানুষের জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ভিত্তিটাই প্রাথমিক বা মুখ্য উপাদান, এবং উপরিকাঠামো হল গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। অর্থাৎ এরা পরস্পরকে যুগপৎ দ্বান্দ্বিক ভাবে প্রভাবিত করে। তাই বলা যায়, মার্কস মানুষের অস্তিত্ব ও তার জীবন চর্চার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করে বাস্তব বিষয়ের (অর্থনীতি) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি প্রচলিত ভাববাদী তথা আদর্শবাদী তত্ত্বকে বর্জন করে বস্তুবাদের মধ্যে দিয়ে মানুষ তথা সামগ্রিক সমাজ কাঠামোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

মার্কসের মতোই আধুনিক যুগের দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও ধর্মকেন্দ্রিক মতবাদের বিপরীতে বিজ্ঞানভিত্তিক মানবতাবাদের কথা বলেছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে National

[১০] Burns, Emile, *What is Marxism*, p. 6

Secular Society-র এক সভায় *why I am not a Christian* নামক বক্তৃতায় বলেছিলেন,

> Science, can teach us and I think our own hearts can teach us, no longer to look round for imaginary supports, no longer to invent allies in the, but rather to look to our own efforts here below to make this world a fit place to live in, instead of the sort of place that the churches in all these centuries have made it. We want to stand upon our own feet and look fair and square at the world—its good facts, its bad facts, its beauties, and its ugliness; see the world as it is, and be not afraid of it. Conquer the world by intelligence, and not merely by being slavishly subdued by the terror that comes from it. The whole conception of God is a conception derived from the ancient oriental despotisms. It is a conception quite unworthy of free men. When you hear people in church debasing themselves and saying that they are miserable sinners, and all the rest of it, it seems contemptible and not worthy of self-respecting human being.[১১]

[১১] Russell, B. *Why I am not a Christian and The Faith of Rationality*, p. 26

অর্থাৎ, বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা দিতে পারে, আবার আমাদের হৃদয়ও এই কাজ করতে পারে। এ ব্যতীত আর কোনও কাল্পনিক সমর্থন নিরপেক্ষভাবেই আমরা এ জগতকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারি। রাসেল ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টায় গঠিত সমাজকে খ্রিষ্টীয় ধর্মগুরুর নিয়ন্ত্রিত সমাজ থেকে ভিন্ন বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ স্বনির্ভর হতে চায়—জগতকে স্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জানতে চায়। জগতের ভাল-মন্দ, সৌন্দর্য-কদর্যতা সকল দিককে স্বীকার করে নিতে হয়—ভয় পেলে চলবে না। তার বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করতে হবে—ঈশ্বরের ভয়ে ভীত হয়ে থাকলে চলবে না। তিনি বলেন, ঈশ্বরের ধারণা অতীত স্বৈরতন্ত্রের ধারণা থেকে অনুসৃত—যা স্বাধীন ব্যক্তির ধারণার পরিপন্থী। ধর্মভীরু মানুষ যখন নিজেকে পাপী বলে মনে করে হীনমন্যতায় জর্জরিত হয় তখন তা অত্যন্ত ঘৃণ্য মনোভাব যা মানুষের আত্ম-মর্যাদার বিরোধী। এখানে রাসেলও পিকোর মতো বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং মুক্তমনে ক্রিয়া করার সামর্থ্যের মধ্যে মানুষের মর্যাদা নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন। তবে এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। রাসেল মনে করেন, মানবতাবাদের স্বাভাবিক সহায়ক ধর্ম নয়, তা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের দ্বন্দ্ব চিরকালের। এখানে বিশ্বাস করা হয় মানুষ নিজের ক্ষমতার দ্বারা উন্নত জগৎ তৈরী করতে পারে, সেখানে ঈশ্বর নামক কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এই বস্তুবাদী অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক মানবতাবাদের বিপরীতে ফরাসী দার্শনিক জাঁ-পল-সার্ত্র ভিন্ন কথা বলেছিলেন। সার্ত্রও এমন বিজ্ঞান নির্ভর মানবতাবাদের কথা বলেননি। ১৯৪৫ সালে সার্ত্র *Existentialism is a Humanism* নামক বক্তৃতায় বলছেন, মানবতাবাদ শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল—যা মানুষকে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান করে। সার্ত্রর কথায়,

> Humanism in this sense appears, for instance, in Cocteau's story *Round the World in 80 Day's*, in which one of the characters declares, because he is flying over mountains in an aeroplane, 'Man is magnificent!'. This signifies that although I, personally, have not built aeroplanes I have the benefit of those particular inventions and that I personally, being a man, can consider myself responsible for, and honoured by, achievements that are peculiar to some men. It is to assume that we can ascribe value to man according to the most distinguished deeds of certain men. That kind of humanism is absurd, for only the dog or the horse would be in a position to pronounce a general judgement upon man and declare that he is magnificent, which they have never been such fools as to do—at least, not as far as I know.[১২]

সার্ত্রের এই কথাগুলি আমাদের পিকোর কথা মনে করায়। সার্ত্র এখানেও মানুষকে এক মহান আশ্চর্যকর প্রাণী রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেভাবে পিকো মানুষকে এক মহান আশ্চর্য ও বিস্ময়যোগ্য প্রাণী বলে বিবেচনা করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে।

[১২] J-P Sartre, *Existentialism and Humanism*, trans. by Philip Mairet, pp 54-55

সার্ত্র মানবতাবাদের দ্বিতীয় অর্থে বলছেন, মানুষের কোনও স্থির প্রকৃতি নেই, তাদের স্বাধীনতা অনুশীলনের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি নির্বাচন করতে পারে বা স্ব-নির্মাণ করতে পারে। তাঁর কথায়, "This is Humanism, because we remind man that there is no legislator but himself; that he himself, thus abandoned, must decide for himself."[১৩] যেহেতু অন্য কোনও ব্যবস্থাপক নেই তাই তাকেই নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বলাই যায় রাসেলের মতো সার্ত্রও মানবতাবাদকে নাস্তিকতার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। সার্ত্র মানুষকে পরিত্যক্ত বলেছেন কারণ তাঁর মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন কারণ তাঁর মতে ঈশ্বরের ধারণা মানব স্বাধীনতার বিরোধী। ঈশ্বরকে স্রষ্টা রূপে স্বীকার করলে বলতে হয় মানব সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর নিশ্চয় একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেন। তাঁর মতে মানুষের একটি পূর্বনির্ধারিত ধারণা আছে যে ধারণা অনুসারে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। একথা বলার অর্থ ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। তার অস্তিত্ব অন্য নির্ভর। এমন কথা স্বীকার করলে তা অস্তিবাদী ভাবনার বিরুদ্ধে যায়। তাই সার্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন।[১৪] সুতরাং বলা যায় সার্ত্র এবং রাসেল দুজনেই মানবতাবাদ শব্দটিকে ঈশ্বর বিশ্বাসের বিপরীতে মানব সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে সার্ত্র রাসেলের মতো বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা রাখেননি। কারণ তিনি মনে করেন, মানুষের ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিশ্বের কার্য-কারণ নির্ধারিত ঘটনাগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি কেবল মানুষের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে মানুষের বৈসাদৃশ্যের কথা বলেন। সার্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং

---

[১৩] Ibid, pp 55-56

[১৪] Sartre, J P, *Existentialism and Humanism*, trans. by Philip Mairet, pp. 27-28

ব্যক্তিকে বস্তুতে পরিণত না করা। এ জন্যই তিনি জড়বাদের বিরোধী, কারণ জড়বাদ ব্যক্তিকে বস্তুতে পরিণত করে এবং টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন জড়বস্তুর যেমন কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত বৈশিষ্ট্য থাকে ব্যক্তিকেও তেমনই কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণে গুণান্বিত করে। কিন্তু সার্ত্র ব্যক্তিকে মূল্যবোধের আধার রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে মূল্যগুলি ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় নৈতিক মূল্য বলে গ্রহণ করবে। তাঁর কথায়,

> ...this theory alone is compatible with the dignity of man, it is the only one which does not make man into an object. All kinds of materialism lead one to treat every man including oneself as an object—that is, as a set of pre-determined reactions, in no way different from the patterns of qualities and phenomena which constitute a table, or a chair or a stone. Our aim is precisely to establish the human kingdom as a pattern of values in distinction from the material world.[১৫]

কিন্তু আমরা বলতে পারি সার্ত্র প্রদত্ত মানবতাবাদ মানুষকে মানুষ রূপে নয় এক অতিমানব রূপে ব্যাখ্যা করে, যার সঙ্গে বাস্তব জাগতের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। তাই সার্ত্র প্রদত্ত ব্যাখ্যা পুনরায় পিকোর কথা মনে করায়। যেখানে মানুষের স্থির প্রকৃতি অস্বীকার করে কেবল স্বাধীনতা অনুশীলনের কথা বলে; যা মানুষকে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর প্রাণী বলে উপস্থাপন করে।

[১৫] Sartre, J P, *Existentialism and Humanism*, trans. by Philip Mairet, p. 44-45

যদিও রাসেল সরাসরি 'বস্তুবাদী মানবতাবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবে তিনি যে ধরণের মানবতাবাদের ধারণা প্রদান করেছেন তা 'বস্তুবাদী মানবতাবাদ'-এর ধারণার সদৃশ। কারণ রাসেল ছিলেন একজন প্রকৃতিবাদী (naturalist) এবং শরীরবাদী (physicalist) দার্শনিক। তিনি মনে করতেন, চেতনা বা মন কোনও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয় নয়—এটি জৈবক অস্তিত্ব ভিত্তিক মস্তিষ্ক ক্রিয়ারই এক প্রকাশ। তাঁর মতে, বিশ্ব জগত বস্তুগত (material) এবং জ্ঞানলাভ বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে হয়—রাসেলের এমন দাবী বস্তুবাদী বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া রাসেল মনে করতেন, মানুষের নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি হওয়া উচিত যুক্তি, বিজ্ঞান, সহানুভূতি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা। তিনি বলেন, "The good life is inspired by love and guided by knowledge."[১৬] তিনি মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ভালো জীবনকে সংজ্ঞায়িত করেন এবং জ্ঞানকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে পৃথক করে পরীক্ষিত ও যৌক্তিক চিন্তার ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তাই রাসেল ধর্ম ভিত্তিক নৈতিকতাকে অস্বীকার করে তাকে বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেন। এ নৈতিকতা মানুষের দুর্দশা লাঘব এবং সুখ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, "the life of Man is a long march through the night, surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain....yet he marches on."[১৭] কিন্তু সার্ত্র প্রদত্ত মানবতাবাদ এমন বিজ্ঞান নির্ভর ধারণা কেন্দ্রিক নয়। কারণ সার্ত্র মনে করেন, বিজ্ঞান নির্ভর মানবতাবাদ নিয়ন্ত্রণবাদের সম্মুখীন হয়, যেখান থেকে মুক্ত হওয়ার কোনও উপায় নেই। তাই তিনি মানবতাবাদকে অস্তিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

---

[১৬] Russell, B, *What I believe*, 1925, Chapter II, p. 26-27

[১৭] Russell, B, *Mysticism and Logic*, p. 46-57

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদ ভিত্তিক মানবতাবাদের আলোচনা উপস্থাপন করব। তিনি কীভাবে বস্তুবাদের ভিত্তিতে মানবতাবাদকে উপস্থাপন করেন তা ব্যাখ্যা করব। সার্ত্র যে মনে করেছেন বস্তুবাদের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় সে বিষয়ে রায়ের অভিমত আলোচনা করা জরুরী। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণবাদের ধারণাকে অতিক্রম করে স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া সম্ভব কীভাবে সে বিষয়ের আলোচনাও জরুরী। কিন্তু এই আলোচনার পূর্বে আমাদের মার্কসবাদ সম্পর্কে রায়ের মতামত উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা রায় একসময় মার্কসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেও সেই ব্যাখ্যাকে বর্জন করেছিলেন কেন সেটি বিচার করা আবশ্যক। তাই পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কসবাদ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অভিমত আলোচনা করব।

চতুর্থ অধ্যায়

মার্কসবাদ বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নবমানবতাবাদে এক স্বতন্ত্র ভাবনা উপস্থাপন করেছেন যেখানে ব্যক্তি মানুষের অনন্যতা, স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়ে সহযোগিতামূলক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রায় অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার ধারণাকে অস্বীকার করে জগতের সৃষ্টি ও সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন—যা অনুসারে মানব চেতনা জড় থেকে আবির্ভূত হয়েও তার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। তাঁর মতে, সমাজ ক্রম বিবর্তনের ফল যা ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। রায় তাঁর মানবতাবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী মতাদর্শের উল্লেখ করেন—যা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে মার্কস-পরবর্তী সময়ে প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে তিনি গ্রহণ করতে চাননি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রচলিত বা চিরাচরিত ব্যাখ্যাকে তিনি গ্রহণ না করে প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যার ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা এই ত্রুটিগুলি বিষয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা করব।

প্রকৃতপক্ষে চিরাচরিত ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী সিদ্ধান্তগুলিকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু রায়ের মতে, মার্কসবাদকে এমন স্থির সিদ্ধান্তের সমষ্টি (অপরিবর্তনীয়) রূপে দেখলে সেই মতাদর্শ গোঁড়ামীতে রূপান্তরিত হয়। তাই রায় মার্কসবাদকে যুক্তিবাদী, ন্যায়সঙ্গত ও বস্তুবাদী চিন্তাধারা রূপে দেখেছিলেন। তিনি মার্কসবাদকে জীবনের দর্শন হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন বলে তাকে কেবল সাম্যবাদী জীবন রূপে বোঝেননি। রায়ের

মতে, মার্কসবাদ হল সেই মতবাদ যা মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে স্পষ্ট করে, যে বিবর্তনের কোনও অন্ত নেই। তাই মার্কসের বক্তব্যগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে মান্যতা না দিয়ে সময়োপযোগী ও পরিস্থিতির নিরিখে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পুনরায় বিচার-বিশ্লেষণ অথবা পরিমার্জন করা প্রয়োজন বলে রায় মনে করেছেন। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপটি সকল মার্কসবাদীর একান্ত কর্তব্য এবং যুক্তি সঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। একেই রায় প্রকৃত মার্কসীয় রীতি বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, উক্ত উদ্যোগটি গ্রহণ করতে না পারলে কখনোই প্রকৃত মার্কসবাদী হয়ে ওঠা যায় না।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনে ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সেই পরিবর্তন এতই বৈপ্লবিক যে মার্কসের তত্ত্ব বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ধারিত চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষায় ব্যর্থ। রায়ের মতে, মার্কস রচিত বস্তুবাদের যুক্তিগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে ভাববাদীদের যুক্তিগুলিই খণ্ডন করা যায় না। মার্কসের সময়ে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি কালের প্রভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, মার্কসের সময়ে অখণ্ড ক্ষুদ্রকণার সমষ্টিকে বস্তু বলে কল্পনা করা হতো। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সেই ধারণাকে বিনষ্ট করে ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্র অণুগুলিকে ইকেলট্রন, প্রোটন, ও নিউট্রনের সমষ্টি রূপে দেখছে। পূর্বে অণু বা পরমাণুগুলিকে অখণ্ড সত্তা হিসাবে স্বীকার করে সেগুলিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মান্যতা দেওয়া হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই অখণ্ড অণুগুলিকে খণ্ডিত করে দেখান হল অণুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাদের অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সমষ্টি রূপে। বিজ্ঞান যেমন অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ নিজ আবিষ্কৃত সত্যগুলি পুনরায় পরিমার্জন করে, সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক অবধারণগুলিও জ্ঞানের অগ্রগতির কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই রায় বলেন, মার্কসীয় সিদ্ধান্ত বিনা বিচারে গ্রহণ করা হলে গোঁড়া মার্কসবাদী হওয়া গেলেও প্রকৃত মার্কসবাদী হওয়া সম্ভব

নয়। কেননা বিজ্ঞানের সহায়তা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি ব্যতীত আমরা জড় জগতকে বিশ্লেষণ করতে পারবো না।

রায় আধুনিক জগতের বাস্তব সমস্যা সমাধানে যথোপযুক্ত না হওয়ার জন্য মার্কসের তত্ত্বের চিরাচরিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি। তিনি পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতির নিরিখে মার্কসবাদের পরিমার্জন করতে চেয়েছিলেন। তাই রায় মার্কসবাদকে অপরিবর্তনীয় সার্বিক তত্ত্ব বলে মান্যতা দিতে চাননি। রায় মনে করেন, মার্কসীয় দর্শন সমকালীন ইউরোপের দুশো বছরের পূর্বপরিস্থিতি এবং সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল বলে সেখানে পাশ্চাত্য ঐতিহ্য বিষয়ক জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটলেও প্রাচ্য (ভারত, চীন) জগতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই মার্কসীয় মতবাদে প্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতীয় সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায় না। তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয়রা প্রাচ্য সভ্যতা সম্পর্কে (ভারতের সমাজ ব্যবস্থা) খুব একটা পরিচিত ছিল না। তাই রায় বলেন, ইউরোপের সমাজ বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে মার্কস যে তত্ত্ব রচনা করেছিলেন সেই তত্ত্ব ভারতীয় ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে এমন দাবী করা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির বিস্তারের কারণে ইউরোপের বর্তমান ঘটনাগুলিও মার্কস অনুমিত পথ অনুযায়ী না ঘটে ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা মার্কসও কল্পনা করেননি। অর্থাৎ মার্কসের পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনগুলি মার্কসীয় নিয়ম অনুসারে হয়নি।

রায় মনে করেন, মার্কসবাদকে উপলব্ধি করতে হয় তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে। কারণ ইউরোপের নবজাগরণের প্রভাবে মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়। নবজাগরণের দ্বারা ইউরোপীয় সমাজ মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ

হয় যুক্তিবাদ ও আত্মবিশ্বাসের জগতে—ফলস্বরূপ মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়। তাই রায় বিগত তিনশো বছরের জ্ঞানের সমষ্টি রূপে মার্কসবাদকে দেখতে চেয়েছিলেন। চিরাচরিত ব্যাখ্যায় মার্কসবাদকে সমাজ ব্যাখ্যার অভিনবত্ব বলে দাবী করলেও রায় মনে করেন, মার্কসবাদের মধ্যে বিশেষ কিছু নতুনত্ব নেই। মার্কস যে সকল সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন, বিপ্লবের কারণ বলেছেন সেগুলি মার্কসের পূর্বেও আলোচিত হয়েছিল। মার্কসপূর্ব ইতিহাস বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদের মূল কথাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকে এডওয়ার্ড গিবন *রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন*[১] (*Decline and Fall of Roman Empire)* নামক গ্রন্থের ছয়টি খণ্ডে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য উচ্চতার যে শিখরে ছিল সেখান থেকে কীভাবে পঞ্চম শতকে তার পতন হল সে বিষয়ক ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। তিনি রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ রূপে রাজনৈতিক দূর্নীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, সামরিক শক্তির ক্ষয় এবং খ্রিষ্টান ধর্মের উত্থান প্রভৃতিকে চিহ্নিত করেছিলেন। সেজন্য রায় মনে করেন ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে চিন্তাভাবনা ও শিক্ষাধারা ইউরোপে প্রচলিত ছিল তারই শেষ অধ্যায় হল মার্কসবাদ।

রায় মনে করেন, মার্কসবাদ দার্শনিক তত্ত্ব রূপে নয়, বরং বিপ্লবের তত্ত্ব (theory of revolution) রূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল এবং অবশেষে বিশ্ব আন্দোলনের আদর্শে পরিণত হয়েছিল, যেখানে হেগেলের দ্বান্দিকতাকে গ্রহণ করে মার্কস সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। তাই রায় বলেন, মার্কসবাদকে দর্শন রূপে স্বীকার করলে হেগেলীয় ব্যবস্থার শাখা বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। দার্শনিক হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার

---

[১] Roy, M.N. *Reason, Romanticism and Revolution*, p. 398

প্রভাব মার্কসীয় তত্ত্বে সুস্পষ্ট। আবার বিপ্লবের তত্ত্ব বলে বিবেচনা করলে মার্কসীয় মতবাদে বুর্জোয়া ও ফরাসী মতবাদের প্রভাব স্পষ্ট। কারণ মার্কসবাদী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিই হল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মৌলিক নীতিগুলি ব্রিট্রিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো দ্বারা রচিত, মার্কস যাঁকে পুঁজিবাদী তাত্ত্বিক বলেছিলেন। মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ সেগুলি কেবল বিশেষ শ্রেণীর বা নিজ স্বার্থ প্রচার বা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও মার্কস তাঁর মতবাদের ভিত্তি রূপে প্রস্তুত দার্শনিক নীতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেবল শ্রমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। তাই মার্কসবাদকে বুর্জোয়া মতাদর্শের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে চিহ্নিত করা যায়। লেলিন বলেছিলেন, মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর তিনটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রের তিনটি মতাদর্শকে তাঁর তত্ত্বে পূর্ণতা প্রদান করেন। এগুলি হল চিরাচরিত জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় ফরাসী বিপ্লবের মতাদর্শ।[২] লেলিন মনে করেন, মার্কসের উপদেশ এভাবেই দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত সংযোজন।[৩] রায় প্রশ্ন তোলেন, বিপ্লবের তত্ত্বরূপে মার্কসবাদকে পূর্বোক্ত ধারার উত্তরসূরী রূপে গণ্য করলে এবং সেই ধারাগুলিকে বুর্জোয়া আদর্শ বলে বাতিল করলে মার্কসবাদকেও বুর্জোয়া মতাদর্শ বলে গণ্য করা উচিত। কারণ পূর্বের মতাদর্শগুলিতে বিশেষ এক শ্রেণীর (পুঁজিপতি) স্বার্থ রক্ষা হয়েছিল। সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার কোনও উল্লেখ ছিল না এবং শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব ছিল। তাই সেই মতবাদকে সর্বহারার মতবাদ বলে স্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ

---

[২] Lenin, *Teaching of Karl Marx*, p. 30

[৩] Lenin, *Three Source and Three Component Parts of Marxism*, P.15

রায় বলেন, এমন দাবীর দ্বারা মার্কস-পূর্ববর্তী মতবাদকে যদি বুর্জোয়া মতাদর্শ বলে বাতিল করা হয় তাহলে মার্কসের মতবাদও সর্বহারা শ্রেণীর মতবাদ নয়। কারণ মার্কস নিজেই জন্মসূত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি বড় হয়েছিলেন। আবার মার্কসীয় মতবাদও বিশেষ শ্রেণীর (শ্রমিক) স্বার্থের কথা বলে। সমাজের সকল শ্রেণীর স্বার্থের কথা বলে না। তা সত্ত্বেও মার্কসবাদীরা মার্কসের ধারণাগুলিকে সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ বলে মনে করেন এবং সমাজে সাম্য আনতে তা উপযুক্ত বলে প্রচার করেন। রায়ের মতে, যাঁরা এমন মনোভাবের অধিকারী তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে গোঁড়া মার্কসবাদী। কিন্তু রায় কখনোই মার্কসবাদ সম্পর্কে এমন গোঁড়া মনোভাব গ্রহণ করেননি।

রায় বলেন, ধারণাকে কোনও বিশেষ শ্রেণী দ্বারা নির্ধারিত বলা সঠিক নয়। কেননা যে কোনও ধারণাই মানব সৃষ্ট; কোনও বিশেষ শ্রেণী কোনও ধারণার জন্ম দিতে পারে না। ধারণাগুলি কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর কুক্ষিগত না হয়ে সমগ্র মানব জাতির অন্তর্গত থাকে। এই ধারণাগুলি কোনও স্থিরিকৃত ধারণা নয়; সভ্যতার সূচনাকাল থেকে বিবর্তনের ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় ধারণা অনবরত প্রবহমান। ধারণাগুলি প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিতও হয়। জগতের বিভিন্ন অংশে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এই ধারণাগুলি বিবিধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী দ্বারা ব্যবহৃত হয় ও প্রভাবিত হয়। এই ধারণাগুলির মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নয়, বরং ধারাবাহিকতার সম্পর্ক থাকে। তাই বুর্জোয়া বিপ্লবের রাজনৈতিক মতবাদ, ধ্রুপদী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং হেগেলীয় দর্শনের মূল নীতির দ্বারা মার্কসীয় মতাদর্শ তৈরী হলেও মার্কসীয় মতাদর্শকে কেবল সর্বহারার মতাদর্শ বলে দাবী করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় মতাদর্শের সঙ্গে উক্ত মতবাদগুলির বিরোধিতামূলক সম্পর্ক নেই। যদি কেবল বিরোধিতার সম্পর্ক থাকত তাহলে ওই তত্ত্বকে

বর্জন করে অন্যটিকে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করত। কিন্তু বাস্তবিকভাবে ঐ ঘটনাগুলির ইতিবাচক উপাদান মার্কসবাদের মধ্যেও নিহিত রয়েছে। তাই মার্কসবাদকে কেবল পুরোনো ধারণার নেতিকরণ (negation) বলা যায় না। অথবা নেতিবাচকতার নেতিকরণও (negation of negation) বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই মতবাদের ধারণাগুলি পরিত্যাগ করে মার্কসবাদ গড়ে উঠতে পারে না। তাই রায় ধারণার গতিশীলতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বীকার না করে ধারণার ধারাবাহিকতার সম্পর্ক স্বীকার করেছেন।

মার্কসীয় চিন্তাধারার গতিশীলতা যে দ্বান্দ্বিক নয় তা বোঝার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি মার্কসীয় সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যানুসারে রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস অর্থনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয়। কিন্তু রায় মনে করেন, ইতিহাস সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা প্রথম মার্কসের তত্ত্বে দেখা যায় এমন নয়। ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণাটি অতীতের ঐতিহাসিক ধারণাসমূহের ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি। প্লেখানভ তাঁর *বস্তুবাদের ইতিহাস* নামক গ্রন্থে বলেছেন, “The Marxist conception of history is really the legitimate product of the whole past development of historical ideas.”[8] মার্কসবাদকে ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি বলা হলে আমাদের দেখতে হবে মার্কসের সিদ্ধান্তগুলি অতীতে কীরূপে বিদ্যমান ছিল অথবা অতীত থেকে কীভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মার্কসবাদ পুষ্ট হয়েছে।

রায় বলেন মার্কসের পূর্বে ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ইতালীয় দার্শনিক ও ইতিহাসবিদ গিয়াম্ব্যটিষ্টা ভিকো (Giambattista Vico 1668-1744)।

---

[8] Plekhanov, Georgi, *Selected Philosophical Works* vol. II, preface

তাঁকে আধুনিক ইতিহাসের দর্শনের উদ্ভাবক বলা হয়। কেননা তিনিই প্রথম ইতিহাস অধ্যয়নের পশ্চাতে এক বিজ্ঞানের কথা বলেন। ল্যাটিন ভাষার তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "Verum esse ipsum factum" ইংরাজীতে তর্জমা হল, "truth is itself something made" অর্থাৎ সত্য এমন কিছু যা গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে অষ্টাদশ শতকে এডওয়ার্ড গিবন্ (Edward Gibbon 1737-94) ইতিহাস অধ্যয়ন ও লেখার বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে রোমান সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস লিখেছিলেন। তবে তিনি কোনও বিশেষ তত্ত্ব প্রদান করেননি। এছাড়াও জোহান গটফ্রেড হার্ডার (Johann Gottfried von Harder) সহ অনেক রেনেসাঁয় চিন্তাবিদের চিন্তার মধ্যে দিয়ে এবং জার্মান চিন্তাবিদ হেগেলের *ইতিহাসের দর্শন* (Philosophy of History) সম্পর্কিত রচনার মাধ্যমে ইতিহাস অধ্যয়নের এক বিশেষ পদ্ধতির কথা উঠে আসে। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরবর্তী সময়ে ফরাসী ইতিহাসবিদ ফ্রেঁসোয়া গিজো (Francois Guizot 1787-1874) মনে করেছেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য সম্পত্তির প্রকৃতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে জানা আবশ্যক।[৫] গিজো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝার ক্ষেত্রে সম্পত্তির প্রকৃতি ও সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাসবিদেরা মনে করতেন, ব্যক্তিবর্গের জীবনযাপনের প্রকৃতি, কীভাবে তারা শাসিত হয় সে বিষয়টি বুঝতে আগ্রহী হলে সমাজ, তার গঠন প্রক্রিয়া, ব্যক্তিবর্গের সামাজিক অবস্থান অনুসারী জীবন, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক—যা ব্যক্তির অবস্থা নির্ণয় করে সেগুলি বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে।[৬] অর্থাৎ ইতিহাসকে জানতে হলে উপরিউক্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ফ্রেঁসোয়া গিজো ফ্রান্সের ইতিহাস লেখার

[৫] Guizot, L' *Histoire de Fance*, p. 55

[৬] Ibid, p. 60

সময় এমন পদ্ধতির ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর এই পদ্ধতি মার্কসীয় মতবাদের পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে অনেকাংশে সাযুজ্যপূর্ণ।

আবার ফরাসী ঐতিহাসিক অগাস্টিন থিয়েরী (Augustin Thierry 1795-1856) ইতিহাস ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও সমাজ গঠনের পশ্চাতে উপস্থিত আর্থ-সামাজিক কারণ কোনগুলি তা অনুসন্ধানের কথা বলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক কাজগুলির মধ্যে অন্যতম *History of the Conquest of England by the Normans* যেখানে তিনি ১০৬৬ সালে নর্মানের ইংল্যাণ্ড বিজয় এবং ইংল্যাণ্ড সমাজে এই ঘটনার প্রভাব অন্বেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে নিহিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তিগুলির প্রকৃতি অধ্যয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বস্তুগত অবস্থা এবং সামাজিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস সম্পর্কে থিয়েরির ধারণা পরবর্তী ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের অনুপ্রাণিত করে। থিয়েরী ছিলেন যৌবনে সেন্ট সাইমনের (Saint Simon) সেক্রেটারী। পরে সেন্ট সাইমনের মতাদর্শ দ্বারাই মার্কস গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস অর্থনৈতিকভাবে নির্ধারিত বলে যে দাবী করা হয়েছিল তা মার্কসের পূর্বে অগাস্টিন থিয়েরিও দেখিয়েছিলেন। তাই মার্কসীয় বস্তুবাদের উক্ত দাবীর নতুনত্ব নেই এবং থিয়েরীর মতবাদ থেকে মার্কসীয় মতবাদের উত্তরণের ক্ষেত্রে কোনও দ্বান্দ্বিক নিয়ম অনুসৃত হয়নি। বরং থিয়েরী, সেন্ট সাইমনের মতবাদ এবং মার্কসবাদের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতা আছে। তাই মার্কসীয় মতবাদ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে ধারণার অগ্রগতির কথা বললেও তাঁর তত্ত্ব এই পদ্ধতি অনুসারে গড়ে ওঠেনি। বরং তাঁর তত্ত্ব পূর্বতন সমাজ বিষয়ক ব্যাখ্যারই সিদ্ধান্ত। তাই বলা যায় মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা জগতের সমস্ত

কিছু ব্যাখ্যা করতে পারলেও মার্কসীয় মতবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। ফলে সেখানে অসম্পূর্ণতা থেকে যায় বলে মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন।

রায় বলেন, মার্কসবাদী ব্যাখ্যানুসারে মার্কস-পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা 'ইউটোপীয়' বা কাল্পনিক রাজ্যের কথা বলেছিলেন কারণ তাঁদের মতবাদে বাস্তবতা সম্পর্কে মার্কস সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু রায় মনে করেন, মার্কস যাঁদের কাল্পনিক বলেছেন তাঁরাই আসলে সমাজ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিকে (স্বাধীনতা, সাম্য, নৈতিকতা)[৭] যথার্থ মর্যাদা দিয়েছিলেন। এঁনারা সকলেই প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শোষণের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন প্রতিযোগিতা, শত্রুতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অপরকে বঞ্চিত করে লাভবান হওয়ার গোপন ইচ্ছা ইত্যাদি সবই ব্যক্তিগত মালিকানার ফলশ্রুতি যা বৈষম্যের সৃষ্টি করে।[৮] তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথাও তাঁরা বলেছিলেন। এই সকল চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন থমাস মোর (Thomas More), ক্যাম্পানেলা (Campanella), ফেনেলন (Fenelon) প্রমুখ। সেজন্য রায় বলেন, মার্কসীয় ব্যাখ্যানুসারে মার্কস-পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা যদি অবাস্তব কথা বলেন তবে মার্কসীয় মতবাদকেও কাল্পনিক বলতে হবে। কারণ মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নৈতিক মূল্যটি কাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিহিত ছিল। মার্কসীয় ব্যাখ্যাকারগণ মার্কস-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দাবীগুলিকে অবাস্তব বলে মনে করেন কারণ তাঁদের মতে ওই সকল তত্ত্বে স্বীকৃত স্বাধীনতা, মৈত্রী, নৈতিকতার ধারণা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ বাস্তবিকভাবে সম্ভব ছিল না। তাঁরা বাস্তব বিষয়ের ভিত্তিতে উক্ত মতবাদগুলি গড়ে না তুলে কেবল কল্পনার আশ্রয়ে এওমন ধারণা গঠন করেছিলেন।

---

[৭] বন্ধনীর অংশ আমার সংযোজন

[৮] Rousseau, *Discourse on Inequality*, p. 40

কিন্তু রায় আপত্তি তোলেন মার্কসবাদী এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মার্কসবাদকেও কাল্পনিক মতবাদ বলতে হয়। কারণ মার্কসের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' এবং 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' এ দুটি তত্ত্বই আদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র দাবী করা হয় ঐতিহাসিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিণতি হিসাবে সমাজতন্ত্র আসতে বাধ্য। রায় বলেন, অভিজ্ঞতামূলক ইতিহাসের এমন অনিবার্য ভবিষ্যতবাণীর নীতি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হয়—যে প্রক্রিয়াটি হেগেলীয় ধারণা থেকে অনুসৃত। রায় মনে করেন, এমন দ্বান্দ্বিক ধারণাটি কোনও অভিজ্ঞতামূলক নীতি (empirical law) নয়। সেটি পূর্বকল্পিত ধারণা—যা মার্কস তাঁর পূর্বসূরী হেগেল থেকে গ্রহণ করেছিলেন। রায় মনে করেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারণা যদি পূর্বকল্পিত ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয় তাহলে সেই ধারণাটি অবশ্যই আদর্শবাদী দর্শনের (idealist philosophy) অন্তর্ভুক্ত এবং তা কাল্পনিক। মার্কসবাদের পূর্বস্বীকৃতিকে ব্যাখ্যার জন্য বলা হয় "particular economic phenomenon had already ceased to exist when the moral consciousness of the masses declares it to be wrong"[৯] অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ঘটনা বিলুপ্ত হয় যখন জনগণের নৈতিক চেতনা তাকে ভ্রান্ত ঘোষণা করে। রায় মনে করেন, মার্কসীয় পূর্বস্বীকৃতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করলেও দ্বান্দ্বিকতার আদর্শবাদ নিরুদ্ধ (suppressed) হয় না। কারণ মানুষের নৈতিক চেতনা কোনও অর্থনৈতিক শক্তি নয়। তাই সমস্ত কিছু অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় এমন দাবীও করা যায় না। তাই আমাদের অবশ্যই নৈতিকতার আবেদনের প্রতি জোর দিতে হয়। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের ঐতিহ্য যেমন সত্য ঠিক তেমনি ভাবে নৈতিকতার

[৯] Ryazanov, *Communist Manifesto new edition*, p.35

প্রতি তার আবেদনও সত্য। তাই মার্কসবাদ নৈতিকতার আবেদন থেকে সরে আসে না। রায় মনে করেন, মার্কসীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই নিহিত আছে।

মার্কসীয় ব্যাখ্যাকারেরা মার্কসের পূর্বসূরীদের সমালোচনা করেন কারণ তাঁরা মনে করেন, পূর্বের চিন্তাবিদদের প্রলেতারিয়েত সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। তাঁরা কল্পনাকে আশ্রয় করে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন যেখানে নৈতিকতার আবেদন ছিল। কিন্তু সেই লক্ষ্য কীভাবে অর্জন করবে সে সম্পর্কে কোনও দিশা ছিল না। সহজ কথায় তাঁদের ইতিহাসের কোনও দর্শন ছিল না। রায় মনে করেন, মার্কস পূর্ববর্তী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রাকমার্কসীয় ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে অধ্যয়নে করলে ভিত্তিহীন এই অভিযোগ বাতিল করতে হয়। মার্কসীয় ব্যাখ্যানুসারে পূর্বের চিন্তাবিদগণ সমাজ পরিবর্তন বিষয়ে কোনও নির্দেশ না দিয়ে নৈতিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। রায় বলেন, এমন অভিযোগ যদি মার্কস-পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিকদের প্রতি করা হয় তাহলে মার্কসবাদও একই দোষে দুষ্ট। কারণ মার্কসীয় মতবাদ নৈতিকতার প্রতি যে আবেদন করে তা আমাদের খুব বেশী সাহায্য করে না। এমনকি সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে বিপ্লবের পথও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কসীয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' (scientific socialism) নৈতিক মূল্যটি ইউটোপিয়ান কিনা তা বিচারের জন্য মার্কস-পূর্ববর্তী কয়েকজন দার্শনিকের বক্তব্য আলোচনা করা প্রয়োজন। মার্কসী-পূর্ববর্তী উল্লেখযোগ্য দু'জন দার্শনিক হলেন মাবলি (Mably 1709-1785) এবং মোরেলি (Morelly 1717-1778)। মাবলিকে দার্শনিক ফ্লিন্ট (Flint) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। রায় মনে করেন,

মাবলি সম্ভবত প্রথম সাম্যের কথা বলেছিলেন। মাবলির মতে, "equality reigned in the first stage of society, and in its final stage equality would be restored."[১০] অর্থাৎ সমাজের প্রথম পর্যায়ে সাম্যের অধিপত্য থাকলেও অন্তিম পর্যায়ে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে সমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁর ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে *Des droits et des devoirs du citoyen* (The Rights and Duties of the Citizen) তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে মানুষের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর কথায় 'Private property was the root-cause of all human misfortune.' রায় মাবলীর এই দাবীকে মার্কসের মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেন কারণ মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সকল অমঙ্গলের মূল বলে তার বিলোপ সাধন জরুরী।

তাছাড়া মার্কসীয় মতবাদের উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কিত ধারণাও গ্রাচ্ছুস বাবউফ (Gracchus Baboeuf 1760-1797) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। বাবউফ বিশ্বাস করতেন, "In any society there existed a surplus produced by labor of the working class beyond what was necessary for their survival and reproduction."[১১] অর্থাৎ প্রতিটি সমাজে শ্রমিক শ্রেণী তাদের শ্রম দ্বারা কিছু উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে যা তাদের বেঁচে থাকার এবং পুনরুৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত। এই উদ্বৃত্তটি শাসক শ্রেণী অর্থাৎ বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণী দ্বারা অন্যায়ভাবে বণ্টন করা হয়, যার দ্বারা তারা উপকৃত হয়। মাবলিও দাবী করেছিলেন যে উচ্চশ্রেণীর যা কিছু অতিরিক্ত তা অন্যদের শ্রমের মূল্যে অর্জিত। মোরেলির (Morelly) ছিলেন

---

[১০] Roy, M.N., *Reason Romanticism and Revolution*, p. 395

[১১] George Rude, "Gracchus Babeuf: The First Revolutionary Communist" p. 138

মাবলির দ্বারা প্রভাবিত। মোরেলির ফরাসী ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থে *Code de la Nature* (*Law of Nature*) 1755 সালে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি সামাজিক মালিকানা, সমতা, জনসাধারণের মঙ্গলের ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ গঠনের কথা বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষ মূলত ভালো হলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণে মানব চরিত্রে অসততার জন্ম হয়। তাই তিনিও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথা বলেছিলেন। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক শর্ত। সামাজিক শৃঙ্খলা বলতে স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ওপর সমাজবিদেরা জোর দিয়েছেন।[১২]

মাবলি ও মোরেলির মতবাদ ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা বাবউফ (Baboeuf) তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যদিও তথাকথিত মার্কসবাদীরা তাঁকে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের অগ্রদূত বলে অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে বাবউফ রুশোর কল্পিত আদর্শ গণতন্ত্রের ভাবনার জগতকে অতিক্রম করে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে এক মৌলিক সমাজ বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। বাবউফ-এর জীবনীকার ও শিষ্য ফিলিপ বুনরাটি (Philippe Buonarotti 1761-1837) ছিলেন এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনিও ন্যায়ের সারমর্ম রূপে সমতাকে গুরুত্ব দিয়ে বাবউফের সঙ্গে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য বিশেষ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করেছিলেন, যা ইতিহাসে Conspiracy of Equals[১৩] নামে পরিচিত। সেটিকে অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে বাবউফ ও তাঁর সহযোগীরা ফরাসী বিপ্লবকে কেবল সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লব বলে মনে

---

[১২] Mark Goldie and Robert Wokler (ed.) "The Cambridge History of Eighteenth-Century Political Thought" p. 365

[১৩] ১৭৯৬ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় ব্যর্থ অভ্যুত্থান। যেখানে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নাগরিক বিভেদ ও জন সাধারণের দারিদ্রের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছিল।

না করে সেই বিপ্লবকে মানবমুক্তির পথ বলে দেখেছিলেন। বাবউফের কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফ্রান্সে এক গণতান্ত্রিক, বিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক মালিকানায় সহজেই রূপান্তরিত করা যাবে। প্রতিবিপ্লবীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করাও অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে জর্জ লিখহাইম (George Lichtheim) বলেন যে, বাবেউফ তাঁর বিপ্লবী কর্মসূচীর মাধ্যমে তাঁর পূর্বসূরীদের (যেমন, রুশো, মাবলি, মোরলি) গণতান্ত্রিক আদর্শের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সাম্যবাদী চিন্তার স্তরে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে তাঁর অবদান রয়েছে।[১৪] তাই রায় বলেন, মার্কসীয় নৈতিকতার মহান ঐতিহ্যের ধারণাগুলি (স্বাধীনতা, সাম্য, নৈতিকতা প্রভৃতি) সপ্তদশ ও প্রাক অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকদের ভাবনার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাঁদের তত্ত্বকে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় কাল্পনিক বলে চিহ্নিত করা হলেও মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নৈতিক মূল্যটি এই কাল্পনিক তত্ত্বের মধ্যেই সুপ্ত ছিল।

মার্কস কমিউনিস্ট ইস্তেহারে লিখেছেন, “অতীত সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।”[১৫] রায় বলেন, মার্কসের পূর্বে ফিলিপ বুনরাটি (Philippe Buonarotti) চিন্তাভাবনার মধ্যেও একই মত প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তিনি শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতির ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। বুনরাটি ফরাসী বিপ্লবকে সম্পদ ও বৈষম্যের সমর্থক ও সমতার সমর্থকদের

---

১৪ George Lichtheim, *The Origins of Socialism*, p. 21

১৫ Marx K. & Engels F., *Communist Manifesto*, p. 31

দ্বন্দ্ব বলে দেখেছিলেন।[১৬] তাই ফরাসী বিপ্লবকে অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রকে উৎখাত করার পথ রূপে এবং ন্যায়-সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের উপায় রূপে দেখেছিলেন। রায় মনে করেন, মার্কসবাদের অনেক আগেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দিকেই বুনরাটি দাবী করেছিলেন যে ক্ষমতা কেবলমাত্র বিপ্লবী বিজয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

লুইস ব্লাঙ্ক (Louis Blanc) *L' Organisation du Travail* (Organisation of Work অথবা Labor Organization) নামক গ্রন্থে মার্কসবাদের অন্য একটি দিক প্রকাশ করেন। তিনি বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে সমষ্টিবাদী সত্তার ধারণার (realisation of the collective being) দ্বারা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আহ্বান জানিয়েছিলেন। রায় মনে করেন, তাঁর বিপ্লবী রাষ্ট্রতত্ত্বে ক্ষমতা দখল এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময়ে সর্বহারার একনায়কত্বের ধারণা নিহিত ছিল। এবং তিনিও মার্কসের মতো শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> One day, there will no longer be a lower class and an upper class, and on that day there will be no need for a protective authority; until that day, Socialism will not be made fruitful except by the way of politics.[১৭]

অর্থাৎ মার্কসীয় মতবাদে যে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখল এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা লক্ষ্য করা যায় তা লুইস ব্লাঙ্কের মতবাদের মধ্যেও নিহিত

---

[১৬] Philippe Buonarroti, *The Conspiracy of Equals*, p. 233

[১৭] Louis Blanc, L' *Organisation du Travail* (organisation of work/ labor organization), p. 78

ছিল। এমনকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগেই সবর্হারার একনায়কত্বের ধারণাটি বাস্তবিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সেজন্য রায় মনে করেন, মার্কসীয় মতবাদ বিপ্লবের নতুন কোনও তত্ত্ব নয়। রায় আরোও বলেন, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র একে অপরের বিপরীত নয়। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার বা প্রতিস্থাপন করার জন্য আসে না। সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণ কোনও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ঘটে না, বরং তাদের মধ্যে ধারাবাহিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই অগ্রগতির পশ্চাতে চালিকা শক্তি ছিল মানবজাতির প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা স্বাধীনতার সন্ধান—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক স্বাধীনতা। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হিসাবে উঠে আসেনি। রায়ের কথায়

> Socialism rose out not as the antithesis to democracy. The movement of thought from democracy to socialism was not dialectic, but continuous. The incentive was the agelong human quest for freedom.[১৮]

অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে সর্বদা চিন্তার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। সমাজতন্ত্রের বিকাশ কেবলমাত্র শ্রেণী-সংগ্রামের ফল নয়, বরং গণতন্ত্রের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের ধারাবাহিক প্রসার। যেমন, ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লব সমাপ্ত হওয়ায় ফরাসী বুর্জোয়াগণ নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করে অনুভব করে যে অষ্টাদশ শতকের যে আদর্শগুলি তাঁরা মেনে চলছিল সেগুলি জনগণের জন্য তেমন কিছু পরিবর্তন করেনি। তখনই তাঁদের মধ্যে ভিন্ন আদর্শ অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগপ্রবণ ভাবে প্রকট হতে শুরু করে। এই বিষয়ে বলা যায় যে,

---

[১৮] M.N. Roy, *Reason, Romanticism and Revolutions*, p. 403

> It is fair to say that the tremendous historical significance of communism was understood more quickly by the middle class than by the working class, who were primarily concerned. The middle class saw that communism was the logical outcome of democracy.........The political battles of the French Revolution showed that middle classes, in fighting for their own conception of freedom, found in the end that they were fighting the very principles on which they had made their stand.[১৯]

অর্থাৎ এক আদর্শ থেকে অন্য আদর্শে উত্তরণের মধ্যে দ্বান্দ্বিকতা নয়, ধারাবাহিকতা থাকে এবং যার মূল স্বাধীনতার অন্বেষণে নিহিত। রায় মনে করেন দার্শনিক হেগেলের মতবাদকে অর্থাৎ ইতিহাসে মানুষের ভূমিকাকে মার্কস তাঁর মতবাদে গ্রহণ করেছেন। তবে সেখানে কিছু শব্দগত পার্থক্য আছে। হেগেল যেখানে 'world spirit' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন মার্কস সেখানে 'historical necessity' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। যদিও হেগেল 'ওয়ার্ল্ড স্পিরিট' ধারণাকে নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেন। কিন্তু মার্কসের 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতার' ধারণাটি জগৎ তথা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রায়ের মতে, মার্কসের 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা'র ধারণায় একটি অধিবিদ্যক ধারণা নিহিত আছে। যার একটি উদ্দেশ্যমুখী অর্থও থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক

---

[১৯] Francois Fejto, "Europe on the Eve of the Revolution" in *The opening of an Era- 1848.* Edited by A.J.P. Taylor, p. 28

অনিবার্যতার মধ্যে একটি পূর্বনির্ধারিত অর্থ থাকে। যে পূর্বনির্ধারিত অর্থ দ্বারা সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কেননা সমাজ জীবনে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের উপায় (new means of production) কীভাবে এবং কেন তৈরী হয় তা ঐতিহাসিক অনিবার্যতার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না। এই বিষয়গুলি আমাদের জীবনযাত্রার, জীবিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই অনিবার্যতা কোনও অধিবিদ্যক শক্তি (metaphysical force) নয়। তা কেবল মানুষের দ্বারা অনুভূত হয়। মানুষের প্রচেষ্টা এই অনিবার্যতাকে অতিক্রম করতে পারে। এই অনিবার্যতা মানুষের ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই ইচ্ছা তার কর্মকে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের কর্ম দ্বারা নতুন নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার উপায় সৃষ্ট হয়। তাই রায় ঐতিহাসিক অনিবার্যতার সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধকে চিহ্নিত করেন। এই প্রেক্ষিতে রায় মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে স্ববিরোধী বলেছেন। মার্কসীয় ব্যাখ্যায় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পতনের অনিবার্যতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অবির্ভাব ঘটবে। একই সঙ্গে সেখানে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উৎখাতের জন্যও এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। রায়ের মতে এই দাবী দুটি অযৌক্তিক ও স্ববিরোধী। কেননা সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষয় ও বিলুপ্তি অনিবার্য হলে তার উৎখাতের জন্য সহিংস বিপ্লব অপ্রয়োজনীয়। পরিবর্তন করতে যদি বল প্রয়োগ করতে হয় তাহলে অনিবার্যতার কথা বলা যায় না। তাছাড়া বল প্রয়োগের মাধ্যমে যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে উচ্চতর শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তা প্রতিরোধ করাও সম্ভব। ফলে অনিবার্যভাবে সামাজিক পরিবর্তন হবে এমন দাবীও করা যায় না। তাই ইতিহাসের নির্ধারণবাদী তত্ত্ব এবং স্বাধীনতা এই দুটিকে এক আসনে বসানো সম্ভব নয়। এই সমস্যাকে মানবেন্দ্রনাথ রায় কীভাবে নবমানবতাবাদে সমাধান করেছেন তাই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

পঞ্চম অধ্যায়

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদ

মানবতাবাদ হল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব মুক্তি, নৈতিকতা এবং ন্যায়বিচারকে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করে। এ মতবাদ হল এমন দার্শনিক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাকে স্বীকার করে এবং কর্মের কর্তারূপে তাকে গুরুত্ব প্রদান করে। কোনও প্রকার ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার ওপর নির্ভর না করে এই মতবাদ যুক্তি, বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করে। যুক্তিপূর্ণ নৈতিক আচরণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ, সুখ ও পূর্ণতাকে নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। নিজস্ব পছন্দ অনুসারে জীবন পরিচালনার অধিকারকে সমর্থন করার জন্য রাজনৈতিক জীবনে মানবতাবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বশাসনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। এই মতবাদের অনুসারীগণ মানব সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বিকাশের সাহায্যে মানব সামর্থ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির দ্বারা উন্নত বিশ্ব গঠনে আগ্রহী।

আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় মানবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে ব্যক্তি তার নিজের বুদ্ধির আলোকে স্বাধীনভাবে নৈতিক পথ অবলম্বন করে কল্যাণকর জীবন যাপনে সমর্থ হবে। তিনি মনে করেন, মানবতাবাদ অতি প্রাচীন একটি দর্শন, যেখানে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং আধিপত্যকে (supremacy) স্বীকার করে তার নিরিখে জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। মানবতাবাদকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মানুষকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যে মতবাদে

মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তাকে এক রহস্যের আবরণে আবৃত রাখা হয় সে মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেছে বলে রায় মনে করেন। যেমন ফয়েরবাখীয় তত্ত্বে মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সেখানে মানুষকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয়। আবার, মধ্যযুগীয় দর্শনগুলিতে মানুষের কথা বলা হলেও সেখানে সর্বময় কর্তারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়। তাই রায় এই মতবাদগুলিকে মানবতাবাদ বলেই স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, যে মতবাদ মানুষের স্বাতন্ত্র্য, তার সৃজনী প্রতিভাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনও অতিজাগতিক সত্তাকে কল্পনা না করে বাস্তব বিষয়ের মধ্যে দিয়ে মানব সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করে, সেই মতবাদ হল প্রকৃত মানবতাবাদ। রায় তাঁর মানবতাবাদে একটি অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত বিশ্বচিত্র অঙ্কন করেছেন যেখানে ব্যক্তির যৌক্তিক সামর্থ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি মানব অস্তিত্বকে ও তার উদ্দেশ্যকে এক ভিন্ন আঙ্গিক থেকে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই অধ্যায়ে আমরা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব মানবতাবাদের মূল ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তাঁর দর্শন ভাবনার অনন্যতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা নব মানবতাবাদী ভাবনার মূল স্তম্ভ—স্বাধীনতা, যুক্তি ও নীতির অর্থ আলোচনা করব। পরবর্তী বিভাগে আমরা আলোচনা করব রায় কেন মানবতাবাদকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করছেন। তারপরেই আমরা দেখতে চাইব তিনি মানবতাবাদের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ দর্শনের কোন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন। শেষে সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে রায়ের মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করব।

রায়ের নবমানবতাবাদে মানুষের জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কেননা জ্ঞান লাভের সামর্থ্য থাকার জন্য মানুষই কেবল অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মানবেতর জীবের পারিপার্শ্বিক বোধ এবং চেতনা থাকলেও জ্ঞান লাভের সামর্থ্য নেই।

জ্ঞান চেতনা থেকে ভিন্ন ও উন্নততর অবস্থা। কেননা জ্ঞান মানুষকে শক্তি প্রদান করে। যে শক্তি মানব জাতির কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়, অপরকে দমন করা অথবা অধিপত্য বিস্তার করার জন্য নয়। এই জ্ঞান মানব স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এবং জ্ঞানের কারণেই ব্যক্তি বিভিন্ন কল্যাণমুখী কর্ম পালনে উদ্যোগী হয়। তাই বলা যায়, এই জ্ঞানের লক্ষ্য হল অধিক থেকে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন। সেজন্য রায় বলেন, মানবতাবাদীর উদ্দেশ্যই হল জ্ঞানের অনুসন্ধান ও তার বিতরণ। সেজন্য রায়ের দর্শন কোনও অলৌকিক উপলব্ধি অর্জনের দাবী করে না, বরং তাঁর লক্ষ্য হল মানুষের জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে, সভ্যতার আরম্ভ থেকে মানব বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন দর্শন গঠন করা। তিনি প্রচলিত মানবতাবাদের মূল সুরটিকে গ্রহণ করে তাকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে মানবতাবাদের এক উন্নত রূপ চিত্রিত করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে মানবতাবাদী দর্শনের এক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বলেই তিনি এই দর্শনকে ‘নব মানবতাবাদ’ নামে অভিহিত করেন। নব মানবতাবাদী দর্শন সর্বপ্রথম রূপায়িত হয় তাঁর *নিউ হিউম্যানিজম* (১৯৪৭) নামক গ্রন্থে। সেখানে প্রথম অংশে প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদের সমালোচনার পরে নব মানবতাবাদের মূল নীতিগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। তারও আগে ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে বোম্বেতে র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্মেলনে নব মানবতাবাদের মূলনীতিগুলি একত্রিত করে একটি ইস্তাহার প্রচার করা হয়েছিল। সেখানে রায় মানুষের মনে নতুন আশা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য স্বাধীনতার আদর্শকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তা উল্লেখ করেন।

স্বাধীনতা: মানব জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য

রায় মনে করেছিলেন, স্বাধীনতাই সকল মানব প্রচেষ্টার উৎস হওয়ায় স্বাধীনতা একটি সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ বলে গ্রাহ্য হওয়া সম্ভব। রায় বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতা হল এমনই মানবীয় মূল্য যার স্থান সব বিচার বিবেচনার উর্দ্ধে যেহেতু মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সাধন মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং তা সম্ভব হয় স্বাধীনতার দ্বারা। সে কারণেই রায় স্বাধীনতার ধারণাকে একটি বহুমাত্রিক ধারণা রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক মুক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়; তা ব্যক্তির আত্মোন্নয়ণ, বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতি, নৈতিক দায়িত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রকারের কথা বলেছেন যেগুলি একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণই কেবল নয়, একে অন্যকে বিনা অসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (individual freedom)। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপস্থিতিতে ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ হয় বলে সে স্বাধীন নির্বাচনে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। এমন স্বাধীনতায় মানুষের মন ও চিন্তার মুক্তি ঘটে বলে মানুষ যুক্তির সহায়তায় নিজে সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে। আবার তিনি নৈতিক স্বাধীনতার (Moral Freedom) কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার সঙ্গে নৈতিকতার একটি গভীর সংযোগ আছে। স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র অধিকার নয়, এর সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। একজন স্বাধীন ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হল নিজের এবং সমাজের কল্যাণ করা। নৈতিক স্বাধীনতা থাকার অর্থ হল কোনও বাহ্য নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম ব্যতিরেকেই ব্যক্তি তার বিবেক ও যুক্তির দ্বারা চালিত হয়। তৃতীয়ত, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার (intellectual freedom) কথা বলেন। যেখানে ব্যক্তি বিজ্ঞান মনস্কতা ও জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যাবতীয় কুসংস্কারকে বর্জন করে যুক্তিবুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে। তিনি মনে করেন, মুক্ত চিন্তা ও যুক্তির চর্চা ব্যতীত প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভব নয়। তাই তিনি সকল প্রকার (ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক) গোঁড়ামীর বিরোধিতা করেছিলেন। চতুর্থত, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা (Political and Social freedom)। রায় মনে করেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক মুক্তি (যেমন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি) যথেষ্ট নয়। ব্যক্তির ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে যায়। এছাড়াও তিনি ইতিবাচক স্বাধীনতার (Positive freedom) কথা বলেছিলেন। এ স্বাধীনতার লক্ষ্য কেবল বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা অপসারণ নয়; বরং মানুষের সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করা। এই স্বাধীনতা হল যথার্থ রূপে স্বাধীনতা। এই লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর দর্শনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি নব মানবতাবাদকে আধুনিক সমস্যার সমাধান হিসাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তৎকালীন বিশ্বে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এবং ভারতবর্ষের প্রাকস্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী অবস্থার প্রেক্ষিতে রায় নবমানবতাবাদী তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছিলেন। বর্তমান অবস্থাকে বিচার করে তিনি বলেন, মানুষের মহৎ ঐতিহ্যের গুণকে সঠিক ভাবে বুঝতে না পারার জন্য বর্তমান সভ্যতায় সংকট তৈরী হয়েছে। মানুষের নিকট কোন মূল্যটি তাৎক্ষণিক এবং কোনটি চিরন্তন তা বুঝতে না পারার জন্যই এই সমস্যার সূত্রপাত। তাই তিনি মানব গোষ্ঠীর সেই চিরন্তন মূল্যের সন্ধান করতে চেয়েছিলেন যা মানুষের স্থৈর্য্য, ঐক্য ও সমানুভবের আদর্শকে শক্তি দিয়েছে।

রায় স্বাধীনতাকেই চরম মূল্য বলে দাবী করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন—“আমি মনে করি স্বাধীনতাই হল চরম মূল্য, এর থেকে অন্য সকল মূল্যের উৎপত্তি।”[১] তিনি

[১] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নব মানবতাবাদ*, পৃ ৪৬

স্বাধীনতাকে চরম মূল্য বলেন কারণ তাঁর মতে, “মানব আস্তিত্বের সারাৎসার হল স্বাধীনতার আকুতি।”[২] কেননা মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মূলে আছে তার জীবন সংগ্রাম। এই জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রকৃতিকে জয় করতে সচেষ্ট হয়। মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্র করেই মানুষের নতুন নতুন জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টা চলে। রায় বলেন, এই জৈবিক জীবন সংগ্রামই বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। তাই স্বাধীনতাই হল মানব জীবনের চরম মূল্য, চরম আদর্শ। এই আকুতিকে রহস্যের আবরণে আবৃত রাখার প্রয়োজন নেই। জৈব বিবর্তনের নিম্নতম স্তরেও এই একই আকুতির সন্ধান পাওয়া যায়। কেননা মানব চরিত্রে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় তা আদিম মানুষের সেই জীবন সংগ্রামের সম্প্রসারণ বলে রায় ব্যাখ্যা করেন[৩]। এখানে আমাদের মনে হতে পারে রায় ‘জীবন ধারণের জৈবিক সংগ্রাম’ এবং ‘স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা’-কে সমতুল্য বলে মনে করেছেন। কিন্তু এমন অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ এই দুটি ধারণাকে সমার্থক বললে একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা সম্ভব হতো। কিন্তু রায় মনে করেন, কেবলমাত্র নেতিবাচক অর্থে ‘জীবন ধারণের জৈবিক সংগ্রাম’ কথাটির পরিবর্তে ‘স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা’কে ব্যবহার করা যায়[৪]। অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যদি সংগ্রামের অভাব দেখা যায় তবে তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত একথা বলা যায়। কারণ জীবন ধারণের জৈবিক সংগ্রাম হল প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার নিরন্তন প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টা মানুষ থেকে শুরু করে না-মানুষ পর্যন্ত সকল চেতন জীবের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই সংগ্রাম কিন্তু যান্ত্রিক। তবে মানুষের ক্ষেত্রে মুক্তির বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

---

[২] তদেব, পৃ ৪৬

[৩] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 50

[৪] Ibid, p. 49

কখনই যান্ত্রিক নয়। মানুষের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে থাকে উদ্দেশ্যমুখীনতা—যার জন্য মানব সংগ্রাম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ জীবন সংগ্রাম যখন মানব প্রজাতির স্তরে জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয় তখনই তাকে বলে মুক্তির অন্বেষা বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। রায়ের কথায়, "Quest for freedom in human evolution is purposive."[৫] তিনি মনে করেন, যান্ত্রিক জৈব নির্বাচন দ্বারা জীবন সংগ্রাম বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। প্রকৃতিকে জয় করার উদ্দেশ্যমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ এই সংগ্রামকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হয় কোন কারণে মানব সংগ্রামের অন্তরে থাকে উদ্দেশ্যমুখিতা বা নির্দিষ্ট অভীষ্ট অর্জনের লিপ্সা? মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক কেন? সে কীভাবে বিশিষ্টতা (differentiated) লাভ করে? এই প্রশ্নের উত্তরে রায় বলেন, মানুষ অরণ্যময় পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তার হাতগুলোকে লম্বা করেছে। অভিযোজনের কারণে তার গঠনগত ও মানসিক দিকে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। যে মুহুর্তে সে আবিষ্কার করে যে এর দ্বারা গাছের ডাল ভাঙা সম্ভব এবং সেই ভাঙা ডাল দিয়ে অন্য কোনও উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব তখনই যান্ত্রিক বিবর্তনের সমাপ্তি ঘটে এবং উদ্দেশ্যময়তা বা অর্থবহতা জৈব বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। তখন থেকে মানুষের প্রকৃতপক্ষে বিজয়ের সংগ্রাম শুরু হয় এবং জীবন সংগ্রাম মুক্তি অন্বেষায় পরিণত হয়। এই নগণ্য সূচনা থেকেই বর্তমান জগতের বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কার সম্ভব হয়। এ সমস্ত কিছুই মানুষ তার মুক্তি অন্বেষার জন্যই সৃষ্টি করে। তাই তিনি এমন দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব না হয়। তিনি মানুষকে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে তার স্বাধীনতার কথা বলেন। তাঁর

---

[৫] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 50

মানবতাবাদের এক ও একমাত্র শর্ত হল স্বাধীনতা। তিনি মনে করেন, যে দর্শনে মানুষের স্বাধীনতার হানি ঘটে সেই দর্শন কখনই মানবতাবাদী দর্শন নয়। তাই তিনি সর্বতোভাবে মানুষের স্বরূপ নির্ধারণ করে তার সঙ্গে স্বাধীনতার যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

রায়ের মতে, বিজ্ঞান হল সত্যের অনুসন্ধান। সেজন্য রায় বলেন, "search for truth is a corollary to quest for freedom"[৬] অর্থাৎ সত্যান্বেষণ হল মুক্তিন্বেষার অনুসিদ্ধান্ত। স্বাধীনতার অন্বেষণে যখন থেকে জৈবিক বিবর্তন উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছে তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল। বিজ্ঞান যেহেতু সত্যকে প্রকাশ করে তাই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সফল করার জন্য বিজ্ঞান হল মানব অনুসন্ধানের একটি উপজাত (by product) বিষয়। তাহলে প্রশ্ন আসে রায়ের কাছে সত্য কী? তিনি সত্য বলতে কী বুঝেছেন? রায়ের নিকট সত্য হল জ্ঞানের আধেয় যা বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার প্রতিসঙ্গ বা অনুরূপ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের সমগ্র জগত অথবা জগতের বিশেষ একটি অংশ সম্পর্কে একটি মোটামুটি (approximate) চিত্র দেয়। সেজন্য রায় বলেন সত্যই জ্ঞানের বিষয়বস্তু। যেমন ২+২= ৪ এই জ্ঞান সত্য। যে কোনও দুটি বস্তুর সঙ্গে অন্য দুটি বস্তু যুক্ত করলে তা চারটি বস্তু হবে। এটি একটি অপরিবর্তনীয় ঘটনা। কারণ যে কোনও পরিস্থিতিতে এমনটাই হয়। তাই রায় সত্যকে গাণিতিক ধারণাও বলেছেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন যে গণিত হল বস্তু পরিমাপের পদ্ধতিমাত্র, অন্যথায় অপরিমেয়; এর কাজ হল সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে তথ্যের বিবৃতি বিচার করা। রায়ের উদ্দেশ্য হল এমন এক দর্শন প্রতিষ্ঠা করা যা মানব অস্তিত্বের সকল দিকগুলিকে—তার দৈহিক,

---

[৬] Roy, M.N. *Beyond Communism*, p. 51

মানসিক, নৈতিক প্রেক্ষিতগুলিকে স্বাধীনতার জ্ঞান ও সত্যের আলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে চিত্রিত করতে পারে। এইভাবে স্বাধীনতার অন্বেষণ জ্ঞানে পরিণত হয়। জ্ঞানের বিষয়বস্তু হল সত্য, সব সময় বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সত্য বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এইভাবে স্বাধীনতা, জ্ঞান ও সত্যকে সমন্বিত করে একটি দর্শনে গ্রোথিত করে সেই দর্শন দিয়ে মানুষের বস্তুগত, মনোগত এবং নীতিগত অস্তিত্বের সকল দিকগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে রায় দাবী করেছেন। রায়ের কথায়,

> ...quest for freedom does result in knowledge, and the content of knowledge is truth; knowledge always is acquaintance with reality. Truth being correspondence with reality, the content of knowledge is truth. Thus, freedom, knowledge and truth can be woven harmoniously in the texture of one philosophy explaining all the aspects of existence—material. Mental and moral.[৭]

রায় স্বীকৃত বস্তুবাদ ও বস্তুবাদ-ভিত্তিক নৈতিকতা

রায় যে নব মানবতাবাদী দর্শনের উপস্থাপনা করেছেন তার ভিত্তি হল বস্তুবাদ। রায় মানুষের আদর্শ রূপে স্বাধীনতাকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে একথা স্পষ্ট যে মানুষ তার সামর্থ দ্বারাই এই স্বাধীনতা অর্জন করবে। সে তার জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ দ্বারা, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে অর্জন করবে।

---

[৭] Roy, M.N. *Beyond Communism*, p. 52

ব্যক্তির এমন প্রচেষ্টাকে যুক্তিযুক্ত রূপ দিতে জগতের উৎপত্তি বিষয়ে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী যেহেতু জগতের আদিতে তিনি কেবল বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এবং জগতের যাবতীয় বিষয়, এমনকি চৈতন্যের উৎপত্তিও জড়বস্তু থেকে হয় বলে মনে করেছেন। তিনি জড় ও চেতন এই দুটিকে পরস্পর বিরোধী ভিন্ন সত্তা বলে স্বীকার না করে বলেছেন, বিশ্বের রূপকে এমনভাবে ভাগ করলে আদর্শ, নীতিশাস্ত্র বিভক্ত হয়। তাঁর মতে, বিশ্ব যদি সুবিন্যস্ত কিছু একটা হয় তাহলে এর রূপ কল্পনায় বস্তু ও ভাবের (চৈতন্যের) ভাগাভাগি যথার্থ নয়[৮]। আবার তিনি আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদীদের মতো কোনও সর্বময় চেতন সত্তার অস্তিত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেননি যেহেতু তা মানব স্বাধীনতা ও মানব বিকাশের পরিপন্থী। তাঁর মতে, দ্বৈতবাদী দর্শন মানুষকে স্বাধীন বলে বিবেচনা করে না। সেখানে উত্তরণের জন্য ধর্মের আশ্রয় নিতে হয়। ধার্মিক মানুষ ঈশ্বর তথা অতিজাগতিক শক্তির নিকট নিজেকে সমর্পণ করার ফলে নৈতিকতার প্রকৃত অর্থ হয় স্বাধীনতার অপলাপ। কিন্তু অদ্বৈত বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে যদি নীতিশাস্ত্র বা আদর্শকে গ্রহণ করা হয় তাহলে সেই আদর্শ, নৈতিকতা বাস্তব জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং সেখানে দ্বৈতবাদী নীতিশাস্ত্রও সৃষ্টি হয় না। তিনি এমন দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব না হয়। তিনি মানুষকে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে তার স্বাধীনতার কথা বলেন। তাঁর মানবতাবাদের এক ও একমাত্র শর্ত হল স্বাধীনতা। তিনি মনে করেন, যে দর্শনে মানুষের স্বাধীনতার হানি ঘটে সেই দর্শন কখনই মানবতাবাদী দর্শন নয়। তাই তিনি সর্বতোভাবে মানুষের স্বরূপ নির্ধারণ করে তার সঙ্গে স্বাধীনতার যোগসুত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

[৮] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ১৯

রায় আধুনিক বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে বলেন, মানুষ চেতনার অধিকারী হলেও তার উৎপত্তি জড় জগতের পটভূমিতেই। মানুষের এই উৎসকে অনুসন্ধান করতে হয় জগত সৃষ্টির আদি পর্যায় থেকে। কিন্তু সেখানে মানব বিবর্তনের শৃঙ্খলকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। প্রশ্ন ওঠে জড় পদার্থ থেকে প্রাণের উৎপত্তি হয় কীভাবে? দ্বৈতবাদী বৈজ্ঞানিক প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। প্রাণের উৎপত্তি যদি জড় ভিন্ন কোনও অজড় সত্তা থেকে হয় তবে আধ্যত্মিক অদ্বৈতবাদীদের ন্যায় এক সর্বময় চেতন কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে যা মানব স্বাধীনতার বিরোধী। কিন্তু রায়ের মতে, আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।[৯] অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের লেখাতেও রায়ের এই দাবীর সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা প্রোটোপ্লাজমের (প্রাণ কোষের) গঠন সম্পর্কিত রাসায়নিক ব্যাখ্যার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে থাকা জৈব যৌগগুলির মধ্যে এক ধরনের আত্ম-সংগঠন প্রক্রিয়া চলে, যার মাধ্যমে জীবনের সৃষ্টি হয়। এই আত্ম-সংগঠনের মাধ্যমে প্রোটোপ্লাজম জটিল আকার ধারণ করে এবং জীবনের সুত্রপাত হয়। এই তত্ত্বকে আদি জীববৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা হয়। ১৯৩৬ সালে *দ্য অরিজিন অফ লাইফ* গ্রন্থে অলেকজান্ডার অপারিন প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক একটি তত্ত্বের কথা বলেন। তাঁর দেওয়া তত্ত্বকে অপারিনের তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে আদিকালে পৃথিবীতে সহজ রাসায়নিক যৌগগুলি মিথস্ক্রিয়া করে জটিল জৈব যৌগ গঠন করে। এই প্রক্রিয়ার প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদান তৈরী হয়।[১০] তারও পূর্বে জন বারডন স্যান্ডারসন হ্যাল্ডেন (John Burdon Sanderson Haldane) ১৯২৯ সালে জীবনের উৎপত্তি বিষয়ে

---

[৯] Roy, M.N., *Reason Romanticism and Revolution*, p. 467

[১০] Oparin, A.I., *The Origin of Life*, p. 64

যে মতবাদ প্রদান করেন তা প্রাইমোডিয়াল স্যুপ তত্ত্ব নামে খ্যাত। এই তত্ত্ব বলে যে সৃষ্টির আরম্ভে পৃথিবীতে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জল মিলিত হয়ে এক স্যুপ সৃষ্টি করেছিল যা বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের প্রভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব যৌগ তৈরী করে। পরবর্তী কালে স্ট্যানলি মিলার ও হ্যারল্ড উরের (Stanley Miller and Harold Urey) পরীক্ষায় এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁদের গবেষণাপত্রটি ১৯৫৩ সালে "A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions" নামে প্রকাশিত হয়। এই মতবাদগুলি জীব বৈজ্ঞানিক প্রাথমিক তত্ত্ব বলে বিবেচিত হয়। এই সকল তত্ত্বে জড় থেকে জীবনের সূচনা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। কিন্তু সেই দাবীগুলি সম্পর্কে সবাই সহমত পোষণ করেন এমন নয়। যাঁরা এই দাবীর সঙ্গে সহমত না তাঁদেরকে রায় প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলছেন, যাঁরা জড়কে প্রাণের উৎস বলে অস্বীকার করেন তাঁদের কাছে প্রাণের উৎস কি? তাকে কি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে স্বীকার করা হবে? তাহলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করতে হয়। রায় বলেন, যদি কোনও দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক এমন সিদ্ধান্তে আসেন তাহলে তাঁরা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক নন, ধার্মিক ব্যক্তি। তাঁদের এই মতবাদে এক ভ্রান্তি থেকে যায়। সেখানে 'শূন্য' (Nothing) থেকেই 'কোনও কিছু'(Something) সৃষ্টি হল এমন চিন্তনগত ভ্রান্তি ঘটে। যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই। তাই রায় বলেন, যেহেতু সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয় সেহেতু এই মত স্বীকার করা যায় না। বরং জড় পদার্থ থেকেই প্রাণের মতন নতুন কিছু উদ্ভূত হয়েছে– এটাই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য বলে স্বীকার করতে হয়[১১]। অদ্বৈত বস্তুবাদী যুক্তি দিয়েই এই বক্তব্যকে

[১১] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ২০

সমর্থনও করা যায়। সেখানে দেখানো যেতে পারে যে বিবর্তনের আদি থেকে সব কটি সৃষ্টিকে একটি গ্রন্থিতে সম্বন্ধ করা যায় যা জৈবকে অজৈবের সঙ্গে যুক্ত করে। রায় বলেন,

> There is a unbroken chain connecting the elementary indefinable of psychology with physics; it runs through physiology, cytology and chemistry. Once the rationally (determinateness) of the mysterious phenomena of instinct, intuition, impulse, etc. is revealed, the chain can be traced to the other direction also—to the highest expressions and greatest creations of the human mind.[১২]

রায় মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলি (ইলেকট্রন, নিউট্রন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব) বস্তুবাদকে খণ্ডন করে না, বরং তাকে বেশী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। বস্তুবাদের পুরনো ধারণার পরিবর্তন করেছিল। পুরনো যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা মনে করতেন, বস্তু হল কঠিন এবং অপরিবর্তনীয় কিছু কণা। কিন্তু আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে পদার্থ হল গতিতে থাকা শক্তি (mass-in-motion)। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন কোন স্থির কণা নয়। বরং এরা গতিশীল শক্তির সত্তা (material entities)। আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তু (matter) এবং শক্তিকে (energy) আলাদা কিছু বলে স্বীকার না করে সেগুলি একে অপরে রূপান্তরযোগ্য বলে মনে করে।[১৩] অর্থাৎ শক্তিকে বস্তুতে এবং বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত

---

[১২] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 70

[১৩] Roy, M.N. *Materialism*, p. 261

করা যায়। এর মাধ্যমে পদার্থ এবং গতির দ্বৈতবাদ (dualistic conception of matter and motion) অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাই রায় মনে করেন, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান বস্তুবাদকে একটি অটল ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। এটি প্রমাণ করেছে যে মহাবিশ্বের মূল ভিত্তি হলো বস্তু (matter), যা গতি এবং শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। রায় এই বস্তুবাদের সঙ্গে যান্ত্রিকতার সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তবে রায় কার্টেসীয় যান্ত্রিকতার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি ফরাসী পদার্থবিদ কণুর (Cornu) উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলেছেন, পুরনো যান্ত্রিকতার যেখানে শুধুমাত্র বস্তু ও গতির কথা বলা হত, তা এখন পরিবর্তিত হয়েছে।[১৪] আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বস্তু ও গতির মধ্যে কোনও দ্বৈতভাব নেই, সেগুলি এক হয়ে গেছে। তাই তিনি পুরনো যান্ত্রিকতার ধারণাকে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি বস্তুবাদের যান্ত্রিকতাকে বাতিল করে না, বরং কার্যকারণ সম্পর্ক এবং বস্তুগত ভিত্তির উপর নির্ভর করে মহাবিশ্বকে বোঝার যান্ত্রিক ধারণা এখনও প্রাসঙ্গিক।[১৫] কিন্তু সেই যান্ত্রিকতা সংকীর্ণ এবং স্থবির যান্ত্রিকতা নয়। এটি এমন এক দর্শন, যা মানুষের সৃজনশীলতা এবং চেতনার উদ্ভবকেও প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসেবে গণ্য করে।

রায় বলেন, প্রাণের উৎস থেকে রহস্যের যবনিকাকে আপসারণ করলে মানুষকেও একটি জড় থেকে সৃষ্ট বিষয় বলে গণ্য করা যায়, যা একটি প্রাকৃতিক (natural) বিষয়। রায়ের কথায়,

---

[১৪] Ibid, p. 262

[১৫] Roy, M.N., *Materialism*, P. 265

> Arising out of the background of the law-governed physical Universe, man is a rational being. Begin with psychology and anthropology; they, together with the allied sciences, all merge in biology—the science of life. Biology, through bio-chemistry, merges in chemistry; the dividing the between chemistry and physics has disappeared; consequently, you have an unbroken chain of descent of man from the fiery mass of the primeval physical being to the pluralistic picture of the world of today.[১৬]

তাই মানুষের শক্তি, আচরণের জন্য অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এমনকি দাবী করা যায় জৈব প্রবর্তনা (instinct) কিংবা স্বজ্ঞা (intuition) রহস্যময় কিছু নয় যে তাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। আমাদের আত্মাও কোনও স্বর্গীয় আলোর আকস্মিক স্ফূরণ নয়। তা হল বুদ্ধি ও আবেগের মিলিত সংহত প্রকাশ। স্পষ্ট করে বলা যায় আত্মাই মানুষকে পথ দেখাবার আলোকবর্তিকা। এই ব্যাখ্যার বাইরে আত্মা সম্পর্কে অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হলে তা কাল্পনিক গল্পকথা বলতে হয়। রায়ের মতে, আত্মাও একটি জৈব ঘটনা মাত্র। আত্মাকে তাই অতীন্দ্রিয় কোনও তত্ত্ব না বলে তার সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই মূল্য দর্শন রচনা করা প্রয়োজন। সেই দর্শনের অন্য সকল মূল্যকে একটি

[১৬] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 71

চরম মূল্য থেকে আহরণ করা প্রয়োজন[১৭]। এইভাবেই রায় প্রাতিষ্ঠানিক নীতিশাস্ত্রের অস্পষ্টতা দূর করে অদ্বৈত বস্তুবাদের ভিত্তিতে নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

রায়ের মতে, জৈবিক উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত একটি মানবিক গুণ হল নীতিবোধ। নীতিবোধসম্পন্ন হওয়ার জন্য কেবল মানবতার উপস্থিতি জরুরী, কোনও রহস্যময়, স্বর্গীয় সত্তা নির্দেশিত বিধানের প্রয়োজন নেই। ন্যায়ের পথ অনুসরণের জন্য ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ নিষ্প্রয়োজন। এর জন্য কিছু কুসংস্কারের উপর নির্ভর করাও অর্থহীন। রায়ের দাবী, এই মানবতাবাদী নীতিবোধ ক্রমবিবর্তনের ফসল। মানবতাবোধ বলতে রায় একটি নৈতিক বোধের কথা বলেন যা ব্যক্তির সার্বিক বিকাশের পূর্বশর্ত। এই নৈতিক বোধ স্বতঃই মানুষের মধ্যে থাকে বলে এর উৎস রূপে ঈশ্বর নামক কোনও অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কারণ তাহলে মানুষকে আর স্বাধীন বলা যাবে না। অথবা বলা যায় না যে নৈতিকতা-ঈশ্বরজন্য। কেননা সেই নৈতিকতার ভিত্তি ভৌত জগতের বাস্তব সত্য নির্ভর হবে না। ফলে অবশ্যই তা একজন মানবতাবাদী, বিশেষ করে একজন বস্তুবাদী মানবতাবাদীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই রায় স্বাধীনতাকে জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে ভৌত জগতের প্রেক্ষিতে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেন। সেখানে তিনি নৈতিকতা বা নীতির ভিত্তি রূপে যুক্তিকে স্বীকার করেন[১৮]। রায়ের কাছে যুক্তির আদিম রূপ হল বোধি বা সহজ বুদ্ধি। এই বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাই রায় বলেন, আত্মরক্ষা ও জীবন সংগ্রামের তাগিদেই মানুষ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। আধুনিক নৃতত্ত্ব প্রমাণ করে যে মানব সমাজের উৎপত্তির মূলে কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার নির্দেশ নেই। মানুষ

---

[১৭] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ২০

[১৮] Principle of New Humanism, Thesis 4.

মুলত যুক্তিশীল প্রাণী বলেই সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে, নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য সমাজ গঠনে আগ্রহী হয়। আধুনিক জীববিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। কিছু কিছু যুক্তিবোধ বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা ইতর প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। কাজেই যুক্তিশীলতা হল একটি জৈবিক ক্রিয়া, উচ্চ প্রাণীদের মধ্যেই তার পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায়। রায়ের মতে, এই যুক্তিশীলতার সাহায্যেই মানুষ তার নিজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে বলে নৈতিকতা একটি সামাজিক গুণ।

সেজন্য রায় দাবি করেন, যুক্তির ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হলে সে সমাজ নীতিসম্মত হবেই। প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার পটভূমিতে মানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে মানুষ মুখ্যত যুক্তিবাদী, কারণ সে জগতের সঙ্গে অভিযোজনের সময় ঐ নিয়ম শৃঙ্খলাকে অন্তঃস্থ করেছে। অতএব মানুষ নীতিপরায়ণ। সকলের পক্ষে কল্যাণকর, সুসমঞ্জস্য সমাজ সম্পর্ক স্থাপনের যুক্তিযুক্ত ইচ্ছা থেকেই নীতির উদ্ভব হয়। রায় মনে করেন, 'শূন্য থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়নি। বিশ্বজগতের বাস্তব পটভূমিতে জৈবিক বিবর্তনের নানা স্তরের ভিতর দিয়ে মানুষের উদ্ভব। তাই মানুষ, তার মন, বুদ্ধি, ইচ্ছা—সবকিছু নিয়ে বাস্তব বিশ্বজগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবার এই বিশ্বজগৎ নিয়মের অধীন হওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব, বিবর্তন, আবেগ, ইচ্ছা, চিন্তা—সবকিছুই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলায় বিধৃত। মানুষ মূলত যুক্তিবাদী। বিশ্বজগতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐকতান শোনা যায় মানবীয় যুক্তি তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষের এই অন্তর্নিহিত যুক্তিই তার নীতির উৎস'।[১৯] এই বক্তব্যকে স্বীকার করতে পারলেই মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছায় নীতিবান হওয়াও সম্ভব বলে রায় মনে করেন।

---

[১৯] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নব মানবতাবাদ*, পৃ ৩৮

রায় যুক্তির উৎস ব্যাখ্যা করার জন্য অদ্বৈতবস্তুবাদের সাধারণ ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে যুক্তি হল বিষয়গত ব্যাপার যা ভৌত জগতের অংশ[২০]। তিনি মনে করেন, সমগ্র জড় জগত পরিবর্তিত হয় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে যা জড় প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই পদ্ধতিকেই তিনি যুক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। সে কারণে যুক্তি হল প্রকৃতির নির্দেশ। সমস্ত জৈব প্রক্রিয়া ও মানসিক ক্রিয়া জড় জগতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সংঘটিত হয়, কারণ প্রাণের আবির্ভাবই হয় জড় থেকে এবং প্রাণও জড় জগতের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই যুক্তি জড়ের গুণ। এ কোনও অধিবিদ্যক বা রহস্যাবৃত বিষয় নয়। ভৌত জগত যেহেতু প্রাকৃতিক নিয়ম নির্ভর—জাগতিক সমস্ত ঘটনা তাই কার্য-কারণ নিয়মের অধীন। এটি যুক্তিসম্মত প্রস্তাব হওয়ায় রায় যুক্তিকে ভৌতজগতে প্রতিষ্ঠা করেন। রায় বলেন, জৈব প্রক্রিয়াগুলিকে প্রাকৃতিক নির্দেশ্যবাদের ধারাবাহিক পরিণতি বলে চিহ্নিত করা গেলে তবেই সহজাত প্রবৃত্তি, স্বজ্ঞা, আবেগ প্রভৃতি রহস্যজনক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হবে।[২১] এই বৃত্তিগুলির উৎসের সন্ধান কেবলমাত্র প্রাক-মানবিক বিবর্তনের সূত্রে পাওয়া যেতে পারে। রায় বলেন, যৌক্তিকতার উৎস সন্ধানে আরো অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে যেখানে জীবনের অবির্ভাব সম্পর্কিত প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রশ্নটি হল জড় প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে জীবনের উদ্ভব ঘটল কীভাবে? এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে দিয়ে যুক্তিকে প্রাকৃতিক নির্দেশ্যবাদের উপাদান বলে গণ্য করতে হবে। তাই রায় বিজ্ঞানের ধারণাকে গ্রহণ করে বলেন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জড় জগত থেকে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছে, তবে বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে বোধগম্য হলেও প্রত্যক্ষত প্রমাণ সম্ভব হয়নি।

---

[২০] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 69

[২১] Roy, M.N. *Beyond Communism*, p. 70

রায়ের মতে, বিবর্তন হল এক অবিচ্ছেদ্য পরিবর্তনের ধারা যার দ্বারা অবচেতন মানস স্তরের সঙ্গে পদার্থতত্ত্বের সংযোগ ঘটে। এই যোগসূত্র শারীরবৃত্তীয়, কোষবৃত্তীয়, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিতেও অবস্থিত। সহজাত প্রবৃত্তি, স্বজ্ঞা, আবেগ প্রভৃতি আপাত রহস্যময় ঘটনার যৌক্তিক প্রকাশ সম্ভব হলে শৃঙ্খলটি মানুষের মনের সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকেও ব্যাখ্যা করতে পারে। তাই তিনি বলেন,

> ...there is an unbroken chain of evolution from the vibratory mass of electric currents to the highest flights of human intelligence, emotion, imagination—to abstract philosophical thought, recondite mathematical theories, the sublimest poetry, the master work of arts.[২২]

সবকিছুর মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র আছে যা কম্পমান বিদ্যুৎ প্রবাহকে বিমূর্ত দার্শনিক তত্ত্ব, গণিততত্ত্ব, মহত্তম কাব্য, শিল্পের মহত্তম কীর্তির সঙ্গে গ্রোথিত করে। রায় মনে করেন, এই যোগসূত্রটি খুঁজতে হবে কেবলমাত্র অদ্বৈত বস্তুবাদ (Materialist Monism), ভৌতবাস্তববাদ (physical realism) বা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের (Scientific Rationalism) মধ্যে। কেননা এই ঐক্য সমগ্র মহাজাগতিক ব্যবস্থায় বিস্তৃত, সক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল পরিণতির মাধ্যমে প্রকাশিত। তাই এই ঐক্য অনুধাবন না করতে পারা পর্যন্ত মানব ইতিহাসকে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি মানুষকে ব্যাখ্যা করতে না পারা যায়, মানুষকে প্রবৃত্তিগত ও স্বভাবগত ভাবে মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী রূপে দেখানো না যায়—তাহলে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। রায়ের মতে, ইতিহাস নিয়ম শাসিত প্রক্রিয়া,

---

[২২] Ibid, p. 70

কারণ তা মানুষই সৃষ্টি করে। তাই তিনি বলেন, কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ কী আচরণ করবে, তা যদি জানা সম্ভব না হয় তাহলে ইতিহাসকে কখনই বিজ্ঞান সম্মত বলে দাবী করা যায় না।[২৩]

তিনি বলছেন, "Arising out of the background of the law-governed physical Universe, man is a rational being."[২৪] অর্থাৎ নিয়মশাসিত ভৌতজগতের প্রেক্ষাপট থেকে উদ্ভূত মানুষ একটি যুক্তিশীল প্রাণী। কারণ মনস্তত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব থেকে শুরু করে সমধর্মী বিভিন্ন বিজ্ঞানসহ সমস্তকিছু পর্যবসিত হয় জীববিদ্যায়—জীবনের বিজ্ঞানে। আবার জীববিদ্যা জৈব রসায়নের (bio chemistry) মাধ্যমে রসায়নে পর্যবসিত হয়। রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার বিভাজন রেখা বর্তমানে প্রায় লুপ্ত। একই রকম ভাবে সৃষ্টির আদি যুগে জ্বলন্ত ভৌতবস্তু থেকে মানব প্রজাতির উদ্ভব এবং জগতের অধুনা আবিষ্কৃত বৈচিত্র্যময় সত্তা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এক যোগসুত্র রয়েছে। একই উৎস থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে সকল মানুষ একই ধরণের প্রাণী; অনুরূপ প্রবৃত্তি ও প্রেরণার অধিকারী। তাই মানুষের একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববোধ কেবল কল্পনা নয়। মানুষ মাত্রেই একটি সাধারণ মানবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত এবং একই সাধারণ লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত।[২৫] সেই সাধারণ লক্ষ্য হল স্বাধীনতা। তাই রায় নৈতিকতাকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নৈতিকতা অনেক উন্নত যেহেতু তা কোনও ঐশ্বরিক শক্তির দমনের বা কোনও অতিজাগতিক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে আকারিত হয় না। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "I believed that not only a

---

[২৩] Principles of Radical Democracy, Thesis IV.

[২৪] Roy, M.N. *Beyond Communism*, p. 71

[25] Roy, M.N. Beyond Communism, p. 71

materialist ethics possible, but that materialist morality is the noblest form of morality."[২৬] যেহেতু মানুষ স্বনির্ভরতা বিসর্জন না দিয়ে নীতিসম্মত পথ অবলম্বন করতে পারে। তাই রায় নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে প্রাক-মানবীয় জৈব বিবর্তনের ফসল হিসাবে গণ্য করেছেন। যাকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজন কালে মানুষ একটি উন্নত আকারে আকারিত করেছে। রায়ের মতে, নৈতিকতা সাধারণত দু'রকম ভাবে লাভ করা যায়—তা জন্মগত ভাবে লব্ধ অথবা বহিঃসত্তার নির্দেশে লব্ধ। রায় নৈতিকতাকে জন্মলব্ধ হিসাবে গণ্য করেছেন। কারণ মানুষ যুক্তিশীল তাই সে নীতিপরায়ণ। রায় যুক্তিবাদিতাকে নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, কারণ তা না হলে নৈতিকতাকে বর্জন করতে হয় অথবা নৈতিকতাকে ধর্মের মোড়কে উপস্থাপন করতে হয়। রায় নৈতিকতাকে এক ধরনের আচরণ (human conduct) বলেছেন। মানব প্রজাতি যুক্তিশীল হওয়ার ফলেই নীতিবাদী হয়। রায়ের মতে, নৈতিকতা হল বিবেকের কাছে আবেদন—"Morality is an appeal to conscience." কিন্তু প্রশ্ন হয় এই বিবেক কী? তার উত্তরে রায় বলছেন, "I conceived conscience as awareness of social responsibility."[২৭] অর্থাৎ বিবেক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা অভিন্ন। এখানে বলা প্রয়োজন রায়ের মতে সামাজিক দায়দায়িত্ব কখনই ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী নয়। বরং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই সামাজিক দায়িত্বশীলতার উদ্ভব হয়। জীবন সংগ্রামই মানুষের মধ্যে ওই আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করে সমাজ গঠনে প্রেরণা জাগায়। এই সম্পর্ককে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হলে উদ্দেশ্য উপায়ের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরোও সন্তোষজনকভাবে চরিতার্থ করার সামর্থ্য লাভের জন্যই সমাজ স্থাপিত হয়। তাই সমাজকে

---

[২৬] Roy, M.N. Beyond Communism, p. 72

[২৭] Ibid, p. 72

কখনই স্বাধীনতা দমনের যন্ত্ররূপে স্বীকার করা সঙ্গত নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধের উপলব্ধি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই সব দায়দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভর করে সমাজের অস্তিত্ব। সে কারণে সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়া লব্ধ বিষয়। তাই তা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী হতে পারে না। মানুষ যদি মূলত তার যুক্তিবাদী সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয় তবে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি সুসমঞ্জস্য প্রক্রিয়ার ফল রূপে উত্তরণ ঘটে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতা তথা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মানবোধ আপনা থেকে গড়ে ওঠে। তাই রায় বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্ভাবনাগুলি আরো সার্থকভাবে বিকশিত করা সম্ভব যদি একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন মানুষ সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনা করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিজের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে আগ্রহী, তেমনি প্রত্যেকের কর্তব্য অন্য ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা। তাই রায় বলেন, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতাই চূড়ান্ত বিষয়। স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সকলে স্বেচ্ছায় সামাজিক দায়িত্ব পালন করবে। যদি কোনও সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি এই নিয়মটি অনুসরণ করে তাহলে সেই সমাজ একটি নীতিপরায়ণ সমাজে পরিণত হবে, যেহেতু ঐ সমাজ যুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। নিজেদের ক্ষতি যেমন আমাদের কাম্য নয়, তেমনি আমাদেরও উচিত অন্যের ক্ষতি না করা। এই পারস্পরিক বোঝাপড়া সমাজের ভিত্তি। তাই যুক্তিবাদী সমাজে বিবেকের অনুশাসন পালন করার জন্য কোনও অতিজাগতিক কর্তৃত্বের নির্দেশ কিংবা ঈশ্বরের প্রভূত্ব কল্পনার প্রয়োজন হয় না।

তাই রায় নৈতিকবোধকে মানুষের সহজাত যুক্তিপ্রবণতার মধ্যে অনুসন্ধান করেছিলেন। তা না হলে নৈতিক মূল্যবোধগুলি যুক্তি বিবর্জিত ধারণায় পর্যবসিত হয় এবং সেগুলি যেন বলপূর্বক আমাদের ওপর আরোপিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে তিনি নৈতিক

আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর ভাষায়, “Moral relativity is immorality.”[২৮] তিনি মনে করেন, গোঁড়ামী, অযৌক্তিকতা এবং দমনমূলক নীতিতত্ত্ব সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য হয় না। কোনও বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস যে নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী, অন্য ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা সেটি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হবে না। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্য যে নৈতিক আচরণ প্রচলিত অর্থবান শ্রেণীর আদর্শের ধারণা তা থেকে ভিন্ন। সুতরাং যুক্তিহীন নৈতিকতা সার্বজনীন না হয়ে আপেক্ষিকতায় পর্যবসিত হয়। নৈতিকতার আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিণামের নিরিখে কর্মের বিচার করতে হয়। কিন্তু ফলাফলের ওপর কর্মের প্রকৃতি নির্ভর করলে আকস্মাৎ উৎপাদিত শুভ ফলের জন্য কোনও মন্দ কর্ম নৈতিক বলে বিবেচিত হয়ে যাবে। তাই রায়ের মতে, এরূপ কোনও বিভ্রান্তির শিকার না হয়ে নীতিতত্ত্বকে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, কারণ মানবিক মূল্যবোধ হল শাশ্বত। যতকাল মানবতার স্থায়িত্ব, মানবিক মূল্যগুলিও সমান্তরালভাবে অস্তিত্বশীল থাকবে। রায়ের কথায়, “...there are such things as human values; and human values are eternal, in so far as humanity is eternal.”[২৯] এখানে রায় চিরন্তন কথাটিকে কালিক অর্থে (physical sense) ব্যবহার করেননি। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন নৈতিকতার ধারণা এবং নৈতিক মূল্যবোধ হোমোস্যাপিয়েন্সদের (*homo sapiens*) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নৈতিকতার কোনও অতিমানবীয় বা ঐশ্বরিক উৎপত্তি নেই। যেহেতু মানুষের সকল বৃত্তিগুলির ব্যাখ্যা তার জৈব বিবর্তনের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় তাই নৈতিকতাকে শেষ পর্যন্ত সেভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রাক মানব জগতে কোনও শ্রেণী

---

[২৮] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 74

[২৯] Ibid, p. 74

সংগ্রাম ছিল না। নৈতিক আচরণ প্রাকমানবীয় জৈব উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলেই মানুষের নৈতিক মূল্যবোধগুলি সার্বিক (Universal)[৩০]। এইভাবেই রায় ইতিহাস সম্বন্ধে মানবতান্ত্রিক দর্শনের সাহায্যে সার্বিক মানবিক মূল্যবোধগুলি অনুধাবন করেন। সেজন্য রায় নীতিতত্ত্বকে জড় জগতের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেন, "A rational ethics is possible only as a part of materialist philosophy."[৩১] অর্থাৎ শুধুমাত্র বস্তুবাদী দর্শনের অংশ রূপেই যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব সম্ভব।

কেন রায় মানবতাবাদকে রাজনৈতিক লক্ষ্য রূপে ব্যবহার করতে চাইছেন?

রায়ের মানবতাবাদী দর্শন এবং তার ভিত্তিতে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠার সময়কাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়কালকে যদি বিচার করা হয় তাহলে রায়ের দর্শন ও তাঁর রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। ১৯৪৬ সালে ২৬ থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর বম্বেতে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির যে তৃতীয় সম্মেলন হয় সেখানে ফিলিপ স্প্রাট কর্তৃক 'The Crisis of Our Time' শিরোনামে সভাপতির ভাষণে তৎকালীন সময়ের সংকটকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এই ভাষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলকে অবগত করা। ভারতবর্ষে তখন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানিতে জনজীবন প্রায় স্তব্ধ। তার কিছুকাল পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে সারা বিশ্বে মানব সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এমন অবস্থায় রায় মনে করছেন ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব এক গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যে ঠান্ডা লড়াই চলছে

---

[৩০] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 47

[৩১] Roy, M.N., *Beyond Communism*, p. 74

তা যে কোনও সময়ে তৃতীয় কোন বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে মানব সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার থেকে আরোও বেশি ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা প্রবলভাবে রয়েছে বলে রায় মনে করেছিলেন। তিনি বলছেন, বর্তমান বিশ্ব এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসের অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে ক্ষয় ও নীতিহীনতার চিত্র স্পষ্ট। এই আশঙ্কাজনক অবস্থার ফলে সর্বনাশা যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে অথবা আধুনিক সভ্যতা ধীরে ধীরে লয় প্রাপ্ত হতে পারে। এমন অশান্ত ও নিপীড়িত জগতের জন্য সর্বতোভাবে শান্তি কাম্য হলেও কেবল দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের প্রস্তুতির আলোচনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩২] তিনি এই সংকটের কারণ অনুসন্ধান করে তার নিরসন করার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁর নব মানবতাবাদী তত্ত্বের মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালের ৩১ শে জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় রায় বলছেন, সমগ্র বিশ্ব এক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে। এই সংকট থেকে মানুষকে রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য।[৩৩] এই গভীর সংকট থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব তাঁর নব মানবতাবাদের মাধ্যমে তিনি তা ব্যক্ত করেছেন।

রায় মনে করেন, সংকটের সময় মানুষের চিন্তাশক্তির পরীক্ষা হয়। সারা বিশ্বে যে সংকট চলছে তার কারণ অনুসন্ধান এবং সংকট মোকাবিলার উপায় অনুসন্ধান করা তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রত্যয়গুলি এই সংকটের মোকাবিলায় যথেষ্ট নয় বলে তিনি নতুন এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ একটি নতুন দর্শন সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাই

---

[৩২] The conditions of the contemporary world present a dismal picture of decay, degradation and demoralisation. The threatening perspective appears to be either of ruinous war or slow breakdown of modern civilisation. While peace is obviously the crying need of a distracted and tormented world, on all sides, there is talk of war and frantic preparation for it. In *Reason, Romanticism and Revolutions*, p. 449

[৩৩] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *কমিউনিজম পেরিয়ে,* পৃ ৯

তিনি প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলির সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, “সভ্যতার সৃষ্টি লগ্ন থেকে এখনও পর্যন্ত যে দার্শনিক চিন্তা বিদ্যমান রয়েছে তাদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে।”[৩৪] বিবর্তনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন যুগান্তকারী ভাবনা এই ধারায় যুক্ত হয়েছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন কালে দর্শনের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি ইতিহাসের প্রথম পর্বে ধর্মীয় তথা ঈশ্বরকেন্দ্রিক দর্শনের কথা বলেন। দ্বিতীয় পর্বে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এবং নিউটন কেন্দ্রিক আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবের ফলে বিজ্ঞান নির্ভর প্রকৃতিবাদী দর্শনের উল্লেখ করেন। তৃতীয় এবং শেষ পর্বে তিনি সমাজ দর্শনের কথা বলেছিলেন। যেখানে মানুষের সমস্যা সমাধানে শুদ্ধ চিন্তালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ যথাযথ ভাবে করা হয়েছে। ইতিহাসের এই সমগ্র ধারার প্রতিটি পর্বের কিছু শাশ্বত মূল্য আছে। তাই বর্তমান সংকটের প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং ঐ সংকট দূর করতে উপযুক্ত প্রেরণা লাভের জন্য সভ্যতার সেই উত্তরাধিকারকে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সেই উত্তরাধিকারের যথাযথ মূল্যায়ন এবং মানব সভ্যতার সেই সকল শাশ্বত মূল্যবোধের যথাযথ স্বীকৃতির মাধ্যমে এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ইতিহাসের প্রতিটি অবস্থায় যদি শাশ্বত মূল্য থাকে তাহলে বর্তমান সংকটের উদ্ভব হল কেন? প্রাচীনকাল অপেক্ষা বর্তমান কালের মানুষ অনেক বেশী উন্নত; তার সৃজনশীলতা, কর্মক্ষমতা অনেক বিকাশ লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও কী কারণে ব্যক্তির সৃজনশীলতা বাধা প্রাপ্ত হয়? সে কেন বৌদ্ধিক, আত্মিক বাধা অতিক্রম করার শক্তি

[৩৪] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ,* পৃ ২৬

হারায়? এ কারণে মানব সমাজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। বলাই যায় যে এ সংকটের কারণ সমাজে প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক মতবাদগুলির দীনতা। রায়ের মতে, সেই মতবাদগুলি ও তার চর্চা যথার্থ হলে বর্তমান সংকট উপস্থিত হতো না। তাহলে কি বলা যায় সেই মতবাদগুলি ভ্রান্ত ছিল? কিন্তু সমসাময়িক সকল রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদগুলিই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। লক্ষ্য করা যায়, সামাজিক ন্যায়ের কথা তাত্ত্বিকভাবে বলা থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ যথাযথ ভাবে হয়নি। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিমান সামাজিক-রাজনৈতিক (উদারগণতন্ত্র, মার্কসবাদ) তত্ত্বগুলির চর্চা হলেও সেখানে এক অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। রায় মনে করেন, ঐ তত্ত্বগুলি মানুষের জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে অসমর্থ ছিল বলেই বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করে উঠতে পারেনি। সেখানে আধুনিক সমস্যাকে প্রচলিত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ধারণাগুলির সাহায্যে সমাধান করার প্রচেষ্টাই ব্যর্থতা ও হতাশার কারণ। আধুনিক মানুষের মন এবং নৈতিক বোধ এখনও জড় জগতের বিবর্তনের ধারণা অনুসারে গড়ে ওঠেনি বলেই যাবতীয় সমস্যার উদ্ভব হয় বলে রায় মনে করেন। আমরা এখনো জগত সৃষ্টির পশ্চাতে কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার উপস্থিতি কল্পনা করি; নৈতিকতাকে মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করি। ফলে মানুষ তার নিজের জ্ঞান, বিশ্বাসের উপর আস্থাশীল নয় বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়।[৩৫]

রায় মানুষের বৌদ্ধিক সামর্থ্যের উপর আস্থাশীল ছিলেন বলেই মনে করেছেন যে সমগ্র মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন

[৩৫] The mental make-up and moral tone of the civilised man have not been brought up to the level of material progress. That is the root cause of the crisis of our time. In *Reason, Romanticism and Revolution*, p. 450

হলেও নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান ব্যবহার করে পুরনো ধারণা ও তত্ত্বকে বাতিল করে নতুন পথ অন্বেষণ করেছে ঐ সমস্যা সমাধানের জন্য। সে তার নতুন অভিজ্ঞতার আলোতে অতীতকে বিচার করতে ঐতিহ্যগত ধারণা ও আদর্শকে বিচারমূলক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে পারে। মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধির মাধ্যমে প্রচলিত ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, পুরনো মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন ধারণা গঠন করতে পারে ও নতুন আদর্শের মাধ্যমে তার কর্মকে ভবিষ্যতের পথে চালিত করতে পারে। রায়ের মতে, মানুষ বিচার করতে পারে হতাশা ও অসহায়তার কারণ কী, কীভাবে তা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। রায় সিদ্ধান্ত করেন বর্তমান সংকট মোকাবিলায় সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের পুনর্বিন্যাস জরুরী, যেখানে জনজীবনে নৈতিক মূল্যবোধকে, ব্যক্তির স্বাধীনতার সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক মতবাদগুলিতে (উদারনীতিবাদ, সংসদীয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রবাদ) নৈতিকতার কথা থাকলেও ক্ষমতা অধিকারই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে মনে করা হয় যে ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ফলে ঐ রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনের অনুগামীরা মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ, অর্থনৈতিক লালসা এবং সর্বাত্মক আধিপত্য কায়েম করার প্রবল ইচ্ছার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। রায় এমন মনোভাবের তীব্র বিরোধীতা করে বলেন রাজনীতিকদের তাঁদের পেশার সঙ্গে সৎ হতে হবে, নচেৎ তা অসাধুতার প্রমাণ। নৈতিকতার সমর্থক রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিও মনে করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতা দখল আবশ্যিক কর্তব্য। যেমন, মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় সাম্য ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হল শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা দখল। এই ক্ষমতা দখলের জন্য তাঁরা যে কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত, এমনকি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবও তাঁদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ক্ষমতা দখলের পরে নানা বিধি নিষেধ আরোপ করতে থাকে। কিন্তু রায়

লক্ষ্য ও উপায় উভয়ের ন্যায্যতা রক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে কেবল লক্ষ্যটিই ন্যায় সঙ্গত হওয়া যথেষ্ট নয়, যে উপায়ে লক্ষ্যটি লাভ করতে হবে সেটিও যেন নৈতিক মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার পরিপন্থী না হয়। তিনি মনে করেন, রাজনীতিকেরা এই সত্যটি অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ ক্ষমতা লোভী রাজনীতিকেরা কেবল ক্ষমতা লাভের জন্যই রাজনীতিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু রাজনীতিকে অর্থহীন বিষয়ের দ্বারা সঙ্কুচিত করা উচিত নয়। রাজনীতিকদের স্মরণে রাখতে হবে যে লক্ষ্যের ন্যায্যতাই লক্ষ্য লাভের পন্থাকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে। যদি রাজনীতিবিদরা এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে অনৈতিক কর্ম সম্পাদন সম্ভব হবে না। তাঁরা তখন কেবল ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন।

রায় সমসাময়িক বিশ্বের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সমাজ দর্শনের সেই মৌলিক নীতিগুলিকে পুনরায় বিচার করতে চেয়েছিলেন যে নীতিগুলিকে অনুসরণ করে ডান, বাম, রক্ষণশীল, উদারপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল বিপ্লবী ইত্যাদি বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠিত হয়। এই সকল মতবাদগুলির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে কারণ ক্ষমতা দখল মুখ্য বিষয়—এই সাধারণ পূর্বস্বীকৃতির ভিত্তিতে সমস্ত মতাদর্শ গড়ে ওঠে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য ঐ তত্ত্বগুলি বিভিন্ন উপায়ের কথা বলে। ফলে সেই দিক থেকে বৈসাদৃশ্য আছে। কিন্তু রায় ক্ষমতা দখলকে রাজনৈতিক তত্ত্বের অপরিহার্য শর্ত বলে অস্বীকার করে ব্যক্তির স্বাধীনতার সংরক্ষণকে লক্ষ্য রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন যে লক্ষ্যের সঙ্গেই উপায়কেও শুদ্ধ, নৈতিক হতে হবে কারণ সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে শুরু করে সমাজতন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যও ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়নি যেহেতু প্রচলিত রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি বাস্তব

অনুশীলনের সময় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকেই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে নির্ধারণ করে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে।

স্বাধীন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে রায় ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন। পূর্ববর্তী রাজনৈতিক তত্ত্বগুলিতে ব্যক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁরা ব্যক্তিকে নৈতিক সত্তা বলে গণ্য করেননি। একই সঙ্গে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রায়ের মতে, নৈতিকতা হল বিবেকের নির্দেশ যা শুধুমাত্র ব্যক্তির পক্ষেই অনুশীলন করা সম্ভব। নৈতিক ব্যক্তি ব্যতীত নৈতিক সমাজ হতে পারে না। তাই নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক শর্ত ব্যক্তির নৈতিক সামর্থ্যের অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কিন্তু তৎকালীন চিন্তাবিদেরা বিষয়টিকে এভাবে বিচার করেননি। তাঁরা মানব ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। যেমন, উদারপন্থীরা মনে করতেন আইন প্রণয়নের দ্বারা ভালো জীবন যাপন সম্ভব। উদারপন্থীদের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক (socialist) এবং কমিউনিস্টরাও নিয়ম অনুসরণের উপর গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে মানব উন্নয়নের শর্ত বলে গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এক সর্বগ্রাসী একনায়কতান্ত্রিক ধারা স্পষ্ট হয়। সেই সঙ্গে সমাজ দর্শনের মূল উপাদান রূপে সমষ্টিবাদী মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয় যা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সমষ্টি মঙ্গলের স্বার্থে উপেক্ষা করে। কিন্তু রায়ের মতে, ঐ মতবাদগুলিতে ব্যক্তিকে সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন করা অসম্ভব ছিল না। কেননা উদারনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তিই ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কিন্তু উদারনীতিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বাস্তবে এক বিমূর্ত ধারণায় এবং ব্যক্তিকে কল্পিত আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা করে। থমাস গ্রীন হিল, বার্নার্ড বোসাঙ্কে, সিডনি ওয়েব প্রমুখ উদারনীতিবাদী চিন্তাবিদের নিকট রাষ্ট্র ও তার নাগরিকেরা

ঐক্যবদ্ধ সমাজব্যবস্থার একটি নৈতিক বা জৈব অংশ মাত্র। বিশেষ করে সমাজ হল এমন এক ঐক্য যেখানে সরকার এবং সফল নাগরিকরা দরিদ্রদের সামাজিক, নৈতিক এবং বস্তুগত জীবনের উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হতে পারেন। এটি কোনও নিয়ন্ত্রণ নয়। রাষ্ট্র কর্তৃত্বমূলক বিবেচনাপ্রসূত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক বিবর্তনের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যক্ষভাবে একটি 'ভাল সমাজ' গঠন করতে পারে। রায়ের মতে, এমন নিয়ন্ত্রণের ফলেও ব্যক্তির স্বাধীনতার হানি হয়। কারণ উদারনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতার অনুমোদন বিষয়ে অতিপ্রাকৃতিক সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় নৈতিকতা সম্পর্কে ধারণাটি ইউরোপে খ্রিষ্ট্রধর্মের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেখানে আত্মার উপস্থিতির কারণে ব্যক্তিকে একটি নৈতিক সত্তা রূপে গণ্য করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুসারে আত্মা ঈশ্বরের অংশ রূপে দৈব শক্তির স্ফূলিঙ্গ মাত্র (spark of Divine light)। এই ব্যাখ্যা ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সমাজ সংগঠনগুলিকে বাতিল করলেও সর্বতোভাবে মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষের নৈতিক সামর্থ্যকে ধর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করলে তার সার্বভৌমত্ব সীমিত হয়ে যায়, যা মুক্তির (স্বাধীনতার) ধারণার অস্বীকৃতি বলে রায় মনে করেন। কেননা এই ব্যাখ্যা অনুসারে মানুষকে তার মানবীয় সত্তার কারণে নৈতিক বলে গণ্য করা হয় না, তাকে নৈতিক হতে হলে কোনও না কোনও অতিমানবীয় শক্তির অধীনতা স্বীকার করতে হয়। রায় তাই বলেন, আধ্যাত্মিক শক্তির অধীনতা স্বীকার করলে মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে পারে না। তিনি বলেছেন, আধুনিক সভ্যতার পূর্ববর্তী পর্যায়ে আধ্যাত্মিক অধীনতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের মাধ্যমে উদারনীতিবাদের জন্ম হয়েছিল। যা অষ্টাদশ শতকে সর্ব্বোচ্চ শিখরে এসে বুদ্ধিদীপ্ত আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব এই উদারনীতিবাদের বিরোধিতা করে এক মানবতাবাদী মনোভাব গড়ে তোলে। এই নৈতিক অতিন্দ্রিয়বাদী

দর্শনের বিপরীতে উনিশ শতকের প্রথম দিকে উদারসমাজ সংস্কারক এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ নৈতিকতার উপযোগবাদী নীতি প্রচার করেন। কিন্তু নৈতিকতার উপযোগবাদী নীতিও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। কারণ রায় বলেন, আগের নৈতিকতার মূল্যগুলি ছিল অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষার বাইরে আধিভৌতিক ধারণা। কিন্তু পরে অর্থাৎ উপযোগবাদী নৈতিকতায় মূল্য বিষয়গত মানকে (objective standard) বঞ্চিত করে বিষয়ীগত হয়ে পড়ে। কারণ তা ব্যক্তি সুখকে নিশ্চিত করে। তাছাড়া উপযোগবাদী নীতিটির যেহেতু সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক উপযোগিতাই লক্ষ্য তাই কোন পরিস্থিতিতে কোনটি উপযোগিতা বলে বিবেচিত হবে তা পরিস্থিতি নির্ভর। এমন পরিস্থিতি নির্ভর নৈতিক আদর্শকে রায় নৈতিকতার অভাব বলে বিবেচনা করেছেন। রায়ের কথায় “It is the former, moral values were metaphysical concepts beyond the test of human experience, the latter deprived them of any objective standard, and that amounted to a negation of morality”[৩৬] রায়ের কাছে নৈতিকতার মানদণ্ড হল যুক্তি এবং মানবিক মূল্যবোধ। তিনি নৈতিকতাকে একটি প্রক্রিয়া রূপে দেখেছেন যা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই কল্যাণ নিশ্চিত করে। অর্থাৎ নৈতিকতার মানদণ্ড হল মানবিক কল্যাণ। নৈতিকতা এমন কর্ম পালনের নির্দেশ দেবে যা মানুষের স্বাধীনতা এবং সমাজের সমগ্র উন্নতির সহায়ক হয়। রায় বলেন, নৈতিক সিদ্ধান্ত যুক্তির আলোকে গ্রহণ করা উচিত, যাতে তা জাগতিক ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। তাই নৈতিকতার মানদণ্ড হিসাবে তিনি যুক্তিবাদকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন সামাজিক দায়িত্ব পালনকে। তাঁর মতে, “নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল

---

[৩৬] Roy, M.N., *Reason, Romanticism and Revolutions*, p. 453

মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা ও যুক্তিবাদী চেতনা।”[৩৭] আবার তিনি মানবিক মূল্যবোধ বলতে এমন কতকগুলি নীতি ও গুণাবলীকে বোঝেন যা মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা, এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং সামাজিক প্রগতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, স্বাধীনতা, সমতা, সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার বিকাশ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, কল্যাণবোধ প্রভৃতি গুরুত্ব লাভ করে।

সমষ্টিবাদী মতবাদে নৈতিকতা সম্পর্কে বলা হয় স্বাধীন হতে হলে ব্যক্তিকে অবশ্যই সমষ্টির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নৈতিকতা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণে নয়, সমগ্র সমাজের মঙ্গলে নিহিত আছে। কিন্তু রায় সমষ্টি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জনকে আত্মবিনাশের মধ্যে স্বাধীনতার অন্বেষণ বলে মনে করেছেন। ঊনবিংশ শতকের রাজনৈতিক মতাদর্শগুলিতে আদর্শ ও প্রয়োজনের মধ্যে এমন দ্বিচারিতা লক্ষ্য করেই মার্কসবাদের জন্ম হয়। কারণ এক শ্রেণীর ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের জন্য ক্ষমতাহীন ব্যক্তিদের স্বাধীনতা সীমিত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আধুনিক মার্কসবাদের প্রসারে সামাজিক সংকট তীব্রতর হয়। রায় মনে করেন, সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিস্টদের স্বাধীনতার ধারণাটি ছিল প্রতারণামূলক। রায় মার্কসবাদের স্বাধীনতার ধারণাকে ‘প্রতারনামূলক’ বলছেন কারণ মার্কসীয়তত্ত্ব পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যে আস্থা রাখে। সেখানে উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শক্তিগুলির কার্যকারণে ইতিহাসের পরিবর্তন হয় বলে মনে করা হয়। ইতিহাসের এমন অমোঘ নিয়মকে মেনে নিতেই হয়, এবং তা মেনে নিতে পারলে মানুষ মুক্ত। অর্থাৎ যখন মানুষের প্রত্যয় জন্মায় যে তার কোনও স্বাধীনতা নেই, উৎপাদনের কিছু রহস্যময় শক্তির কাছে সে পদানত, তখনই মানুষ যথার্থ স্বাধীন। তাই রায়ের কাছে মার্কসীয় স্বাধীনতার অর্থ হল মানুষের

---

[৩৭] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নব মানবতাবাদ*, পৃ ৭৫

দাসত্ব। স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করে যারা তাদের সমাজ স্বাধীন হতে পারে না। সেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব কাল্পনিক, প্রচারধর্মী এবং সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়। রায় বলেন, সমাজতন্ত্র স্বীকৃত হওয়ার ফলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হয়। ব্যক্তির পরিবর্তে এক কাল্পনিক যূথসত্তা, জাতি অথবা শ্রেণীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। যে যূথসত্তাই ব্যক্তির পরিবর্তে সার্বভৌম কর্তৃত্বের আধার। এই যূথসত্তার প্রয়োজনে আত্মবলিদানই ব্যক্তির একমাত্র সার্থকতা বলে স্বীকৃত হয়।

রায় মনে করেন, সমষ্টির মঙ্গলে ব্যক্তি-স্বার্থকে অবহেলা করার মনোভাব সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলার আগেই নৈতিক দর্শনকে একটি সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম মানুষকে তার নিজের ওপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষ নিজে থেকে নৈতিক হতে পারে। প্রচলিত মতবাদগুলিতে বলা হয় মানুষ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক ভাবে নৈতিক আচরণ করে। সেখানে মানুষ অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধীন অথবা সামাজিক নিয়মের অধীনে থেকে নৈতিক আচরণ করে। কিন্তু রায় নৈতিকতার উৎস সম্পর্কে এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মানুষের নৈতিক সামর্থ্যকে প্রমাণ করতে হবে মানুষের প্রকৃতি এবং জগতে তার অবস্থান সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে। এমন নীতির স্বীকৃতিতে অষ্টাদশ শতকে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিবাদের উত্থান, যার অভিমুখ ছিল মানবতাকেন্দ্রিক। এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে খণ্ডন করে জড় জগত থেকেই মানুষের উৎপত্তির সন্ধান দেয়। এখানে বলা হয় প্রকৃতির নিয়ম শাসিত মহাবিশ্বের পটভূমিতেই মানব জীবনের অস্তিত্ব। তাই সে যুক্তিবাদী সত্তা। মানুষ তার অস্তিত্বকে বজায় রাখার সংগ্রামের সুবিধার্থে, তার নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। অতি প্রাচীন কালে, প্রোটাগোরাসের সময় থেকে মানুষকে একটি নৈতিক সত্তা বলে গণ্য করা হলেও পরবর্তীকালে ব্যবহারিক জীবনে সেই

বিশ্বাসকে বজায় রাখা যায়নি। তাই সেই বিশ্বাসকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের নৈতিক সামর্থ্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের যুক্তি প্রদানের ক্ষমতার উল্লেখ করতে হবে। মানুষ নৈতিক কারণ মানুষ যুক্তিবাদী। মহাবিশ্ব হল এক নৈতিক শৃঙ্খল (moral order) যা নিজের অন্তর্নিহিত নীতি দ্বারা পরিচালিত। মানুষ সেই পটভূমিতে বেড়ে ওঠে বলেই মানুষ যুক্তিবাদী। রায়ের মতে, নৈতিকতার এমন ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী ব্যবস্থা যৌক্তিকভাবে বস্তুবাদী দর্শনের যান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে অনুমিত হওয়ার ফলেই এমন বস্তুবাদী নীতিশাস্ত্র পাওয়া যায় যেখানে মানুষ কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তির পরিবর্তে তার নিজের ওপর আস্থা স্থাপন করে। তাই রায় নৈতিক দর্শনকে কোনও আধিভৌতিক এবং অতি সংবেদনশীল সত্তার অনুমোদন ব্যতীত গঠন করতে চেয়েছিলেন। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি যান্ত্রিক বিশ্বতত্ত্ব—যা ভিন্ন এই মত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই রায় সর্বতোভাবে বস্তুবাদের সমর্থনে কথা বলেছিলেন। তিনি এমন এক স্বয়ং সম্পূর্ণ দর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন যা যান্ত্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ হয়ে এমন এক ধর্মনিরপেক্ষ নীতিশাস্ত্রে শেষ হবে যে নীতিশাস্ত্র হবে বিবর্তনের পরিণতি। এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শনই একমাত্র বর্তমান সমাজ সংকটের মোকাবিলায় উপযোগী হবে বলে রায় মনে করেন। এই দর্শন মানুষের অস্তিত্বের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করে তার ইচ্ছা, আবেগ সহ তার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবে। মানুষের প্রবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টি, ইচ্ছা, যুক্তিকে ভৌতজগতের প্রেক্ষিতে তাত্ত্বিকভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধির সীমার মধ্যে অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। তবেই কেবল সেই দর্শন হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রায় এই নতুন দর্শনকে মানবতাবাদী দর্শন নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এই মানবতাবাদ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের মানবতাবাদী দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু কেন? খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যদি রায়ের মানবতাবাদ তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক প্রত্যয়

থেকে পৃথক হয় তাহলে তিনি কেন মানবতাবাদীতত্ত্ব প্রচার করছেন বলে দাবী করেছেন? তিনি তাঁর তত্ত্বকে অন্যদের থেকে পৃথক করার জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা না করার ফলে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এই বিভ্রান্তির আশঙ্কা রায় আগেই করেছিলেন। তাই তিনি বলছেন "কোনও কোনও শব্দ ও বাকভঙ্গী সচরাচর বিশেষ ধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে। আর যখন নতুন ধারণার উপযুক্ত নতুন শব্দ ও নতুন প্রতীকের অভাবে আমরা পুরাতন শব্দ ব্যবহার করি তখন বিভ্রান্তি সৃষ্টি স্বাভাবিক। অন্তত সাময়িকভাবে শব্দ ব্যবহারে এই বিভ্রান্তির ফলে চিন্তার স্বচ্ছতাও ব্যহত হয় স্বাভাবিক ভাবেই।"[৩৮] এই সমস্যা দূর করতেই এবং অতীত দর্শনের সঙ্গে পার্থক্য করতে তিনি এক নতুন অভিধা ব্যবহার করেছিলেন। তবে পূর্ববর্তী মতবাদের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও এই নতুন মতটির পূর্ববর্তী মতবাদের সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। তাই তিনি নতুন দর্শনকে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ বলেন যা পূর্ণতর মানবতাবাদ অথবা মৌল মানবতাবাদ কিংবা নব মানবতাবাদ নামে অভিহিত।

মানবতাবাদী তত্ত্বের আলোকে সমাজ দর্শনের মূল সমস্যার সমাধান:

রায় বলেন, মানবতাবাদী দর্শনের মূল কথা "মানুষই সব কিছুর মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড"। মানুষকে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার কারণে সমসাময়িক কালের মানবতাবাদী সমাজ দর্শনে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাটি হল ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয়ের সমস্যা। সমাজ বহু মানুষের মিলিত সংগঠন যা গঠিত হয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। সেখানে ব্যক্তি সব কিছুর নির্ধারক হলে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কীরূপ হবে? সমাজের অবস্থানই বা কি হবে? আবার ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক

---

[৩৮] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নব মানবতাবাদ*, পৃ ২৬

বিরোধের সমস্যা দেখা দেওয়াও স্বাভাবিক। তাই তিনি সমাজ দর্শনের শুরুতেই এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের পৃথক অস্তিত্ব নেই। কেননা সমাজ ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট। ব্যক্তি আর্বিভাবের পূর্বে সমাজ সৃষ্টি হয়নি। পৃথিবীতে মানুষের আর্বিভাব হয় ব্যক্তিরূপে। ব্যক্তি সমবেত জীবন সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সমাজের সৃষ্টি করে। তাই বলা যায়, ব্যক্তির সুবিধা ও স্বাধীন বিকাশের স্বার্থে সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং সমাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সমূহের বিকাশে সহায়তা করা। তাই রায় বলেন, "সমাজ জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণই সকল রাজনৈতিক ভাবনা, সমাজ দর্শন ও রাজনৈতিক আচরণের লক্ষ্য হওয়া উচিত।"[৩৯]

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিচারে একটি ভিন্ন সমস্যা আছে। আমরা জানি সমাজ ও রাষ্ট্র এক নয়। তারা সমসীমা বিশিষ্টও নয়। তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হবে কীভাবে? রায় তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বলেন রাষ্ট্রকে সমাজের রাজনৈতিক জীবনের প্রকাশ হিসাবে গণ্য করলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপ্তি সমসীমাবিশিষ্ট হতে পারে। আর রাষ্ট্র ও সমাজ সমসীমাবিশিষ্ট হলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানের জন্য রায় বিশেষ আদর্শের কথা বলেন। তাঁর কাছে ঐ সমস্যা সমাধানের বিশেষ আদর্শ হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তিনি বলেন, গণতন্ত্র অনেকদিন থেকেই আদর্শ রূপে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা সঠিকভাবে রূপায়িত হয়নি। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সেটাই দেখা যায়। তাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন ওঠে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপায়ণ কি আদৌ সম্ভব? বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের যে অবস্থা আমরা লক্ষ্য করছি তা থেকেই এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। রায় বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্র ও সমাজ যে পরিমাণে সমসীমা বিশিষ্ট

[৩৯] রায়, মনবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ২৮

হবে সেই পরিমাণেই গণতন্ত্রের বাস্তব রূপয়ণ সম্ভব হবে। রাষ্ট্র সমাজের সব অংশ জুড়ে ব্যাপ্ত না হলে রাষ্ট্রযন্ত্র সমাজের একাংশের হাতে ক্ষমতা প্রয়োগের অস্ত্র হয়ে ওঠে। আর ক্ষমতা সমাজের কোনও একটি অংশ কুক্ষিগত করে রাখলে সেই ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা যায় না; তা অধিকাংশের ওপর বলপ্রয়োগের উপায়ে পরিণত হয়। সেজন্য রাষ্ট্র ও সমাজ সমসীমা বিশিষ্ট হওয়ার জন্য ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা তথা ক্ষমতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। সমাজে ব্যক্তি যে স্বাধীনতা ও ক্ষমতার অধিকারী হয় সেই ক্ষমতা ও স্বাধীনতার অধিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। হয় না বলেই আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমসীমা বিশিষ্ট ভাবতে পারি না। তাই রায় বলেন, যে কোনও রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনে রাষ্ট্র শক্তি যেন সমাজের কোনও এক অংশে সীমাবদ্ধ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পূর্ণ সমাজের ব্যাপার হলেই কেবল রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পর ব্যাপী হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তির ক্রমাগত অবমূল্যায়ন ঘটেছে। ধর্মীয় শাসন, রাজতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং আধুনিক একনায়কতন্ত্রেও ব্যক্তির ক্রমশ অবমূল্যায়ন ঘটেছে। কিন্তু উনিশ শতকে ব্যক্তি মানুষের বিজয়ের কিছু আশা দুটি ব্যবস্থার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। সেই ব্যবস্থা দুটি হল—রাজনীতির ক্ষেত্রে সংসদীয় ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতি (Laissez faire[৪০])। কিন্তু এই তত্ত্বদুটিতেই কিছু সমস্যা নিহিত থাকায় তার প্রয়োগে আশানুরূপ ফল হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যক্তির

[৪০] A doctrine opposing governmental interference in economic affairs beyond the minimum necessary for the maintenance of peace and property rights. And A philosophy or practice charecterized by a usually deliberate abstention from direction or interference especially with individual freedom of choice and action (according to Webster dictionary)
*The French phrase *laissez faire* means “allow to do” with the idea being “let people do as they choose”.

সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত হলেও সেখানে বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির অধিকার ভোগ ব্যতীত সার্বভৌমত্বের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেনি। সার্বভৌমত্ব কেবল আইনগত ধারণায় পর্যবসিত হয়। কারণ ব্যক্তির ভোটদানের অধিকার থাকলেও সরকার নির্বাচিত হওয়ার পরে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার কেবল মুষ্টিমেয় জনপ্রতিনিধির কুক্ষিগত হয়। ফলে ব্যক্তি শুধু ক্ষমতাহীন নয়, মর্যাদাহীনও হয়ে পড়ে কারণ যেকোনও নীতি প্রণয়নকেই তাকে স্বীকার করে নিতে হয়। অন্যদিকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে অল্প কিছু মানুষ সমাজের বিশাল অংশকে শোষণ করার সুযোগ পায়। এই মতবাদের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ঘটে উদারপন্থায়[৪১] (উদারনৈতিক মতবাদ)। উদারনৈতিক মতবাদের মূল কথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিনা ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠা করা। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নেতিবাচক অর্থে অর্থাৎ কোনও বাধা ছাড়াই কাজ করার স্বাধীনতা বলে গ্রহণ করা হয়। যার ফলে অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রায় মনে করেন, পরবর্তী সময়ে অবাধ বাণিজ্য নীতির ব্যর্থতার ফলে নতুন সংকট (বুর্জোয়া অর্থনীতি) উপস্থিত হলে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করায় সেই মতবাদও ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। রায়ের কথায়, 'ব্যক্তির সহজাত স্বাধীনতার স্পৃহা পূরণের ব্যবস্থারূপে সমাজের উদ্ভব হলে এবং ব্যক্তি মানুষেরই অগ্রগতির উপায় বলে সমাজকে গণ্য করা হলে সমাজতন্ত্রকে অথবা যে কোনও ধরনের সমষ্টিবাদকেই মানুষের উর্দ্ধতনের বিরোধী বলে গণ্য করতে হয়।'[৪২] কিন্তু উনিশ শতকে উদারপন্থী সমাজচিন্তাকে অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রের ধারণা বেশীরভাগ মানুষের কাছে

---

[৪১] এখানে ক্লাসিক্যাল উদার পন্থার কথা বলা হয়েছে। যার মূল প্রবক্তা ছিলেন জন লক, অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ।

[৪২] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ,* পৃ ২৯

স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। ‘মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি’ এমন কথা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এভাবেই ব্যক্তির অবমূল্যায়ন সম্পূর্ণ হল। ব্যক্তির পরিবর্তে এক কাল্পনিক সমষ্টি সত্তা, জাতি অথবা শ্রেণীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। যে সমষ্টি সত্তা ব্যক্তির পরিবর্তে সার্বভৌম কর্তৃত্বের আধার রূপে স্বীকৃত হল। এই সমষ্টি সত্তায় আত্মবলিদান ব্যক্তির একমাত্র সার্থকতা বলে স্বীকৃত হল।

রায়ের মতে, সমাজতন্ত্র দীর্ঘকাল উদারনৈতিকতাবাদের ঐতিহ্যানুসারী ছিল। কেননা প্রথমদিকে উদারনীতিবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। সেই ধারণায় সামাজিক অসাম্য এবং সম্পদ বন্টনের বৈষম্য প্রকট হয়। ঠিক তেমনি সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক শোষণ এবং শ্রেণীভিত্তিক অসমতার অবসান ঘটাতে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প রূপে একনায়কত্বের ধারণা গ্রহণ করে। সমাজতন্ত্রের অনুগামীদের একাংশ এই নতুন (একনায়কতান্ত্রিক) ধারণা গ্রহণের পরেই সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। সেই শক্তিবৃদ্ধির ফলে অবশেষে একটি দেশে (রাশিয়া) সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ মনে করেছিলেন যে অবশেষে পৃথিবী নির্বিচার ও উদারতন্ত্রের সঙ্কট অতিক্রম করে প্রগতির এক নতুন অধ্যায়ে এসেছে। কিন্তু সেখানে সংসদীয় ধারণা বর্জনের ফলে পুনরায় বহু একনায়কতন্ত্রিক ধারণার প্রচলন হল। যার কারণেই রুশ বিপ্লবের প্রথম প্রতিক্রিয়া রূপে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে বলে রায় মনে করেছিলেন। রায়ের মতে, ফ্যাসিবাদ মূলত পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকটের প্রতিক্রিয়া। অর্থনৈতিক মন্দা, শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের অধিপত্য বজায় রাখতে ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করে। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই একটি রূপ, যা গণতন্ত্রকে বাতিল করে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ফলে প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিক্রিয়া রূপে উদ্ভূত ধারণার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মানুষ প্রচলিত রাজনৈতিক চিন্তায়

আস্থা হারিয়ে দুটি একনায়কতন্ত্রের মধ্যে কোনও একটিকে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়। রায়ের মতে সমস্যা হল এই বিকল্প দুটির কোনও একটি স্বীকার করলে প্লেটোর সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র রাজনৈতিক বিবর্তনকে ভ্রান্ত বলে মনে করতে হয়। বলতে হয় ব্যক্তি কল্পনা মাত্র, বাস্তবিক নয় এবং প্রশ্নাতীত অস্তিত্ব হিসাবে সমাজ স্বীকার্য। তখন ধরে নিতে হয় যে সমাজ এক অবয়বহীন সমষ্টি মাত্র, সেই সমষ্টি সত্তার স্বার্থে ব্যক্তির আত্মবলিদান স্বাভাবিক। রায় বলেন, এমন ধারণাও আধুনিক ভৌত বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার সাহায্যে সমর্থন করা হয়েছিল। সেখানে এক সময় পরমাণু অবিভাজ্য বলে দাবী করা হলেও বর্তমানে সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কারণ পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন তড়িৎ কণায় বিভাজ্যমান। ভৌত বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার বস্তুবাদের দীর্ঘকালীন বিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছে। কারণ বস্তুবাদের মূল যে দাবী বস্তু বা জড়ই জগতের মূল তা আর বলা যাচ্ছে না। বস্তুবাদ জগতের যে অদ্বৈতবাদী ধারণাকে স্বীকার করে তা হল জড়ই চরম সত্য; জড় পরমাণুই যাবতীয় বস্তুর উৎস। কিন্তু পরমাণু যখন বিভিন্ন তড়িৎ কণায় বিভাজ্য হল তখন আর সেই দাবী করা সম্ভব হল না। ফলে ভৌত জগতের পূর্বতন প্রচলিত ধারণার সঙ্গে নতুন আবিষ্কারের বিরোধ দেখা দিল। কেননা বস্তু বা জড়ের (পরমাণু) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকছে না এবং পরমাণু থেকে সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হচ্ছে না। পরমাণুর অস্তিত্ব নির্ভর করছে নিয়ত প্রবাহমান তরঙ্গমালার উপর। এই নিয়ত কম্পমান পদার্থ পরমাণু এককের মধ্যে ধরা দিলেই ভৌত জগতের বিবর্তন হয়। সুতরাং এককের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আছে কেবল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন নামক অবয়বহীন পিণ্ডমাত্র। অনুরূপভাবে সমাজেও ব্যক্তির গুরুত্ব নেই। কেননা সেখানে ব্যক্তির পৃথক কোনও স্বীকৃতি নেই। তার স্বীকৃতি রয়েছে সমষ্টির মধ্যে। এবং সমষ্টিভিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে যেহেতু সমাজ একটি যৌথ সত্তা সেহেতু

সব সামাজিক প্রচেষ্টা যৌথ প্রচেষ্টা। কিন্তু রায় মনে করেন, এইভাবে ব্যক্তিকে সমষ্টির স্বার্থে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সহযোগিতায় লিপ্ত ব্যক্তিই যৌথ সত্তার পূর্বশর্ত। ব্যক্তিই যদি না থাকে তাহলে এই সহযোগিতার সম্বন্ধও থাকতে পারে না। আসলে সহযোগিতার জন্য প্রয়োজন সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি। সেই ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কোনও সমষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজ জীবনে ব্যক্তির অস্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা এবং বিমূর্ততাকে প্রশ্রয় দেওয়া। তাই রায় বলেন, প্রকৃত বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করে কোনও সামাজিক তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তি মানুষকে তাই সমষ্টিবাদের কাল্পনিক ও বিমূর্ত ধারণায় পরিণত করলে চলবে না। স্মরণে রাখতে হবে প্রতিটি পৃথক নরনারীর সমাহারেই সমাজ। সেই কারণে সামাজিক উন্নতি, সামাজিক অগ্রগতির অর্থ প্রতিটি নর নারীর উন্নতি ও অগ্রগতির সমষ্টি। তাই তিনি মনে করেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় এই মৌলিক সুত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যার দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নতিই লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। কারণ সমাজের উন্নতি যেমন ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন সম্ভব নয়, তেমনি ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব হবে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থাতেই।

সমষ্টিবাদী ধারণায় ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে নীতিবিচার এক ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে উপায় এবং উদ্দেশ্যর সম্পর্ক বিচারে ভ্রান্তি ঘটতে পারে। সমষ্টিবাদী ভাবনায় উদ্দেশ্যকে উপায়ের পরিণতি রূপে দেখার সঙ্গেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেকোনও উপায় অবলম্বন করার কথা বলে। রায় বিষয়টিকে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, বিগত শত বৎসরে অধিক সংখ্যায় মানুষ বিশ্বাস করছে যে স্বাধীনতা ও অগ্রগতির স্বার্থে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা ও অগ্রগতি হল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য

লাভের উপায় হল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ উপায় থেকে লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, যদিও সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ কখনোই লক্ষ্য ছিল না। অনেকে মনে করেছিল সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদী অবস্থায় স্বাধীনতা ও সুখের মাত্রা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এখানে লক্ষ্য ও উপায় পৃথক হলেও উপায় ক্রমশ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। স্পষ্টত বেশীরভাগ মার্কসবাদীরা এই ভ্রান্তির স্বীকার। রায় তাই স্পষ্টত বলছেন, "সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয় তা আসলে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র।"[৪৩] রায় মনে করেন, মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা নয়। এগুলির থেকে বৃহৎ একটি উদ্দেশ্য মানুষের আছে। তাই মানুষের উদ্দেশ্য শুধু জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, অথবা সামাজিক পুনর্বির্ন্যাস, কিংবা ধনতন্ত্রের পরিবর্তে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুবা অবাধ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির পরিবর্তে পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা বলে গণ্য করা হলে তা অংশত সত্য। কিন্তু এগুলি কখনও চরম সত্য নয়। রায় বলেন, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি প্রত্যেক মানুষের কাম্য হলেও তা মানুষের চরম লক্ষ্য নয়। এগুলি প্রকৃতপক্ষে অধিকতর মূল্যবান উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র; এবং সেই অধিকতর মূল্যবান বস্তু হল স্বাধীনতা। তাই তিনি স্বাধীনতাকে সব মানবিক প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য বলেছিলেন। এই প্রকৃত লক্ষ্য পূরণের জন্য ঐ উপায়গুলি অবলম্বনের প্রয়োজন হলেও ঐ উপায়গুলি লক্ষ্য বলে গণ্য হলে মানুষ নীতিভ্রষ্ট হয়।

রায় বলেন, সভ্যতার সূচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় স্বাধীনতার অনন্ত সন্ধানই মানুষের জীবনের মৌলিকতম প্রবণতা। মানবপূর্ব জৈব বিবর্তনের স্তরে এই

---

[৪৩] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ৩২

প্রবণতা প্রকাশিত হয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে। একসময় প্রাকৃতিক শক্তির আক্রমণের কাছে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন ছিল বলেই মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে সংশয়ী ছিল। সেজন্য বিভিন্ন বিপদ থেকে তারা আত্মরক্ষা করে নিজ অস্তিত্ব রক্ষাতেই সচেষ্ট ছিল। অন্যভাবে বললে, প্রাকৃতিক পরিবেশের নিরঙ্কুশ প্রভাব থেকে মুক্তিই ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত। সেজন্য রায় সামাজিক সংগ্রামকে অর্থাৎ সামাজিক বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে মানুষের অগ্রগতির পথে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের উন্নত রূপ বলে গণ্য করেছিলেন। সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্য সংগ্রামের সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনও ভূমিকা ছিল না। সেখানে মুখ্য ভূমিকা ছিল বুদ্ধির, নির্বাচনের শক্তি ও যুক্তি। অস্তিত্ব রক্ষার জৈবিক জীবন সংগ্রামই সমাজ বিবর্তনে বুদ্ধি ও আবেগের উচ্চস্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্খায় রূপান্তরিত হয়। তাই স্বাধীনতা অর্জনই যখন যাবতীয় মানবিক আচরণের লক্ষ্য তখন বলাই যায় যে মানুষের ইতিহাস এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী। সেজন্য রায় মনে করেন, “মানুষের ইতিহাস অর্থহীন ঘটনাবলীর অসঙ্গত পরম্পরামাত্র নয়।”[৪৪] আবার কোনও অর্থযুক্ত ঘটনার পরম্পরাকে ইতিহাস বলা যায় না। রায় ইতিহাস বলতে মানব অগ্রগতির ইতিহাসের কথা বলতে চেয়েছেন। যেখানে পরিবর্তন ও অগ্রগতির নির্দিষ্ট পার্থক্য আছে। তিনি যে কোনও পরিবর্তনকে অগ্রগতি মনে করেননি। তাঁর নিকট পরিবর্তনের পরম্পরা প্রগতিরূপে চিহ্নিত হবে তখনই যখন প্রতিটি স্তরেই মানুষের গতি বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী হবে। সেজন্য আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও অগ্রগতির মানদণ্ড সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন যার দ্বারা এই পরিবর্তনের প্রকৃতি বিচার সম্ভব হবে। তিনি বলেন, মানুষের মৌলিকতম প্রবণতা হল স্বাধীনতা এবং তাকে আদর্শ বলে গ্রহণের

---

[৪৪] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ*, পৃ ৩৩

মাধ্যমে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব উন্নতি অথবা অগ্রগতি লাভ করা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনা সমূহের বিকাশের পথে যা কিছু বাধা সেগুলিকে যথাসম্ভব দূর করাই হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে এইরূপে স্বীকার করলে তা বিমূর্ত ধারণা মাত্র থাকে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সে ধারণার নিয়ত প্রতিফলন সম্ভব হয়। সেই জন্য মৌল মানবতাবাদের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সম্ভাবনার বিকাশ, বাস্তব জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ। রায়ের মতে, এগুলিই সকল সমাজ দর্শন ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মূল্য বিচারের মানদণ্ড হওয়া উচিত। তা না হলে বিবর্তন অথবা অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই দর্শন মূল্যহীন হয়ে যায়।

রায়ের এই বক্তব্যের মধ্যে রাজনৈতিক অনুসিদ্ধান্ত আছে। কেননা সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার যুক্তি হিসাবে বলা হয় উক্ত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অল্প সংখ্যক অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে কুক্ষিগত থাকার ফলে জনগণ সার্বভৌম শক্তির আধার হয়েও প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের তত্ত্বগত ক্ষমতার বাস্তব ব্যবহার তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই মার্কসবাদীদের কাছে সংসদীয় ব্যবস্থা আসলে সংখ্যালঘু শ্রেণীর একনায়কত্ব। সেজন্য উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের কথা বলেন। রায়ের মতে, সংসদীয় একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কসবাদীদের শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলও সার্বজনীন ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে না। সেখানে একনায়কতন্ত্রের অন্য রূপ লক্ষ্য করা যায়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য এক সংখ্যাগুরু শ্রেণীর (শ্রমিক শ্রেণী) একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় যা কোনও ভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। যদিও এই সমালোচনার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীরা বলেছেন –"এই প্রস্তাবিত একনায়কত্ব নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার, শ্রেণী ব্যবস্থার অবসানের জন্য এই শ্রমিক শ্রেণী স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতাধীন। সুতরাং সমাজের বিরাট সংখ্যাগুরু দরিদ্র মানুষের ক্ষমতাধিকারকে যথার্থ

একনায়কতন্ত্র বলা যায় না। কেননা, শ্রেণী ব্যবস্থা শেষ হওয়ার সঙ্গেই একনায়কতন্ত্র শেষ হবে। রাষ্ট্র যন্ত্রের অবসান হবে।"[৪৫] কিন্তু রায়ের মতে, আপাত বিচারে এই যুক্তি আকর্ষণীয় হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় অসুবিধা ও স্ববিরোধিতা আছে। কারণ সেখানে এক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা থাকে। যে কোনও একনায়কতন্ত্রের পক্ষেই অথবা যে কোনও সরকারের পক্ষেই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা ক্ষমতা অধিকারের পরবর্তী অবস্থা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। যদিও সমাজতন্ত্রে বলা হয় সম্পদশালী ও সম্পদহীনের শ্রেণীবিভাগ দূর হয়ে শেষ পর্যন্ত কোনও শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। এখনও পর্যন্ত এমন অবস্থা বাস্তবিক ভাবে সম্ভব হয়নি। তাই রায় বলেন, বাস্তব ঘটনা এমন নির্দিষ্ট সহজ সরল পথে অগ্রসর না হওয়ার জন্য যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রেণীব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে এমন মনে করার পরিণতি দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। সামাজিক বিবর্তন যদি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফল বলে গণ্য করা হয়, তবে দ্বন্দ্বহীন অবস্থায় বিবর্তন কীভাবে সম্ভব হবে? সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হলে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সক্রিয়তাও রুদ্ধ হওয়ায় সামাজিক বিবর্তনের গতিও স্তব্ধ হয়। সুতরাং দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তবে বলা যায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর মানব সমাজ আত্মঘাতী হয়। কারণ, সামাজিক অগ্রগতি স্তব্ধ হওয়ার অর্থ সামাজিক বিবর্তনের সুযোগ শেষ হওয়া। ফলে এমন এক অচলবস্থা তৈরী হয় যার অপর নাম মৃত্যু। সেজন্য রায় বলেন, সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ উদ্দেশ্য নয়। তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র। তাই সমাজতন্ত্র অথবা সাম্যবাদের মাধ্যমে স্বাধীনতার স্পৃহা পূরণ যদি সম্ভব না হয় তবে সেই পথ ত্যাগ করা উচিত। বাস্তবে কোনও কোনও

[৪৫] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *মানবতাবাদী পথ,* পৃ ৩৪

দেশে (রাশিয়া, চীন) শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ দ্বারা ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু সেখানেও শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও সেই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পুনর্বিন্যাস। কিন্তু রায় বলেন, সত্যিই সমাজের পূনর্বিন্যাস সম্ভব হয়েছে কিনা তা যুক্তিসহ বিচার করে দেখতে হলে ওই দুটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটিকে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে ভালো বা খারাপ বলতে হয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ কোন ব্যবস্থায় ব্যক্তি অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে সেটাই বিচার্য। কোন ব্যবস্থায় মানুষের অন্তনির্হিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশের পথে বাধা আগের থেকে কম ছিল সেটিকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এই মানদণ্ডকে ব্যবহার করার মাধ্যমে কোনটি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা তা বিচার করা যায়।

রায় মনে করেন, সামাজিক জীবনের পূর্বশর্ত জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ জীবনের প্রাথমিক দাবী পূরণে ব্যর্থ। তাই যথাযথ ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তির জৈবিক অস্তিত্ব সুনিশ্চিত না করে তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশের চিন্তা অর্থহীন। কিন্তু রায়ের মতে, কেবলমাত্র সাম্যবাদী অর্থনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেননা সেখানে একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা একথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। তাই তিনি বলেন, কাঙ্খিত আদর্শের বিচারে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য রাজনৈতিক গণতন্ত্রও প্রয়োজন। গণতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। যার ফলে সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্র সমব্যাপকতাবিশিষ্ট হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সমসীমাবিশিষ্ট হওয়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। কেননা রাষ্ট্র সমাজেরই রাজনৈতিক রূপ। একটি সমাজে মানুষ যে অধিকার তথা ক্ষমতা ভোগ করে সেই অধিকার তথা ক্ষমতা যদি রাষ্ট্রেও ভোগ করতে পারে তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র সমসীমাবিশিষ্ট হয়ে যাবে। তাই রায় মৌল মানবতাবাদী রাষ্ট্রে সংসদীয়

গণতন্ত্রের অসম্পূর্ণতা এবং যে কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠীর একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনাকে দূর করে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কারণ প্রকৃত গণতন্ত্র ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গড়ে তোলে। কিন্তু সেখানেও নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমন্বয় সাধন কীভাবে সম্ভব? বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে সেই সমন্বয় সাধন অসম্ভবই মনে হয়। তাই রায়ের মৌল মানবতাবাদী রাষ্ট্রে উক্ত সমস্যার সমাধান জরুরী।

রায় বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে শুধুমাত্র পরিকল্পনা যদি আবশ্যিক শর্ত হয়, অর্থাৎ পরিকল্পনা ব্যতিরেকে আধুনিক যুক্তিসঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে ‘সোনার কারাগার’ সৃষ্টি হয়। তাই তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য পরিকল্পনার সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার এবং স্বাধীনতা দু’য়ের সমান প্রয়োজন বলে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরী। স্থানীয় গণপঞ্চায়েতের উপর ভিত্তি করে এক পিরামিড আকারের রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। গণপঞ্চায়েতগুলির কাজ হবে জনসাধারণকে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করা, সুবিবেচনা ও সততার সঙ্গে সে অধিকার প্রয়োগ করার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করা। গণপঞ্চায়েতের এমন প্রশস্থ ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্র মিলে মিশে এক হয়ে যাবে। সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবার এবং প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনার অধিকার জনগণের ওপর থাকবে। এই গণপঞ্চায়েতগুলি রাষ্ট্রের উপর প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। রায়ের কথায়,

> ...government only when a pyramidal structure of the State will be raised on a foundation of organized local democracies. The primary function of these latter will be to make individual citizens fully conscious of their sovereign right and enable them to exercise the right intelligently and conscientiously. The broad basis of the democratic State, coinciding with the entire society, will be composed of a network of political schools, so to say. The right of recall and referendum will enable organized local democracies to wield a direct and effective control of the entire State machinery.[৪৬]

রায়ের "স্বাধীন ভারতের একটি সংবিধান খসড়া" নামক প্রবন্ধে মৌলিক মানবতাবাদী রাষ্ট্রের রূপরেখা বর্ণিত আছে। যেখানে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকবে। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থায় অর্থাৎ দেশের দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী অংশগ্রহণ করবে। তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে। কেন্দ্রীয় এবং সকল স্তরের শাসনে তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সেখানে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিধি যথাসম্ভব সীমিত থাকবে। এছাড়াও মৌলিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা আছে জনগণতান্ত্রিক (অর্থনৈতিক) পরিকল্পনার মধ্যে। সেখানে বলা হয়েছে, মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের অর্থনীতিকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে

[৪৬] Roy, M.N, *New Humanism*, p. 45

হবে যাতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জৈবিক প্রয়োজন পূরণের ওপর নির্ভর করে বুদ্ধি ও অন্যান্য সুকুমার মানবীয় বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মানের উপর প্রতিষ্ঠিত পুনর্গঠিত অর্থনীতি হবে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তি। রায়ের কথায়,

> Radicalism presupposes economic reorganization of society, so as to eliminate the possibility of exploitation of man by man. Progressive satisfaction of material necessities is the precondition for the individual members of society unfolding their intellectual and other finer human attributes. An economic reorganization such as will guarantee a progressively rising standard of living will be the foundation of the Radical Democratic State.[৪৭]

নতুন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি হবে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও প্রয়োজন অনুসারে বন্টন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার কোনও স্থান থাকবে না, কেননা সেখানে জনগণকে কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাই তিনি গণপঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করাকেই নতুন সমাজের রাষ্ট্রীয় ভিত্তি বলেছেন। বিভিন্ন গণ-সমিতির মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থা জ্ঞানের সার্বজনীন প্রচার এবং বৈজ্ঞানিক ও সকল সৃজনশীল কাজে উৎসাহ প্রদান করবে। নতুন এই সমাজ যুক্তি (reason) এবং

---

[৪৭] Roy, M.N, *New Humanism*, p. 47

জ্ঞানের (knowledge) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই তা আবশ্যকভাবেই পরিকল্পিত হবে। যার মূল উদ্দেশ্যই হবে ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে সমন্বিত পরিকল্পনা (planning)। তাঁর কথায়, “The new society will be democratic-politically, economically, as well as culturally. It will be a democracy capable of defending itself.”[৪৮] মৌলিক গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয় মুক্তবুদ্ধির নরনারীর সমবেত প্রচেষ্টায়। তারা জনসাধারণের ভাবী শাসকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হয়। স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমে তাদের আচরণ হয় যুক্তি ও নীতি সম্মত। জনসাধারণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যত বৃদ্ধি পাবে, তাদের প্রচেষ্টা ততই শক্তিশালী হবে। অবশেষে, আলোকপ্রাপ্ত জনমতের সমর্থনে ও জনগণের সক্রিয় ও সুবিবেচনাপূর্ণ সহযোগিতায় মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। যেহেতু ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে স্বাধীনতার আদর্শ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেহেতু মৌলিক মানবতাবাদীরা ক্ষমতা দখলে প্রয়াসী হবেন না। তাদের প্রধান কাজ হবে গণপঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংহতি বিধানে সাহায্য করা। রায় নবমানবতাবাদের উনিশতম সূত্রে বলেছেন, মুক্তিবুদ্ধি মানুষরা স্বাধীনতার ভিত্তিতে নতুন জগত গড়ে তোলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এক রাজনৈতিক পার্টিতে যুক্ত হয়ে সমবেতভাবে গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়িত করবে। পার্টির সভ্যরা জনগণের শাসকের ভূমিকা গ্রহণ না করে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নেবে। তারা স্বাধীনতা লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার কারণে পার্টির আচরণ হবে যুক্তিসম্মত অতএব নীতিসম্মত। জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্টি শক্তিশালী হবে। আলোকপ্রাপ্ত জনগণের সমর্থনে ও সুবিবেচনাপূর্ণ সহযোগিতায় পার্টি ক্ষমতা লাভ করবে। ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে পার্টি ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণকে আদর্শরূপে

[৪৮] Roy, M.N, *New Humanism*, p. 47

গ্রহণ করবে। পার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ঐ বিকেন্দ্রিকরণ প্রক্রিয়ার একটি স্তর মাত্র। পার্টির প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগ্রাহ্যতায় পার্টি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে আরোও ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে, যতক্ষন না রাষ্ট্র ও সমগ্র সমাজ একাকার হয়ে যায়।[৪৯] কালক্রমে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে মৌলিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হবে। তখনই রাষ্ট্র আর শোষণের যন্ত্র থাকবে না। এভাবেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উত্থান হতে পারে যা কেবল জনগণের দ্বারা পরিচালিত হবে।

কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব না করে কীভাবে সামাজিক প্রগতি ও কল্যাণের নীতিগুলি নির্ধারণ করা যাবে? সেক্ষেত্রে রায় গণশিক্ষাকে পূর্বশর্ত বলে স্বীকার করে বিষয়টির সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে গণপঞ্চায়েতগুলি হবে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও নাগরিক শিক্ষার পাঠশালা। যে শিক্ষার দ্বারা মৌলিক গণতন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী স্বার্থশূন্য, অনাসক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে। স্বার্থশূন্য মানুষ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র শ্রেণী বিশেষের দ্বারা অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হতে পারবে না, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে। রায় তাই নবমানবতাবাদের বিংশতম সূত্রে বলেছেন, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব না করে সমাজ প্রগতি ও কল্যাণের উপযোগী সামাজিক পুর্নগঠন একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। আমূল পরিবর্তিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে জনগণের রাজনৈতিক ও নাগরিক শিক্ষার পাঠশালা। রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী নিরাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেবে। এরূপ ব্যক্তিদের দ্বারা চালিত রাষ্ট্র শ্রেণী বিশেষের নিয়ন্ত্রিত শোষণের যন্ত্র হবে না।

---

[৪৯] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *কমিউনিজম পেরিয়ে,* পৃ ১৩৯

একমাত্র ক্ষমতাসীন মুক্তবুদ্ধি মানুষদের পক্ষেই দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে সকলের জন্য স্বাধীনতা আনা সম্ভব।[৫০]

তবে কোনও কোনও মার্কসবাদী এই নতুন দর্শনের বিরোধিতা করতে পারেন। কারণ এই তত্ত্বে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সমষ্টির মঙ্গলে ব্যক্তি স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়নি। কিন্তু রায় বলেন, মার্কস ফয়েরবাখ সম্পর্কিত প্রস্তাব সমূহের[৫১] নিজেও অনুধাবন করেছিলেন যে এতকাল জগত সম্পর্কে দার্শনিকরা কেবল বিভিন্ন ধারণা গঠন করেছেন বা বিভিন্নভাবে বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু দার্শনিকের কাজ কেবল জগতকে ব্যাখ্যা করা নয়। তার কাজ বিশ্বজগতকে পরিবর্তন করা। তবে রায় মনে করেন, জগত পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও কোনটি যুক্তিযুক্ত তা বিচার করা প্রয়োজন। তবে সেই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত যা ব্যক্তিকে স্বাধীনতার আস্বাদনে সমর্থ করে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রাসঙ্গিক দর্শন হল অদ্বৈত বস্তুবাদ। যা আমাদের সমাজ চিন্তার পরিণতি হিসাবে মানবতাবাদী মৌলবাদে অথবা মৌলিক মানবতাবাদে কিংবা নব মানবতাবাদে উপনীত করে। এই মতবাদ ভাবজগতের নিজস্ব গতিকে এবং সমগ্র ইতিহাসে তার প্রভাবকে স্বীকার করে এবং ভাবজগতের প্রগতির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সমন্বয় ঘটাতে সচেষ্ট হয়।

রায়ের মানবতাবাদ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ভিত্তিক মানবতাবাদ যা আধুনিক সভ্যতার যুক্তিবাদী ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই মৌল মানবতাবাদের উৎস সন্ধান প্রসঙ্গে মার্কসবাদী মানবতাবাদের উল্লেখ করা যায়। রায়ের মানবতাবাদে পূর্ববর্তী দর্শনধারার

---

[৫০] তদেব, পৃ ১৪০

[৫১] Philosophers have hitherto only interpreted the world in various ways; the point is to change it. By Marx in *Theses on Feuerbach*, XII thesis 1845.

ইতিবাচক উপাদানগুলি সমন্বিত হয়েই নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। এখানে মূলত মার্কসবাদের ইতিবাচক (সমাজতন্ত্রের ধারণা, মানবতাদের ধারণা) দিকগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে। অপরদিকে নবমানবতাবাদে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব তত্ত্ব, শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের ধারণা, এবং বিমূর্ত ধারণা রূপে ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা পরিত্যাগ করা হয়েছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে মৌলমানবতাবাদ গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ দান, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধনে অধিক যত্নশীল। অর্থাৎ এটি এমন এক দর্শন যার পরিধিতে বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, রাজনৈতিক পুনর্গঠন পর্যন্ত মানব অস্তিত্বের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দর্শন এমন এক ভাবধারা সৃষ্টিতে প্রয়াসী যা সমকালীন সকল সংকটের সমাধানে বুদ্ধিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সক্ষম। এই তত্ত্বের সদর্থক দিক হল এখানে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী নরনারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো হয়েছে, সমাজ পরিবর্তনে তাদের সক্রিয় ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নবমানবতাবাদ এভাবেই বাস্তব পরিস্থিতির যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্তিমনের ধ্যান ধারণার ক্রমোন্নতির মাধ্যমে ভবিষ্যতে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব বলে মনে করেছে। এই প্রসঙ্গে রায়ের মানবতাবাদের এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি যেগুলির মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর নব মানবতাবাদী তত্ত্বকে আরোও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারব।

নব মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

এম. এন. রায়ের নব মানবতাবাদ (New Humanism) তাঁর দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা। এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা যৌক্তিক, মানবিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। নব মানবতাবাদে

রায়ের মৌলিক ভাবনাই স্পষ্ট হয় যা মানব অস্তিত্বের জড়বাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও নৈতিক মূল্যগুলিকে সামাজিক অগ্রগতির সোপান বলে মনে করে। নব মানবতাবাদী তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা রায়ের তত্ত্বের অনন্যতা প্রকাশ করে।

যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা

বাস্তববাদী, বিজ্ঞানমনস্কতার অধিকারী এম. এন. রায় যুক্তির আলোয় সত্যের অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী মানব প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। কারণ সেখানে ইন্দ্রিয়লব্ধ জগতের অতিবর্তী কোনও এক অনন্ত শক্তিকে জাগতিক সমস্ত কিছুর মূল বলে স্বীকার করা হয়। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত নয় বলে তিনি মনে করেন। কারণ এগুলি মানব জীবনে তথা সমাজের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। সেজন্য তিনি অতিজাগতিক বিষয়কে পরিত্যাগ করে ব্যক্তির প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমকে যুক্তি নির্ভর বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রায় মনে করেন, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। মানুষের চিন্তা ও তার কার্যকলাপ বিজ্ঞান এবং যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হলে ব্যক্তি তার নিজ সামর্থ্য বিষয়ে সচেতন হবে এবং তার আত্মবিশ্বাস তাকে স্বাধীন নির্বাচনে সাহায্য করবে। রায় তাঁর মানবতাবাদী দর্শনকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নির্ভর করে গড়ে তুলেছিলেন। জৈব ও অজৈবর মধ্যে বিভাজন স্বীকার করে আধুনিক দর্শন যে দ্বৈতবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে বিজ্ঞান ওই পার্থক্যকে খণ্ডন করে বিষয় ও বিষয়ীর, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব করেছে। দ্বৈতবাদকে বিসর্জন দেওয়ার ফলে কোনও জড়াতিরিক্ত সত্তা স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। রায় নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে নবমানবতাবাদী

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সেজন্য যুক্তিকে তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি বলা যায়। রায়ের কাছে যুক্তি কোনও অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নির্ভর নয়, তা প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুক্তি কোনও আরোপিত বিষয়ও নয়, তা আমাদের সামর্থ্যের অঙ্গ—যার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান করে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করে। তাই রায় তাঁর তত্ত্বে যুক্তিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কারণ যুক্তির দ্বারাই মানুষ তার এবং অন্যের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়। রায়ের মতে, বিজ্ঞানমনস্কতা হল এমন এক প্রবণতা যা ব্যক্তিকে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগে উদ্যোগী করে। প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে ব্যর্থ হয় বলে তারা যুক্তি এবং বিজ্ঞানমনস্কতার ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেজন্য রায় বিজ্ঞানকে শিক্ষার প্রধান উপাদান বলে গ্রহণ করে সমাজে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। এর দ্বারা মানুষ প্রকৃতির নিয়ম অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী জীবন যাপনে সমর্থ হবে। কারণ প্রকৃতির নিয়ম এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করলে মানব সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয় না। তাই বিজ্ঞান কেবল প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যম নয়, তা মানবতার মুক্তি এবং উন্নয়নের জন্যেও অপরিহার্য। তাই বলা যায় যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা রায়ের নবমানবতাবাদের মূল স্তম্ভ।

স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

রায় মনে করেন, স্বাধীনতাই হল সর্বোচ্চ মানবিক মূল্য কারণ ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং আত্মমুক্তি মানব প্রগতির মূল। তাঁর মতে, ব্যক্তির উন্নতি ও সামাজিক প্রগতির জন্যে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তা, মতামত এবং কর্মের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির চিন্তা, মত

প্রকাশ এবং নির্বাচনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হল কোনও প্রকার নির্যাতনমূলক রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি। কোনও বাহ্য শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকৃত হলে সামাজিক কল্যাণ ব্যহত হয়। তাই রায় স্বাধীনতাকে মৌলিক মানবিক অধিকার বলে গ্রহণ করে তাকে সমস্ত প্রকার কর্তৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়—তা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতা হল ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব চিন্তা, বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাধার অভাব। তবে স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়; তা এমন এক দায়িত্বশীল অবস্থা যেখানে ব্যক্তি নিজের কাজের প্রতি নিজেই দায়বদ্ধ। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন—যা মানবিক মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বাধীনতা উপস্থিত থাকলে ব্যক্তি নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যিক প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজ পরিকল্পনা অনুসারে কর্ম করতে পারে। রায় বলেন, ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও স্বতন্ত্র। কারণ প্রতিটি ব্যক্তি হল সমাজের অংশ, আর সেই সকল অংশগুলি নিয়ে সমাজ গঠিত। তাই সামাজিক নিয়ম বা প্রথা ব্যক্তির স্বাধীনতা দমন করতে পারে না। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্যই ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রয়োজন। রায়ের মতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। যেমন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মত প্রকাশ, ভোটাধিকার, এবং শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বোঝায়। সামাজিক ক্ষেত্রে তা ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক পরিচয় গঠন এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক মতাদর্শ গঠনের স্বাধীনতা থাকাকে বোঝায়। যেখানে কোনও সামাজিক প্রথা বা কুসংস্কার তার ওপর বলবৎ করা যাবে না। আবার, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তা এবং নিজের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে বোঝায়। মানসিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তা ও বিশ্বাস গঠনে তার

নিজস্ব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করার স্বাধীনতাকে বোঝায়। রায় বলেন, এই স্বাধীনতাগুলি উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। তিনি আরোও বলেন, সামাজিক অগ্রগতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গেই সেই স্বাধীনতাকে সামাজিক কল্যাণেও ব্যবহার করা প্রয়োজন। স্মরণে রাখতে হবে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা কখনও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথে বাধা হবে না এবং সমাজ ও ব্যক্তির সহযোগিতামূলক সমন্বয় নষ্ট করবে না। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও কুসংস্কার, সামাজিক প্রথা এবং রক্ষণশীল মানসিকতা, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং শোষণ ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এই বাধাগুলি দূর করার মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের মুক্তি লাভ সম্ভব। তাই বলা যায় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রায়ের নব মানবতাবাদের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ ব্যক্তি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কর্ম পালনে সক্ষম না হয় তাহলে মানব সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে স্বাধীনতা কখনই নিরঙ্কুশ নয়, তার সঙ্গে নৈতিকতা এবং দায়িত্ববোধের সংমিশ্রণ থাকা প্রয়োজন। নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে ব্যক্তি এবং সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করেই একটি সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

নৈতিকতার ভিত্তি পুনর্নির্মাণ

রায় তাঁর নবমানবতাবাদে মধ্যযুগের ধর্ম নির্ভর নৈতিকতার পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানবিক নৈতিকতা গঠন করেন। প্রথাগত ধর্মীয় নৈতিকতায় মানুষকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলা যায় না, যেহেতু তাকে অতিজাগতিক কর্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। নৈতিকতার এমন ব্যাখ্যা সমাজে শোষণ এবং বিভাজন সৃষ্টি করে

বলে রায় মনে করেন। তিনি বলেন, প্রথাগত নৈতিকতায় ধর্ম যুক্ত হওয়ায় মানুষের স্বাধীন চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মনীতি বেশিরভাগ সময় মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে কাজ করে। ফলে তা কুসংস্কার বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি তথা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। ধর্মীয় নৈতিকতায় বিশেষ বিশেষ শ্রেণী এবং ক্ষমতাবানদের স্বার্থ রক্ষিত হওয়ায় সমাজে শোষণ এবং বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই রায় যুক্তিনির্ভর মানবিক নৈতিকতা গঠনের প্রয়োজন বোধ করেন যেখানে নৈতিকতা কোনও বাহ্য শক্তি দ্বারা আরোপিত বিষয় নয়, তা মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তির প্রকাশ মাত্র। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নৈতিকতার এরূপ ধারণা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই কল্যাণ সাধনে সমর্থ হবে। কারণ এক্ষেত্রে মানুষকে নৈতিক হওয়ার জন্য বাহ্যিক আইন, ঈশ্বর প্রভৃতি স্বীকারের প্রয়োজন হয় না; মানুষ স্বেচ্ছায়, নিজ যুক্তিবোধের আদেশে নৈতিক আচরণ পালন করে। যৌক্তিকতাই নৈতিকতার উৎস হওয়ায় রায়ের নৈতিকতা মানবিক এবং সার্বজনীন। রায় ব্যক্তি তথা সামাজিক উন্নতির জন্য ধর্মভিত্তিক নৈতিকতাকে বর্জন করে মানবিক, যুক্তিনির্ভর এবং সার্বজনীন নৈতিকতার ধারণা প্রদান করেন। রায় প্রদত্ত নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল বুদ্ধিবৃত্তি। যার সাহায্যে প্রতিটি নীতির বৈজ্ঞানিক এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এ ব্যাখ্যা শোষণ এবং বৈষম্যের অবলুপ্তি ঘটিয়ে মানুষের সুখ এবং উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তিস্বার্থ এবং সামাজিক স্বার্থের মেলবন্ধন কেবল যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তবে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সামাজিক কল্যাণ একই সঙ্গে নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য বলে রায় মনে করেছিলেন। কারণ সেখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত থাকে।

সংগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

রায়ের দর্শনে নৈতিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠনের ধারণা নব মানবতাবাদী তত্ত্বের মূল উপাদান। তিনি গণতন্ত্রকে কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থা রূপে নয়, বরং নৈতিক বিকাশের একটি অপরিহার্য কাঠামো রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, নৈতিকতা ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত চিন্তা ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্রই একমাত্র ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, মর্যাদা ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশ সম্ভব। তাই তিনি প্রথাগত ধর্মীয় বা কর্তৃত্ববাদী নৈতিক ধারণার ভিত্তিতে গঠিত অন্যান্য ব্যবস্থাকে (সংসদীয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ সেগুলি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং নৈতিক বিধানকে আরোপিত বলে ব্যাখ্যা করে। প্রকৃতপক্ষে তিনি এমন কোনও ব্যবস্থা স্বীকার করেননি যেখানে ব্যক্তিকে বলপূর্বক কোনও কিছু অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়। রায়ের কাছে গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ সমষ্টিগতভাবে যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক নীতিমালা গঠন করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা কোনও আরোপিত বিষয় নয়, বরং মানুষের মধ্য থেকেই তা উৎসারিত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যান্য ব্যবস্থা অপেক্ষা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে অধিক দায়িত্বশীল ও নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী করে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি সামাজিক ন্যায় বিচার ও সহমর্মিতার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নয়—অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণ। সেজন্য তিনি সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়কেই সমালোচনা করে এমন একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে ছিলেন যেখানে সম্পদের ন্যায্য বন্টন নৈতিক সমাজের পূর্বশর্ত রূপে গৃহিত হয়। নৈতিকতা এবং গণতন্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত এ কথা অনুধাবন করেই তিনি একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন যা নৈতিক মানবিক

মূল্যবোধ বজায় রাখতে পারে। তিনি যেহেতু নৈতিকতাকে যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেছিলেন তাই প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন যা যুক্তিভিত্তিক আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমর্থ হবে। তবে সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে পরিণত হলে তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ন করবে এ কথা বুঝে তিনি শিক্ষা সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে নৈতিকভাবে পরিণত করে তোলাই তাঁর গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ছিল।

শিক্ষা সংস্কার

রায় মনে করতেন শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নতি ব্যতীত কখনোই উন্নত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই তিনি শিক্ষাকে সমাজ ও ব্যক্তির নৈতিক ও বৌদ্ধিক মুক্তির প্রধান হাতিয়ার রূপে দেখেছিলেন। রায় বিশ্বাস করেন, একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। কারণ শিক্ষা কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, তা কেবল তথ্য বা দক্ষতা অর্জনের উপায় নয়। শিক্ষা হল যুক্তিনির্ভর, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের চাবিকাঠি। কারণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যুক্তিবাদী ও নৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে। তিনি ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছিলেন কারণ তা ব্যক্তির সৃজনশীলতা, নৈতিকতা এবং স্বাধীন চিন্তার বিকাশের পরিপন্থী। তাই তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে যুক্তি, সমালোচনামূলক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো। ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অভাব থাকে। ধর্ম নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তি প্রচলিত, ঐতিহ্যশালী কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে না এবং

স্বাধীনভাবে সত্যের অনুসন্ধান করতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তি যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। এ শিক্ষায় তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা সম্ভব হয়। তাই রায় শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়, সহযোগিতা, সম্প্রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিকে পেশাদারী দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে না, বরং তাকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ ও সক্রিয় নাগরিক রূপে গড়ে তোলে। সেজন্য তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা মৌলিক মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। রায় মনে করেন, যে শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি সমাজের প্রয়োজন ও পরিবর্তনের উপযোগী নয় তা কখনোই বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসম্মত নয়। সেখানে অবশ্যই কর্তৃত্ববাদের প্রাধান্য এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী নিহিত থাকে। সেখানে স্বাধীন চিন্তা এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। তাই রায় শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। যে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা এবং সমস্যা সমাধানে যুক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য বৃদ্ধির সঙ্গেই সহানুভূতি, নীতিবোধ, মানবিক সংহতি ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির অনুশীলন শিক্ষার মূল লক্ষ্য বলে গ্রাহ্য হবে। সেখানে লিঙ্গ, জাতি বা অর্থনৈতিক অবস্থা নিরপেক্ষভাবে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হবে যা সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে সকল ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম-উন্নতিতে সাহায্য করবে ও সামাজিক উন্নতির সহায়ক হবে।

মানবিক সংহতি

রায় শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যে মানবিক সংহতিকে বৈশ্বিক মানবিক সংহতি বলা যেতে পারে। কারণ মানুষের মানবিক

মূল্যবোধগুলির যথাযথ বিকাশ না হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিভেদ এবং শ্রেণীসংগ্রামের মতো সংকীর্ণ বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক সংকট সৃষ্টি করে। যথাযথ মূল্যবোধের অভাবে ব্যক্তিবর্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাই রায় এমন সংকীর্ণ মানবিক সংহতির কথা না বলে বিশ্বজনীন সংহতির পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানব জাতির উন্নতি এবং প্রগতি তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষ একে অপরের প্রতি সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার মনোভাব পোষণ করবে। সেজন্য ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বা জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে মানবিক সংহতির ভিত্তিতে একটি সমন্বিত বিশ্ব গঠন করা আবশ্যক। মানবিক সংহতির মূল ধারণা হল সমগ্র মানবজাতি এক অভিন্ন পরিবারের অংশ। এমন সমাজে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে ব্যক্তি স্বশাসনের অধিকারি হলেও সে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা না করে সেই প্রেক্ষাপট থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ধর্ম, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের অতিরিক্ত এই সংহতি বোধ মানবকল্যাণে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবে। রায়ের মতে, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব এবং তাদের অস্তিত্ব কেবলমাত্র সহযোগিতা এবং সংহতির মাধ্যমেই বজায় থাকতে পারে। তাই সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ধারণা মানবিক সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধর্মের বিরোধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই মানবিক সংহতি নষ্ট করে। ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে; জাতীয়তাবাদী ধারণা মানুষকে ভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। তাই জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। রায়ের মতে, মানবিক সংহতিমূলক সমাজ গঠনের মৌলিক ভিত্তি মানুষের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মনোভাব। যেখানে সাম্য এবং ন্যায় বিচারকে প্রধান্য দিয়ে বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম বা অর্থনৈতিক

বৈষম্যকে দূর করা যায়। মানবিক সংহতিকে তিনি ধর্ম বা আবেগসঞ্জাত কোনও আদর্শের ভিত্তিতে গঠন না করে বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যার দ্বারা জাতিগত এবং ধর্মীয় সংঘাত দূর করে যুদ্ধের পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ধর্ম, জাতীয়তা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের ঊর্ধ্বে মানবিক সংহতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা এমনই এক ন্যায়সঙ্গত এবং সমতাভিত্তিক বিশ্ব গঠন করা যায়। তাই বলা যায় মানব সংহতির ধারণা রায়ের মানবতাবাদের শক্তিশালী ভিত্তি, যা ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতার উপর নির্ভর করে আছে।

বস্তুবাদী ভিত্তি

রায়ের মানবতাবাদী দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য হল স্বাধীনতা। তাই যে দর্শনে মানুষের স্বাধীনতার হানি ঘটে তা কখনোই মানবতাবাদী দর্শন নয় বলে তিনি মনে করেছিলেন। রায় মানুষের স্বরূপ নির্ধারণ দ্বারা স্বাধীনতা ও নৈতিকতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান অনুসরণ করে মানুষকে জড় জগতের পটভূমিতে ব্যাখ্যা করেন। জড় জগতের প্রেক্ষাপটে মানুষ কিভাবে চেতনার অধিকারী হয়, সে ব্যাখ্যায় জীববিজ্ঞানের অন্যতম ব্যাখ্যাগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। যে তত্ত্বগুলিতে জড় থেকে জীবনের আবির্ভাব হয়েছে বলে দাবী করা হয়। রায় মনে করেন, প্রাণের উৎস থেকে রহস্যের যবনিকা অপসারণ করলে মানুষকে জড় সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিষয় বলে গণ্য করতে হয়। তাই মানুষের শক্তি, আচরণ, নৈতিকতার জন্য কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। রায় আত্মাকে কোনও স্বর্গীয় আলোর আকস্মিক স্ফরণ বলে মনে করেন না। তাঁর কাছে আত্মা হল একটি জৈব ঘটনা মাত্র। আত্মার ব্যাখ্যায় কোনও অতিপ্রাকৃতিক বিষয় স্বীকৃত হলে তা কাল্পনিক গল্পকথা হয়। আবার তিনি মানুষের নীতিবোধকেও জৈবিক

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক মানবিক গুণ বলে স্বীকার করেন। তাই নৈতিক হওয়ার জন্য কোনও স্বর্গীয় বিধানের বা রহস্যময় কোনও কিছু স্বীকার্য নয়। তাঁর কাছে মানুষের নীতিবোধ ক্রম বিবর্তনের ফসল। যে নৈতিকবোধ মানুষের সার্বিক বিকাশের পূর্বশর্ত। নৈতিকবোধ স্বতঃই মানুষের মধ্যে থাকে বলে এদের উৎপত্তিতে কোনও অলৌকিক শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নেই। কারণ তাহলে মানুষকে আর স্বাধীন বলা যায় না। যদি মানুষ স্বাধীন না হয় তাহলে সেই দর্শনকে মানবতাবাদী দর্শন বলা যাবে না। তাই মানুষকে স্বাধীন রূপে প্রতিষ্ঠা করতে রায় নৈতিকতার বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই তিনি মানবতাবাদের ভিত্তিরূপে বস্তুবাদকে গ্রহণ করেন। রায় মনে করেন, নৈতিকতার ভিত্তি হল যুক্তি; যুক্তির আদিম রূপ হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। তিনি মানব সমাজ উৎপত্তির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বলেন, সমাজ উৎপত্তির মূলে কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তার নির্দেশ নেই। মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী রূপে সঠিকভাবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সমাজ তৈরী করে। মানুষের যুক্তিবাদীতার কারণ রূপে তিনি বলেন, প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার পটভূমিতে মানুষের উদ্ভব হয় বলে সে যুক্তিবাদী। কারণ মানুষ জগতের সঙ্গে অভিযোজনের সময় ঐ নিয়মগুলিকে অন্তঃস্থ করেছে। অতএব মানুষ নীতিপরায়ণ। তিনি আরোও বলেন, শূন্য থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়নি, বিশ্বজগতের বাস্তব পটভূমিতে জৈবিক বিবর্তনের নানা স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। তাই মানুষ তার মন, বুদ্ধি, ইচ্ছা—সব কিছু নিয়ে বাস্তব বিশ্বজগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বিশ্বজগত নিয়মের অধীন হওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব, বিবর্তন, আবেগ, ইচ্ছা, চিন্তা—সবকিছুই জগতের নিয়ম শৃঙ্খলায় বিধৃত। মানুষ মূলত যুক্তিশীল প্রাণী, বিশ্বজগতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্যতান শোনা যায় মানবীয় যুক্তি তারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

এই অন্তর্নিহিত যুক্তিই মানুষের নীতির উৎস। রায়ের মতে, এই মনোভাব স্বীকার করতে পারলে মানুষের পক্ষে স্বেচ্ছায় নীতিবান হওয়া সম্ভব। এভাবেই রায় বস্তুবাদের ভিত্তিতে নৈতিকতার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। রায় দাবী করেন, ইতিহাসে দেখা যায় যে নীতিতত্ত্বের নিয়ম বা নৈতিক মূল্যবোধগুলি মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে ও বিকশিত হয়েছে। এই নিয়মগুলির মধ্যে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে মূল মানবিক মূল্যবোধ বলা যায়। রায়ের মতে, সেই মূল মানবিক মূল্যবোধ হল স্বাধীনতা। এই নীতিতত্ত্বের মূল্যবোধগুলি তথাকথিত আধ্যাত্মিক ধারা অনুসারী নয়। সেগুলি আমরা ঈশ্বরের কাছে থেকে লাভ করি না। প্রকৃতপক্ষে, যে কোনও আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মতবাদে সমস্ত কিছুর মূলে এক অপার্থিব আত্মার কথা বলে, যা সমস্ত প্রেরণার উৎস। তাই রায় এই মতবাদগুলিকে ভাববাদী রূপে চিহ্নিত করেন। ভাববাদী দর্শনগুলির বক্তব্যে এমন কিছু বিষয় থাকে যা ব্যাখ্যা করা যায় না, অথবা তা রহস্যময় কোনও কিছুতে পর্যবসিত হয়। তাই রায় নবমানবতাবাদী দর্শনে এমন অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করে চিন্তা ভাবনার উদ্ভবের বস্তুনিষ্ঠ স্বীকৃতি ভৌত বিশ্বের মধ্যে অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি মানবিক মূল্যবোধগুলিকে বাস্তব জগতে জৈব বিবর্তনের ধারায় অনুসন্ধান করেন, যার প্রধান ভিত্তি হল বস্তুবাদ। বস্তুবাদের মধ্যে থেকেই কেবল এই মানবিক মূল্যবোধগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ রায় কাছে বস্তুবাদই একমাত্র সম্ভাব্য দর্শন। তাঁর মতে, মানব সভ্যতার আদি কাল থেকে যে সব দার্শনিক ধারা চিন্তার ইতিহাসে কোনও না কোনও ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে সেগুলি সবই বস্তুবাদী দর্শন। তাই তিনি মনে করেন, মানুষের ইতিহাসতত্ত্ব, সমাজপুনর্গঠনতত্ত্ব এবং নৈতিক দর্শন কেবলমাত্র বস্তুবাদী দর্শনের প্রেক্ষিতে নির্ণয় করা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুবাদী মানবতাবাদের সমালোচনা

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব মানবতাবাদের প্রধান লক্ষ্য হল এমন এক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। এই মতবাদে তাঁর লক্ষ্য হল ব্যক্তি মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত করা। নবমানবতাবাদ এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব— যা ব্যক্তিকে সমাজের কেন্দ্রে স্থাপন করে তার অনন্যতা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী। তাই তিনি কোনও শ্রেণী বা জাতি মুক্তির কথা বলেননি। উপযোগবাদের সংহতিবাদে ও মার্কসের তত্ত্বের যৌথমালিকানাবাদে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় তা অনুধাবন করেই রায় ব্যক্তির সমস্ত সম্ভাবনার স্ফূরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা ও স্বাধীনতা প্রদানে পক্ষপাতী। তিনি তাঁর দর্শনে নৈতিকতাকে সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি বলে গ্রহণ করে এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যা ব্যক্তির বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে। তাঁর নবমানবতাবাদী তত্ত্বে রায় ব্যক্তির সামগ্রিক উন্নতির কারণ রূপে ব্যক্তির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিহ্নিত করেছেন। তাই তিনি প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। স্বাধীনতা প্রসঙ্গেই তিনি নৈতিকতার আলোচনা করেন, যেহেতু নৈতিক দায়বদ্ধতা স্বাধীনতার ধারণাটিতে অন্য মাত্রা যোগ করে। তাঁর নৈতিকতার ধারণাটি বিষয়গত—যেহেতু তা বুদ্ধিনিঃসৃত এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী। অর্থাৎ নৈতিকতা বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর; কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ন্ত্রিত বিষয় নয়। নৈতিক আচরণ হল মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি প্রসূত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই নৈতিকতা বুদ্ধিবৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয় কীভাবে? রায়ের বক্তব্য অনুসারে মানুষ নৈতিক (Moral), কারণ মানুষ

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী (Rational)। এই বুদ্ধিবৃত্তি থেকে নৈতিকতার উৎপত্তি ব্যাখায় রায় বলেন, মানুষ বর্তমানে যে সকল আচরণ সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুসরণ করে তা সে পূর্বপুরুষদের থেকে জৈবিক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে এবং এগুলিকেই সে নৈতিক বোধ বলে গণ্য করে। এমনকি বিবেকও কোনও রহস্যাবৃত সত্তার অন্তরের ভাষা নয় অথবা ঈশ্বরের নির্দেশ নয়। বরং তা এক আধিভৌতিক ঐতিহ্য যাকে বিবর্তনের পথ ধরে উদ্ভূত অভিনবত্ব বলে ব্যাখ্যা করা যায়। রায়ের কথায়,

> ...there is a rule of conduct, which are biological inherited by man and find expression as the sense of morality. Conscience is not a mystic inner voice nor a divine presentation, but a biological heritagean emergent novelty of the process of evolution.[১]

অর্থাৎ তিনি আচরণের এমন কতকগুলি নৈতিক নিয়ম স্বীকার করেছেন যেগুলি জৈবিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। রায় এই নিয়মগুলিকে জৈবিক নিয়ম বলেন। কিন্তু সেই জৈবিক নিয়মগুলি কেমন নিয়ম? তা কি প্রাকৃতিক নিয়ম, নাকি কোনও যৌক্তিক নিয়ম? রায় আচরণের এই জৈবিক নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম রূপে গণ্য করেছিলেন। কারণ সেই নিয়মগুলি জড় জগতের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে ওঠে। কিন্তু এই নিয়মগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম হলে কোন মানদণ্ড অনুসরণ করে ঐ প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নৈতিক নিয়মে পরিণত হয় তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কারণ সকল প্রাকৃতিক নিয়ম নৈতিক নিয়ম বলে গণ্য হয় না। আমরা মানুষের আচরণকে নৈতিক-অনৈতিক বলে বিচার

[১] Sattar S. Abdul, *Humanism of M. Gandhi and M.N. Roy*, p.164

করি। কোনও প্রাকৃতিক নিয়মকে নৈতিক বা অনৈতিক বলি না। কিন্তু মানুষের আচরণের নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে মনুষ্যকৃত আচরণকে নৈতিক বা অনৈতিক বলা যাবে কীভাবে? অর্থাৎ ঐ নিয়মগুলির মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকার কারণে সেগুলি নৈতিক নিয়ম বলে বিবেচিত হবে? উত্তরে রায় বুদ্ধিবৃত্তির কথা বলেন। ঐ নিয়মগুলির মধ্যে যখন বুদ্ধিবৃত্তি নিহিত থাকে তখন তাকে নৈতিক বলা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিই নৈতিকতার ভিত্তি। বুদ্ধিবৃত্তি থেকে নৈতিকতা নিঃসৃত হয়। তাই নৈতিকতার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং বলা যায়, যেখানে নৈতিকতা থাকে সেখানে যুক্তি (বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ) থাকে। নৈতিকতা সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা যুক্তির দ্বারা সমাধান সম্ভব। ফলে রায়ের কথা অনুযায়ী বলতে হয় সকল নৈতিক সিদ্ধান্ত হল যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

প্রকৃতপক্ষে, রায়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত মতবাদটি কিছুটা কান্টীয় মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কান্ট বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধিকে নৈতিকতার ভিত্তি বলে মনে করেছেন। কান্ট বলেন, নৈতিকতা কোনও বাহ্য উৎস (ধর্ম বা ঐতিহ্য) জাত নয়। বরং এটি হল মানুষের যুক্তি প্রদানের সামর্থ্য যা আত্মকেন্দ্রিক কামনা নিরপেক্ষ হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সার্বজনীন নিয়ম অনুসারে স্বাধীন ভাবে কর্তব্য কর্ম নির্বাচনে ব্যক্তিকে প্রণোদিত করে এবং স্বাধীন ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত। তাঁর মতে, মানুষ যুক্তিবুদ্ধির অধিকারী (rational being) এবং তার যৌক্তিক প্রকৃতিই মানুষকে নৈতিক পথ অবলম্বনে সাহায্য করে। যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে এবং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কান্টের তত্ত্বে এই নীতিগুলি বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি নিঃসৃত হওয়ায় তা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ। সে কারণে এগুলি সার্বিক এবং আবশ্যক। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে এই নীতিগুলি অনুসরণে ব্যক্তি বাধ্যতাবোধ অনুভব করবে। নীতিগুলির সর্বজন প্রযোজ্যতা ব্যাখ্যা করতে কান্ট বলছেন, "Act only according to that maxim whereby you can at same

time will that it should become a universal law"[২] অর্থাৎ ব্যক্তিস্বীকৃত কোনও নীতি (maxim) তখনই নৈতিক নিয়ম বলে গণ্য হবে যখন ব্যক্তি ওই নীতিকে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে পারে। ব্যক্তি এমন সার্বজনীন নীতি অনুসারে কর্ম পালন করলে তা নৈতিক কর্ম বলে গণ্য হবে। এই নিয়ম বুদ্ধিপ্রদত্ত বলে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সেজন্য কান্ট এই নৈতিক নিয়মগুলিকে শর্তহীন অনুজ্ঞা বলেছেন— যে অনুজ্ঞা অনুসরণ করে কর্তার কর্ম নৈতিক বলে বিবেচিত হবে। যে যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে ব্যক্তি তার কর্মের সিদ্ধান্ত গঠন করবে তা যেন সকল ব্যক্তির নিকট অনুসরণীয় হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন ঐ যুক্তি অনুসারে ঐ কর্ম নির্বাচন করতে পারে। কান্ট মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মই বৌদ্ধিক সার্বজনীন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং নিয়মগুলি আবশ্যক হওয়ার কারণে, অবশ্য পালনীয় বলে তা ব্যক্তিকে নৈতিক আচরণ পালনে বাধ্য করে। কান্ট নৈতিক নিয়ম অনুসরণে যে বাধ্যতাবোধের উল্লেখ করেছেন তা কোনও বাহ্য শক্তি দ্বারা আরোপিত বাধ্যতাবোধ নয়। এ কোনও দমনমূলক মনোভাব নয়। ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারাই নৈতিক নিয়ম নির্বাচন করে সেই অনুসারে তার কর্মনীতি নির্ধারণ করে। কান্ট মনে করেন আবেগ, অনুভূতি যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে তবে তার ইচ্ছা স্বাধীন নয় এবং বুদ্ধি নিঃসৃত ঐ সিদ্ধান্তটিকে বা ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃত কর্মকে নৈতিক কর্তব্য বলা যাবে না। কান্ট মনে করেন, নৈতিক ব্যক্তি হতে গেলে আমাদের কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য পালন করতে হবে। অন্য কোনও লক্ষ্য পূরণের জন্য নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করার কথা তিনি বলেননি।

[২] Kant, I., *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, Trans by Mary Gregor, p. 31

কিন্তু রায় নৈতিকতাকে বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চাইলেও নৈতিক কর্মকে তিনি কেবল বুদ্ধি নির্দেশিত অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ কর্তব্য কর্ম বলেননি। নৈতিক কর্মকে তিনি বিবেকের নির্দেশ বলেছেন। বিবেক মানুষের যুক্তিবোধ এবং অভিজ্ঞতার অপরিহার্য নির্যাস। বিবেক হল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার ফল। তাঁর কাছে বিবেক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক গুরুত্বপূর্ণ আধার। তা কোনও ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয় নয়। আবার তা কোনও রহস্যজনক গোপন সত্তার আদেশ বা কোনও ঈশ্বর প্রদত্ত বৃত্তিও নয়। রায়ের মতে, বিবেক হল বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত এক অভিনব বিষয়। রায় মনে করেন, নৈতিকতা মানুষের অভিজ্ঞতা, যুক্তি এবং বিবেকের অভিব্যক্তির ফল। মানুষের মানসিক ও সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিবেক গঠিত হয়। এই বিবেক মানুষকে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। রায়ের কথায়, বিবেক তখনই কার্যকর হয় যখন এটি যুক্তি এবং মানবিক মূল্যবোধ অনুসারে পরিচালিত হয়। এটি মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে এবং অপরের কল্যান সাধনে প্ররোচিত করে। তাঁর নিকট বিবেক হল স্বতন্ত্র ও স্বাভাবিক গুণ। এই বিবেকের উপস্থিতি ব্যক্তির এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন। এটি মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, লোভ এবং অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে। রায় যুক্তি ও বিবেককে একে অন্যের পরিপূরক বলেছেন। যুক্তি হল চিন্তার কাঠামো আর বিবেক সেই কাঠামোয় নৈতিক মূল্যবোধ যোগ করে। সুতরাং নৈতিকতা হল বিবেকের অনুমোদন সাপেক্ষ যা পরিবেশ বিষয়ে সহজাত সচেতনতা থেকে এবং পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। নৈতিকতা হল বিবেকের এক যান্ত্রিক, জৈবিক ক্রিয়া যা যুক্তির পথ অনুসরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মেষিত হয়। রায়ের কথায়

> Morality is an appeal to conscience, and conscience is instinctive awareness of, and reaction to the environment.

It is a mechanistic biological function on the level of consciousness. Therefore, it is rational.[৩]

কিন্তু রায় যদি বিবেকের সিদ্ধান্তকে স্বতঃস্ফুর্ত সহজাত সচেতনতা বলেন এবং তা যদি যান্ত্রিক হয় তাহলে নৈতিকতার ধারণা ব্যাখ্যায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি কোনও কিছু সহজাত এবং যান্ত্রিক হয় তাহলে তা যৌক্তিক হয় কী অর্থে? রায়ের কথা অনুযায়ী কোনও কিছু বিবেকজাত হওয়ার অর্থই যৌক্তিক হওয়া। কিন্তু কোনও কিছু যান্ত্রিক হওয়া এবং কোনও কিছু যৌক্তিক হওয়া এক বিষয় নয়। কারণ সাধারণত যুক্তি আমাদের যান্ত্রিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তি এবং যান্ত্রিক জৈব ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। রায় যান্ত্রিকতা এবং যৌক্তিকতাকে সমার্থক বলেছেন। আবার যদি যুক্তি যান্ত্রিক হয় তবে সেই যান্ত্রিক বিবেক ও যান্ত্রিক যুক্তির ভিত্তিতে উদ্ভূত নৈতিকতায় স্বাধীনতার স্থান কোথায়?

উত্তরে রায় বলেন, বুদ্ধিবৃত্তি সহজাত প্রবণতা যা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে ক্রিয়া করে, কারণ তা জন্মগতভাবে লব্ধ। তিনি মনে করেন, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্রিয়া করাই হল যৌক্তিক পথ অনুসরণ করা। এখানে যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে হয় বলে তা যৌক্তিক। কিন্তু রায়ের এই বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ নৈতিকতাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ যা স্বতঃস্ফুর্ত ও সহজাত তা যৌক্তিক এবং যা যৌক্তিক তা নৈতিক এমন কথা বলা যায় না। কারণ মানবেতর প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত স্বতঃস্ফূর্ত, সহজাত কর্মকেও তাহলে যৌক্তিক বলে এবং যৌক্তিক হওয়ায় তাকে নৈতিক বলে দাবি করতে হয়। আবার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোনও লক্ষ্য পূরণের জন্য আমরা এমন অনেক কর্ম পালন করি যা যৌক্তিক হলেও তাকে নৈতিক বলা যায় না। যেমন, দৈনন্দিন

[৩] Roy, M.N., *Beyond Communism*, Thesis 13, p. 156

জীবন যাপনে ব্যাংকে টাকা জমিয়ে রাখা একটি যুক্তিযুক্ত কাজ। কারণ সেখানে টাকা রাখলে চুরি বা ক্ষতির সম্ভবনা অনেক কম। ঐ কাজকে যুক্তিসঙ্গত বলা হলেও নীতিসঙ্গত অর্থাৎ নৈতিক বলা যায় না। কারণ সেখানে নৈতিকতার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু রায়ের বক্তব্য আনুসারে ঐ কাজগুলি যেহেতু যুক্তিযুক্ত সেহেতু সেগুলি নৈতিক কাজ। যা সঠিক নয়। কান্টও যে কোন যৌক্তিক কাজকে নৈতিক বলেন না। এ প্রসঙ্গে আমরা কান্টের hypothetical imperative বা শর্তাধীন অনুজ্ঞার উল্লেখ করতে পারি। যখন আমরা কোনও একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করতে আকাঙ্খা করি তখন ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য কোন কর্মটি যথাযথ তা নির্ধারণ করতে হয়। এখানেও আমাদের নির্বাচন যুক্তিযুক্ত ও আবশ্যক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ ঐ লক্ষ্যটি পূরণের জন্য ঐ বিশেষ কর্মটিই পালন করতে হবে। কিন্তু কান্টের মতে লক্ষ্যটি ব্যক্তি সাপেক্ষ হওয়ায় এই শর্তাধীন আদেশটিকে নৈতিক বলা যাবে না।

মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে স্ব-সংরক্ষণের প্রবণতা এবং প্রজাতি-সংরক্ষণের প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্ব-সংরক্ষণের প্রবণতা হল যখন ব্যক্তি কেবল নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। কিন্তু প্রজাতি সংরক্ষণের প্রবণতায় ব্যক্তি নিজেকে ছাড়িয়ে অন্যের অস্তিত্ব রক্ষা করে। যেমন, পিতা মাতা নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে বিশেষ বিশেষ কর্ম করে। মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়ে থাকেন। তাই নৈতিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বদা প্রজাতি সংরক্ষণের প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ স্ব-সংরক্ষণ প্রবণতা প্রধানত নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সাথে সম্পর্কিত, যা আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু নৈতিকতা আত্মকেন্দ্রিক হলে তা পরিপূর্ণ হয় না। নৈতিকতার লক্ষ্য বৃহত্তর কল্যাণ— যা প্রজাতি, সমাজ বা সামগ্রিক জীবজগতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে রায়ের মতে নৈতিক কর্ম সহজাত প্রবণতা প্রসূত। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, নৈতিক কর্ম যদি

সহজাত প্রবণতা প্রসূত হয় তাহলে পূর্বোক্ত দুটি সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোনটিকে ব্যক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে? ধরা যাক, চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় রাস্তায় অসুস্থ মানুষকে দেখলে ব্যক্তি কী করবে? সে কি অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে নাকি সে ইন্টারভিউ দিতে যাবে? রায়ের কথা অনুযায়ী এক্ষেত্রে ব্যক্তি সিদ্ধান্তটি সহজাত প্রবণতা অনুসারেই নেবে। এখন ব্যক্তি সহজাত প্রবণতা অনুসারে যে সিদ্ধান্ত নেবে তাকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বলা হবে কোন অর্থে? আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—সহজাত প্রবণতা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কাকে গুরুত্ব দেবে? অর্থাৎ ব্যক্তি স্বসংরক্ষণ প্রবণতা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে নাকি প্রজাতি সংরক্ষণ প্রবণতা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে?

উত্তরে যদি বলা হয় ব্যক্তি কেবল নিজেকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে তাহলে তার সিদ্ধান্তকে নৈতিক বলা যায় না। কারণ নৈতিকতা সর্বদা একটি আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলে যেখানে ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। নৈতিক ব্যাখ্যায় ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকলে সেই ব্যাখ্যা যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নৈতিকতায় ব্যক্তি অপরের প্রতি কীরূপ আচরণ করবে তার মূল্যায়ন করা হয়। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের নিকট অপর ব্যক্তিদের কিছু প্রত্যাশা থাকে। ব্যক্তির দায়িত্ব হল অপর ব্যক্তিদের প্রত্যাশাগুলি অনুধাবন করে সেগুলি যুক্তিযুক্ত হলে সেই অনুসারে কর্ম করা এবং তা না হলে বিরোধী যুক্তি প্রদর্শন করা। কিন্ত রায়ের নবমানবতাবাদে যেহেতু ব্যক্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তাই নৈতিক ব্যাখ্যায় কেন্দ্রে থাকে ব্যক্তিই। কারণ তাঁর নিকট ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রেখে নৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করলে নৈতিক নিয়মগুলি সার্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক না হয়ে ব্যক্তি সাপেক্ষ বলতে হয়। কিন্তু রায়ের নৈতিক মতবাদকে ব্যক্তিসাপেক্ষবাদী বলা যায় না। কারণ তিনি নিজেই উপযোগবাদের

বিষয়গত দিকের অভাবের জন্য অর্থাৎ বিষয়ীগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সেই মতবাদকে সমালোচনাও করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি নৈতিকতার একটি বিষয়গত ভিত্তি দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলছেন, “In the absence of objective standards, moral values are relegated to the dream land.”[8] নৈতিকতার এমন ব্যাখ্যা স্বীকৃত হলে ব্যক্তিকে নৈতিকতার কেন্দ্রে স্থাপন করা যায় না। কিন্তু রায় যদি নৈতিক মতবাদের কেন্দ্রে ব্যক্তিকে না রাখেন সেখানে যদি সমষ্টির গুরুত্ব থাকে তাহলে সেই মতবাদটি একপ্রকার সমষ্টিবাদে রূপান্তরিত হয়। যা রায় স্বীকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিরোধী হয়। তাই বলতে হয়, রায়ের তত্ত্বে প্রথম থেকে ব্যক্তির গুরুত্ব সর্বাধিক থাকলেও নৈতিক ব্যাখ্যায় সমষ্টি গুরুত্ব পায়, যা তাঁর তত্ত্বের ক্ষেত্রে সমস্যাজনক।

কিন্তু যদি রায়ের অনুসারীগণ বলেন, রায় ব্যক্তি এবং সমষ্টির উভয়েই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিমানুষের সমষ্টির ভাবনা কিভাবে আসে? উত্তরে বিবেকের মাধ্যমে সমষ্টিবাদী ভাবনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। রায় বলেন, ব্যক্তি বিবেকের সাহায্যের একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার সম্বন্ধ গঠন করে। কিন্তু রায়ের এই বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না। কারণ তাঁর কাছে বিবেক একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া। ফলে বলা যায় তা সকল মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকবে। এবং বিবেক সকল মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকলে মানুষ ভুল কাজ করে কিভাবে? অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ স্বার্থপর আচরণ করে কেন? একই বিবেক দিয়ে সহযোগীতার আচরণ এবং স্বার্থপর আচরণের মত পরস্পর বিরোধী আচরণের ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব?

---

[8] Roy, M.N., *Reason, Romanticism and Revolution*, p. 467

কিন্তু যদি বলা হয় নৈতিক ব্যাখ্যায় রায় সমষ্টির গুরুত্ব দিলেও সেখানে পরোক্ষভাবে ব্যক্তির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে রায়ের নৈতিক মতাবাদটি Enlightened self-interest তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। কারণ এই তত্ত্বে বলা হয় "persons who act to further the interests of others or the interests of the group or groups to which they belong ultimately serve their own self-interest"[৫] অর্থাৎ ব্যক্তি সে যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেই গোষ্ঠির স্বার্থ পূরণে কর্ম করে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে তার নিজের স্বার্থ রক্ষা করে। তাই বলা যায় অন্য ব্যক্তি থাকলেই সে নিজে বাঁচতে পারবে। তাই ব্যক্তি নিজেকে বাঁচানোর জন্য অন্যকে বাঁচাতে চায়। ফলে ব্যক্তি যখন নিজেকে গুরুত্ব না দিয়ে অপরকে গুরুত্ব দিয়ে কোনও কাজ করে সেখানেও পরোক্ষভাবে নিজের স্বার্থ পূরণ করে। Enlightend self-interest তত্ত্বের এই ধারণাটি অ্যাডাম স্মিথের ধারণা থেকে উত্থিত হয়েছিল। তাঁর *The Wealth of Nation* গ্রন্থে 'invisible hand' এর ধারণা উপস্থাপন করেছিলেন। এই ধারণা অনুসারে, ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে কাজ করে, তখন অজান্তেই সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করে।

সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে, নৈতিকতাকে রায় বিবেক দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, এবং বিবেক যদি সহজাত যান্ত্রিক প্রবণতা হয় তাহলে সেখানে স্বাধীনতার (freedom) এর জায়গা কোথায়? রায় অদ্বৈত বস্তুবাদের ভিত্তিতে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বিবেক হল প্রাকৃতিক বিষয় (natural phenomena) তাই একে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি বলছেন, "শূন্য থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়নি।

[৫] Tocqueville: Book II, Chapter 8

বিশ্বজগতের বাস্তব পটভূমিতে জৈবিক বিবর্তনের নানা স্তরের ভিতর থেকে মানুষের উদ্ভব হয় বলেই মানুষের মন, বুদ্ধি, ইচ্ছা— সব কিছুই নিয়েই বস্তু জগতের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই বস্তুজগত নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব, বিবর্তন, আবেগ ইচ্ছা, চিন্তা— সব কিছুই বস্তুজগতের নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন। তাই মানুষ যুক্তিবাদী। বিশ্বজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐকতান মানবীয় যুক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র।" তাই রায়ের মতবাদকে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে রায় একই সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ এবং ব্যক্তির জীবনে স্বাধীনতার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করেন। নৈতিক আলোচনায় স্বাধীনতার কথা অতি প্রয়োজনীয়। ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয় তাহলে বলতে হয় ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে প্রাকৃতিক নির্দেশ্যবাদ বা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করলে কীভাবে কোনও ব্যক্তিকে নৈতিক কর্মের কর্তা বলা যাবে?

প্রকৃতপক্ষে কাজ করার স্বাধীনতা বা ইচ্ছার স্বাধীনতা নৈতিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জৈব ক্রিয়া, প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রভৃতি বাধ্যতামূলক বলে সেগুলির নৈতিক বিচার হয় না। আবার বাহ্যশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া কিংবা অপর ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ারও নৈতিক বিচার হয় না। সেই কর্মেরই কেবল নৈতিক বিচার সম্ভব যে কর্মটি একাধিক বিকল্প থেকে ব্যক্তি নির্বাচন করেছে; যে কর্মটি ব্যক্তির বিবেচনা-প্রসূত। যে কর্ম আমাদের কাছে বাধ্যতামূলক নয় কেবল সেই কর্মের নৈতিক বিচার সম্ভব। তবে এটাও ঠিক যে মানুষ বাহ্যনিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নৈতিক কর্মে ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্বীকার করতেই হবে। তা না হলে নৈতিক বিচার অসম্ভব হয়ে পড়ে, ব্যক্তিকে তার কৃত কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না। অর্থাৎ বাহ্যশক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে

থেকেও মানুষ নিজের কর্মপন্থা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। তাই বলা যায় মানুষের কর্মপন্থা নির্ধারণের স্বাধীনতা আছে। সেই কর্মপন্থা নির্ধারণের স্বাধীনতা অস্বীকৃত হলে নৈতিক বিচারের অর্থাৎ ভাল-মন্দের বিচার সম্ভব হয় না। মানবেন্দ্রনাথ রায় যখন প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণবাদ দ্বারা নৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেখানে এমন কোনও ইচ্ছার স্বাধীনতা অথবা কর্মপন্থা নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকে না। এই নিয়ন্ত্রণবাদ অনুসারে মানুষের কর্ম করার বা ইচ্ছার কোনও স্বাধীনতা নেই– সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু রায়ের অনুগামীরা বলতে পারেন যে রায় স্বাধীনতাকে এই অর্থে বুঝতে চাননি। তিনি স্বাধীনতা বলতে বোঝেন, "ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশের পথে যা সব বাধা আছে তার ক্রমাপসারণই।"[৬] কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় বিকাশ কী? ব্যক্তির যাবতীয় বিষয় যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে তাহলে তার সম্ভাবনার বিকাশও সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ। কিন্তু বিকাশে প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজের অন্তনির্হিত সম্ভাবনাগুলির প্রকাশ ঘটাতে চায়। এবং বিশেষ করে, একই বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন ব্যক্তিরা নিজের সম্ভাবনাগুলির প্রকাশ ঘটাতে চায় তখন সেখানে সমস্যা হয়। কারণ একই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যক্তি নিজের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি বিকাশের জন্য নিজের নিজের মতো যুক্তির দ্বারা চালিত হতে পারে। যে যুক্তিগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিধ্বনি বলে রায় স্বীকার করেন। ফলে ব্যক্তির নিজস্ব যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে একই কর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদন করলে কারোর কাজকে ভালো এবং কারোর কাজকে মন্দ বলা হয় কীভাবে? আবার একই বিষয়ে কোনও ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ (স্বাধীনতা) ঘটলেও অপর ব্যক্তির ঐ বিষয়ে নিজের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ (স্বাধীনতা) ঘটে না। অথচ তাঁরা

---

[৬] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নবমানবতাবাদ*, অনু- গোপালচন্দ্র দাস, পৃ ৪৮

উভয়েই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী যুক্তি দ্বারা চালিত। তাহলে স্বাধীনতার কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হওয়ার বিষয়টিও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী বলতে হয়। কারণ সেখানে ব্যক্তিও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী যুক্তি দ্বারা চালিত। সমস্যা হল, একজন ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী যুক্তি দ্বারা চালিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে অর্থাৎ নিজের সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায়, আবার অপর ব্যক্তিও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী যুক্তির দ্বারা চালিত হয়ে স্বাধীনতা পায় না। তা কিভাবে সম্ভব? আবার সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শর্তগুলি কি কি হবে সে বিষয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। যেহেতু তাদের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে সেগুলির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। কোনও ব্যক্তি বাক স্বাধীনতাকে প্রয়োজনীয় মনে করতে পারে, কেউ বা শিক্ষার অধিকারকে গুরুত্ব দিতে পারে। বলা যায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজের বিকাশের জন্য নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারী হওয়ায় যৌক্তিক বলতে হয়। এবং যা যৌক্তিক তাকে রায় নৈতিক বলেন। ফলে সেখানে নৈতিক অনুভবের দিকগুলির (সহানুভূতি, আবেগ, অনুশোচনা) গুরুত্ব থাকে না। যার জন্য রায়ের মতবাদ চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদে পরিণত হয়।

তাছাড়া রায় প্রদত্ত নৈতিকতার প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যায় অন্য দুটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। একটি হল 'is' এবং 'ought' এর সমস্যা। এই সমস্যা প্রথম উত্থাপন করেন দার্শনিক হিউম। তাঁর মতে, প্রকৃতিতে যা হচ্ছে 'is' তা থেকে আমাদের কী করা উচিত 'ought' তা নির্ধারণ করা যায় না। যেমন, প্রকৃতিতে সব সময় জীবজন্তু দুর্বলদের মেরে ফেলে—এই প্রকৃত সত্য থেকে আমরা কখনই বলতে পারি না 'দুর্বল মানুষকেও হত্যা করা উচিত'। আবার জি ই মূর প্রদত্ত Naturalistic Fallacy আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভাল" জিনিসকে কেবলমাত্র কোনো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (আনন্দদায়ক,

স্বাস্থ্যকর, উপকারী) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যথার্থ নয়। কারণ কোন জিনিস প্রকৃতিতে আছে মানেই সেটা ভাল এমন বলা যায় না। যেমন, যৌনতা প্রাকৃতিক কিন্তু যে কোনও ধরনের যৌন আচরণকে নৈতিক বলা যায় না।

রায়ের তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণাকে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সমালোচনা করেছিলেন। কারণ জটিল সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ বজায় রাখা যায় না। জটিল সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব না করে উপায় থাকে না। সমাজ একটা সীমা টেনে দেয় বলেই এরূপ স্বাধীনতা আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে। তাই স্বাধীনতাকে বড় করেই পেতে হলে ছোট খাটো সুযোগ সুবিধা ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁর কথায়,

> I am too much of an individualist and believer in personal Freedom to like overmuch regimentation. Yet it seemed to me obvious that in a complex social structure individual freedom had to be limited, and perhaps the only way to read personal freedom was through some such limitation in social sphere. The lesser liberties may often need limitations in the interest of the larger freedom.[৭]

নেহেরু মনে করেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি হল সেখানে সামাজিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য গুরুত্ব পায় না। ব্যক্তির জীবন আপন

[৭] Nehru, J. *Discovery of India*, 'Life's Philosophy', p. 29

ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে বলে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে, সমগ্র সমাজের প্রতি তার কোনও দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে না। তিনি বলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের সামাজিক সত্তাকে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্বকে অত্যন্ত কম গুরুত্ব প্রদান করে। সমগ্র সমাজ সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই গড়ে ওঠে না, কোনও কর্তব্যবোধও থাকে না। ফলে সমগ্র সমাজের সঙ্গে ঐক্যের মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর কথায়

> ...very individualism led them to attach little importance to the social aspect of man, of man's duty to society. For each person life was divided and fixed up. A bundle of duties and responsibilities within his narrow spere in the graded hierarchy. He had no duty to, or conception of, society as a whole, and no attempt was made to make him feel his solidarity with it.[৮]

তাই বলা যায় নেহেরুকৃত সমালোচনা গ্রহণ করলে রায়ের দর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রাধান্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কারণ রায়ের দর্শন অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলে সেখানে সামাজিক মূল্যবোধের অভাব থাকে।

যদিও রায়ের সমর্থকরা বলতে পারেন যে তিনি সামাজিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক মূল্যবোধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। রায়ের মতে, "ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের ভিতর দিয়েই আসে

---

[৮] Ibid, 'The advantage and Disadvantage of an Individualistic Philosophy', p. 95

সমষ্টির কল্যাণ।"[৯] এই সমষ্টি কল্যাণের ভিত্তিরূপে ধর্মীয় পরিধিকে উপেক্ষা করে তিনি মানবিক মূল্যবোধ রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর মনে করেন, রায়ের চরম ধর্মবিরোধী অবস্থান এবং বস্তুবাদী নৈতিকতা অত্যন্ত সীমিত এবং বাস্তবতাবর্জিত। কারণ ভারতীয় সমাজে ধর্ম এক শক্তিশালী নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি যাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। ধর্মকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হলে নৈতিক শূন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়। কেননা ধর্ম মানুষের মধ্যে নৈতিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিক কল্যাণের স্পৃহা সৃষ্টি করে। যার জন্য ব্যক্তি একে অন্যের জন্য কর্তব্য করে। কিন্তু নৈতিকতার ভিত্তি কেবল যুক্তি ও অভিজ্ঞতা নির্ভর হলে তা প্রকৃত অর্থে নৈতিক দায়িত্ববোধ তৈরী করতে পারে না। কারণ নৈতিকতা কেবল যুক্তি ও বিজ্ঞান নয়, সেখানে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধেরও প্রয়োজন যা মানুষের মধ্যে ত্যাগ, সহানুভূতি ও মানবতা গড়ে তোলে। তাই বলা যায় নৈতিকতা আধ্যত্মিকতার ভিত্তিতে গঠিত না হলে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতপক্ষে আম্বেদকর ভারতের জটিল সমাজব্যবস্থার নিরিখে রায়ের মতবাদকে বিচার করতে চেয়েছিলেন। ভারতে জটিল সমাজ ব্যবস্থায় নিহিত রয়েছে বর্ণব্যবস্থা নির্ভর জাতিভেদ ব্যবস্থা। যেখানে মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। সেই পরিস্থিতিতে রায়ের মানবতাবাদী ধারণা কিভাবে ফলপ্রসূ হবে সে সম্পর্কে সংশয় থাকে।

রায় স্বীকৃত গণতন্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বটির নিরিখে রায়ের সমর্থকরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। তাঁদের মতে, এমন সামাজিক বৈষম্যকে রায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা নিরসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলা যায় যে নবমানবতাবাদে

---

[৯] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নবমানবতাবাদ*, অনু- গোপালচন্দ্র দাস, পৃ ৪৮

গণতান্ত্রিক ধারণা ত্রুটিহীন নয়। কারণ রায়ের কাছে গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ সমষ্টিগতভাবে যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক নীতিমালা গঠন করতে পারে। যার সাহায্যে তারা একে অন্যের তথা সামাজিক বিকাশ ঘটাতে পারে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তির জন্মগত অবস্থান তথা ক্ষমতাগুলি (সামাজিক মর্যাদা) গুরুত্ব না দিয়ে বিকাশ সম্ভব হবে কীভাবে? কারণ একটি সমাজে সকল ব্যক্তির বিকাশ সমান হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ তার জন্মগত ভাবে লব্ধ সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতা অনুসারে হয়। আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজে বিকাশ ঘটানোর জন্য যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহিত হয় সেগুলির মধ্যে মতপার্থক্য হলে তার সমাধান কীভাবে সম্ভব? উত্তরে রায় বলেন, এই মতপার্থক্য যুক্তির দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে সিদ্ধান্তটি যুক্তিগ্রাহ্য হবে তাই গৃহীত হবে। কিন্তু তখনই প্রশ্ন ওঠে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত কোনটি সেটা নির্ধারিত হবে কীভাবে? এই নির্ধারণ যদি কোনও গোষ্ঠী, কমিটি বা সংগঠন করে তবে তার সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনা থাকে। সেই মতভেদের সমাধান হবে কীভাবে? এই সকল সমস্যার সমাধান যদি কেবল যুক্তি দ্বারাই হয় তাহলে তা বাস্তবসম্মত বলা যায় না। তিনি যেন বাস্তব বিষয়কে উপেক্ষা করেই আগে থেকেই এমন একটা ব্যবস্থাকে ধরে নিচ্ছেন যেখানে সবাই যুক্তিনিষ্ঠ। সেখানে যেন একটাই যুক্তি থাকে যা গ্রহণযোগ্য—যা প্রকৃত যুক্তি। সেই যুক্তিটি স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে যা বুঝে থাকেন অপর ব্যক্তি তা নাও বুঝতে পারেন। এই বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। ব্যক্তিদের মধ্যে এমন পারস্পরিক বিরোধ যুক্তি দিয়ে সমাধান করা যায় না। তাই বলা যায় রায় নিজেকে বাস্তববাদী দার্শনিক বলে দাবী করলেও বাস্তবতার নিরিখে তাঁর তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি।

রায়ের অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা এবং তাত্ত্বিক রজনী পাম দত্ত সমালোচনা করেছিলে। তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন রায়ের অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব মার্কসবাদের বিরোধী। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং যুক্তির উপর অধিক গুরুত্ব মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর India To-day[১০] গ্রন্থে বলেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে একতার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ভারতে তৎকালীন পরিস্থিতিতে জাতীয় আন্দোলন এবং সামাজিক পরিবর্তন কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে, বরং সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে আসতে পারে। তিনি মনে করতেন, ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষকরা জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এবং তাদের ঐক্যই বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি হবে। কিন্তু রায়ের দর্শন এই বিপ্লবী শ্রেণীচেতনা দুর্বল করে। কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক শ্রেণী ঐক্য দুর্বল হয়ে যায় যা বিপ্লবী রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর। তিনি বলেন, রায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কম গুরুত্ব দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অধিক জোর দিয়েছেন। যার ফলে উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐক্য ভেঙে গিয়ে একটি বিভক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এমন বিভাজন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত শক্ত করে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করে। দত্ত মনে করেন, রায়ের দর্শন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলনীতিকে উপেক্ষা করে। দত্ত তাঁর Problems of Contemporary History[১১] গ্রন্থে বলছেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে, মানুষের ইতিহাস মূলত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস—অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উৎপাদন সম্পর্কই সমাজ

[১০] Dutta, R. Palme. (1940). *India To-Day*. London: Victor Gollancz Ltd

[১১] Dutta, R. Palme. (1963). *Problems of Contemporary History*. London: Lawrence and Wishart

পরিবর্তনের প্রধান চালিকা শক্তি। কিন্তু রায়ের নব মানবতাবাদে ব্যক্তিচেতনা, নৈতিক বিকাশ ও যুক্তিবোধকে সমাজ পরিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসাবে দেখা হয়। রায়ের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ধারণার বিপরীত। কেননা ব্যক্তি-ভিত্তিক নৈতিক চিন্তা শ্রেণী সংগ্রামের বিপরীতে এক আদর্শবাদী ভাবনা, যা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিভ্রান্তিকর। আবার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তু ও চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর সংঘর্ষ এবং পরিবর্তনের অনিবার্যতা—এগুলি বাস্তব সমাজগত পরিবর্তনের ভিত্তি। কিন্তু রায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিবর্তে যুক্তি, আত্মিক বিকাশ ও নৈতিক বিবেচনাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ায় দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যায়। পরিবর্তনকে একটি অভ্যন্তরীণ চেতনার বিষয় বানানোর অর্থ হল বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষনকে অস্বীকার করা। তাই দত্ত মনে করেন, নব মানবতাবাদে রায় মানব প্রকৃতি, নৈতিক বিবেক ইত্যাদির ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে এক আদর্শবাদী মনোভাব পোষণ করেছেন। এই সকল আদর্শবাদী উপাদান বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ নয়। কারণ ঐতিহাসিক বস্তুবাদে ব্যক্তি চেতনার উৎস খুঁজে পায় সামাজিক বাস্তবতায়, ব্যক্তিগত নৈতিকতায় নয়। তাই রজনী পাম দত্ত মনে করেন, রায়ের দর্শন মার্কসবাদী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে আদর্শবাদ, নৈতিকতাবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই কারণে তিনি মনে করেন, রায়ের দর্শন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল নীতিকে উপেক্ষা করে এবং মার্কসীয় বিপ্লবী চেতনার বিরুদ্ধে যায়।

রায় নব মানবতাবাদে মানব প্রকৃতি, নৈতিক বিবেক ইত্যাদির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় ভি বি কার্ণিক তাঁকে আদর্শবাদী এবং ভাববাদী দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কার্ণিক মনে করেন, রায় মার্কসবাদী রূপে বস্তুবাদের সমর্থক হলেও তাঁর বৈপ্লবিক মানবতাবাদকে আদর্শবাদী বলা যায়। নব মানবতাবাদের মাধ্যমে রায় নৈতিকতা

এবং ব্যাক্তিস্বাধীনতার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। যা ঐতিহ্যগত মার্কসবাদী বস্তুবাদ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। কারণ তিনি মানুষের নৈতিক বিবেক, আত্মিক উন্নয়ন ও যুক্তিবোধকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকা শক্তি রূপে দেখেন। যা মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিপরীত। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সামাজিক অস্তিত্ব চেতনা নির্ধারণ করে—অর্থাৎ বস্তুগত বাস্তবতা ও শ্রেণী সম্পর্ক মানুষের চিন্তাভাবনাকে গঠন করে। রায় এই ধারাকে উল্টে দেওয়ার ফলে তা ভাববাদী হয়ে ওঠে। রায় সমাজের রূপান্তরকে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক বিকাশ ও আত্মসংযমের মাধ্যমে সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। তাই কার্নিক মনে করেন, রায়ের এমন দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ পরিবর্তনের বস্তুগত ও সংগ্রামভিত্তিক পথকে অস্বীকার করে এবং সমাজ পরিবর্তনকে মানুষের মানুষের ভাবজগতের ওপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা করে। তাই তিনি রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাববাদী অবস্থান রূপে চিহ্নিত করেন, যা আদর্শবাদী মানবতাবাদের এক রূপ। রায় সামাজিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে অধিক আলোচনা করেন বলে কার্নিক মনে করেন। তিনি বলেন, সমাজ বিশ্লেষণ করতে হলে উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণী দ্বন্দ্ব, বস্তুগত কাঠামো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, ব্যক্তির চেতনা নয়। তাই রায়ের দর্শনকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে ভাববাদী বলা যায় এবং আদর্শবাদী দর্শনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উপসংহার

আমাদের সমগ্র আলোচনায় লক্ষ্য করলাম যে রায় তাঁর নবমানবতাবাদের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদী মানবতাবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বস্তুবাদ ও মানবতাবাদ দুটি আপাত বিরোধী বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। বস্তুবাদের যান্ত্রিকতাবাদ এবং মানবতাবাদের মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে রায় তাঁর তত্ত্বে এক সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বস্তুবাদকে ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে নৈতিকতার মানবকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি প্রচলিত মার্কসবাদী এবং উদারনৈতিক নৈতিকতার ধারণাকে যথোপযুক্ত নয় বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। রায় মনে করেছিলেন, উদারনৈতিক মতবাদে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। সেখানে মানুষ কোনও না কোনও অতিজাগতিক বিষয়ের অধীন। আবার মার্কসীয় মতাদর্শ অনুসারে মানুষ কোনও অতিজাগতিক বিষয়ের অধীন না হলেও বস্তুগত উৎপাদন ব্যবস্থার বা যন্ত্রের অধীন। তাই প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যায় ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন গুরুত্বহীন। অথচ স্বাধীনতার ধারণাই মানবতাবাদের প্রধান উপজীব্য। রায় মনে করেন কোনও ভাববাদী তত্ত্বই মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে সক্ষম নয়। তাই তিনি বস্তুবাদকে অবলম্বন করে প্রকৃত মানবতাবাদী তত্ত্ব কীভাবে গঠন করা যায় তা প্রতিপাদন করার প্রয়াস করেছেন।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখব রায় তাঁর সমসাময়িক বস্তুবাদী মানবতাবাদের তত্ত্বের (যা বস্তুতপক্ষে মার্কসীয় তত্ত্ব) সীমাবদ্ধতা কতটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই লক্ষ্যে আমরা আলোচনা করব মার্কসীয় মানবতাবাদের কোন কোন সীমাবদ্ধতাকে তিনি প্রকৃত মানবতাবাদের পরিপন্থী বলে মনে করেছেন। সেই

সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার জন্য মার্কসীয় তত্ত্বের কোন দাবীগুলি বর্জন করতে চেয়েছেন; এবং মার্কসবাদের বিকল্প রূপে তাঁর তত্ত্বে কোন ধারণার উপর জোর দিতে চেয়েছেন। পরিশেষে আমরা দেখব মানবতাবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি রায় তাঁর তত্ত্বের ভিত্তি রূপে স্বীকার করতে চেয়েছেন, সেগুলি স্বীকার করার পথে রায়ের তত্ত্বে কোন কোন পূর্বস্বীকৃতি বাধা সৃষ্টি করে এবং রায়ের তত্ত্বে কীধরণের পরিমার্জন করলে বিকল্প বস্তুবাদী মানবতার তত্ত্ব গঠন করা যেতে পারে।

রায়ের মতে মার্কসীয় মানবতাবাদের সীমাবদ্ধতা

রায়ের মতে, প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যায় ব্যক্তির স্বাধীনতা যথার্থভাবে স্বীকৃত নয়। সেখানে শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যায় সমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্ষেত্রে সেখানে সর্বহারার বিপ্লব অপরিহার্য। কিন্তু রায় এমন ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, হিংসাত্মক বিপ্লব কেবল নতুন শোষক তৈরী করতে পারে যেখানে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। সেখানে বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় একনায়কতন্ত্রের দিকে পরিচালিত হয়েছিল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্বিত হয়েছিল। রায় শ্রেণীসংগ্রামের বিপরীতে শ্রেণী সহযোগিতার কথা বলেন। তাঁর মতে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, আলোচনার মাধ্যমে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তাছাড়া মার্কসীয় ব্যাখ্যায় যে সাম্যবাদী ব্যবস্থা স্বীকৃত হয় সেখানে রাজনৈতিক দল বা রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ব্যক্তির স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। ফলে রায় বলেন, এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় অর্থাৎ পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ ঘটলেও ব্যক্তির

স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকৃত হলে প্রকৃত মানবতার অস্তিত্ব থাকে না।

রায় বলেন, মার্কসবাদী তত্ত্বে একটি 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতার' ধারণা নিহিত রয়েছে। যে ধারণাটি জগৎ তথা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রায় মনে করেন, ওই ঐতিহাসিক ধারণার মধ্যে দ্বান্দ্বিক-সম্পর্ক ভিত্তিক একটি পূর্বনির্ধারণবাদ নিহিত থাকে। যদিও ওই তত্ত্বের দ্বারা মার্কসের অভিপ্রেত সামাজিক অবস্থার উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের উপায় (new means of production) কীভাবে এবং কেন তৈরী হয় তা ঐতিহাসিক অনিবার্যতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পতনের অনিবার্যতার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অবির্ভাব ঘটবে—এটি মার্কসীয় অনিবার্যতার তত্ত্বে দাবী করা হয়। অথচ একই সঙ্গে সেখানে বলা হয় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের উৎখাতের জন্য এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের প্রয়োজন। এমন দুটি দাবী রায়ের কাছে স্ববিরোধী ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। কারণ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা-প্রসূত অংশগ্রহণ ছাড়া সফল বিপ্লব সম্ভব নয়। রায়ের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ স্বীকার করলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ঐতিহাসিক অনিবার্যতার মধ্যে বিরোধ ঘটে। তাই তিনি বলেন, ইতিহাসের নির্ধারণবাদী তত্ত্ব এবং স্বাধীনতাকে এক আসনে বসান সম্ভব নয়।

রায় উল্লেখ করেন যে, প্রচলিত মার্কসীয় ব্যাখ্যায় সমাজের সমস্ত পরিবর্তন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বলা হয়, সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণী সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোই মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি, ধর্ম, এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কিন্তু রায় এমন ধারণার বিরোধিতা

করে মানুষের মন ও চিন্তার গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাঁর মতে, মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় মানুষের সৃজনশীলতা, মননশীলতা এবং সচেতনতার ভূমিকা যথার্থভাবে স্বীকৃত নয়। রায় অর্থনীতিকে কেবল যন্ত্ররূপে দেখেছিলেন যা মানুষের প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হয়েছে। মানুষের ধারণা, জ্ঞান এবং মূল্যবোধ তাই অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এগুলোর নিজস্ব গতি ও প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেন, সমাজের এক অংশরূপে সমাজের কোনও কোনও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকা থাকলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ভূমিকা নেই, এবং সব ক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনীতিই পরিবর্তনের নির্ধারক হয় না। রায় মনে করিয়ে দেন যে মার্কস পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনগুলি মার্কসীয় নিয়ম অনুসারী হয়নি।

রায়ের মতে, মানবমনের ক্রিয়া পদ্ধতি এবং ধারণা ও তত্ত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রায় মার্কসীয় ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করেন কারণ সেখানে দাবী করা হয় যে ধারণা (ideas) সব সময়ই কোনও না কোনও শ্রেণী দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু রায় মনে করেন যে সব ধারণাই মানব মনে পূর্ববর্তী ধারণাক্রমে সৃষ্ট। কোনও বিশেষ শ্রেণী কোনও ধারণার জন্ম দিতে পারে না। এই ধারণাগুলি কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর কুক্ষিগত না হয়ে সমগ্র মানব জাতির মননের বিষয় হয়ে থাকে। এই ধারণাগুলি শ্রেণী-অবস্থান দ্বারা স্থিরিকৃত নয়। সভ্যতার সূচনাকাল থেকে বিবর্তনের ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় ধারণা অনবরত প্রবহমান। ধারণাগুলি প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। এই ধারণাগুলির মধ্যে কোনও কোনও সময়ে দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্ক থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতার সম্পর্ক রয়েছে। তাই রায় ধারণার দ্বান্দ্বিক গতিশীলতা অস্বীকার করে ধারণার ধারাবাহিকতার ওপর জোর দেন।

প্রচলিত মার্কসবাদ নৈতিকতা বা মূল্যবোধকে কোনও চিরন্তন বা সার্বজনীন ধারণা বলে স্বীকার করে না। তাকে সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা নির্ধারিত বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সমাজে যে শ্রেণী ক্ষমতায় থাকে, তাদের স্বার্থ অনুযায়ী নৈতিকতার ধারণা গড়ে ওঠে। শাসক শ্রেণীর নৈতিকতাকে বস্তুগত অবস্থার উপজাত (epiphenomenon) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে সেখানে মানুষের চেতনা, ধারণা এবং নৈতিকতা সমস্তই বস্তুগত জগৎ ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। তাই এই তত্ত্বে নৈতিকতার এক যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় বলে রায় মনে করেন। কিন্তু রায় বলেন, নৈতিকতা কেবল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের মধ্যে সহজাত যুক্তি এবং নৈতিক চেতনার একটি স্বাভাবিক উৎস রয়েছে, যা জৈবিক বিবর্তন থেকে উদ্ভূত। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, এবং সামাজিক বন্ধনের যে প্রবণতা দেখা যায় তা কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলাফল নয়। বরং তা মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত। তিনি মনে করতেন নৈতিকতা মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এটি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ভিত্তিক বিকাশের অংশ। সেইজন্য তিনি মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেছিলেন। কারণ মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যবোধের পিছনে কেবল বস্তুগত কারণই নয়, মানুষের ভিতরের যুক্তি, বিবেক এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভূমিকা থাকে। রায় মনে করেন, মার্কসবাদে মানুষের এই অভ্যন্তরীণ এবং আত্মিক দিক উপেক্ষিত হয়েছে, যা নৈতিকতা ও মানবতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

মার্কসবাদে ব্যক্তির থেকে শ্রেণীর বা সমষ্টির প্রাধান্য বেশী হওয়ায় ব্যক্তির নৈতিকতা শ্রেণীর বা সমষ্টির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র সত্তার উপর জোর দেন এবং সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিকে ব্যবহার করা মানবতার বিরোধী বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং তার

কর্মের দায়বদ্ধতা মেনে নিতে সক্ষম। তাই রায় নৈতিকতাকে কেবল শ্রেণীস্বার্থ রূপে নয় বরং ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, যুক্তি এবং স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

মার্কসবাদী সমস্যার উত্তরণে রায়ের মানবতাবাদী প্রস্তাব

"মানুষ তার ভাগ্যের নিয়ন্তা"—এই বিশ্বাস থেকে রায়ের নবমানবতাবাদী দর্শনের যাত্রা শুরু হয়েছে। যে বিশ্বাস মানুষের কর্মক্ষমতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। নবমানবতাবাদ মৌলিকভাবে তিনটি প্রধান ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যথা, যুক্তি, নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা। নবমানবতাবাদের ২২টি থিসিসের মূল ধারণা হল—রাজনৈতিক দর্শনকে এমন এক বিশেষ মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করা উচিত যেখানে ব্যক্তিকে সমাজের পূর্বে বলে মনে করা হয়। কারণ স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তিরাই উপভোগ করতে পারে। তাই স্বাধীনতাকেই তিনি সকল মানবীয় প্রচেষ্টার উৎস রূপে গণ্য করে তাকে সার্বজনীন আদর্শ বলে স্বীকার করেন। এই আদর্শকে তিনি বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন। রায় আধুনিক বিজ্ঞানকে অনুসরণ করে বলেন, মানুষ চেতনার অধিকারী হলেও তার উৎপত্তি জড় জগতের পটভূমিতেই। তাই মানুষকে তিনি জড়-সৃষ্ট বিষয় তথা প্রাকৃতিক (natural) বিষয় বলেন। সেজন্য তিনি মানুষের শক্তি ও আচরণের জন্য কোনও অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেননি। এই মানুষ জৈবিক উত্তরাধিকার সূত্রে নীতিবোধের অধিকারী হয়ে থাকে। তাই নীতিবোধ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কোনও রহস্যময়, স্বর্গীয় বিধানের প্রয়োজন নেই। মানুষের নৈতিকতাবোধ ক্রমবিবর্তনের ফসল। এই নৈতিকবোধ বা নীতির ভিত্তি হল যুক্তি (বুদ্ধিবৃত্তি)। এই বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই মানুষ একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তাই রায় যুক্তির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কারণ যুক্তির ভিত্তিতে গঠিত সমাজ নীতিসম্মত হবে।

রায়ের মতে, মানুষ যুক্তিবাদী কারণ প্রাকৃতিক জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার পটভূমিতে মানুষের উদ্ভব হয়। অভিযোজনের সময় মানুষ ঐ নিয়মগুলি অন্তঃস্থ করে। তাই যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই অন্তর্নিহিত যুক্তিই মানুষের নীতির উৎস। এইভাবে রায় বস্তুবাদের মাধ্যমে মানুষকে স্বেচ্ছায় নীতিবান এক সত্তা রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাই তিনি নৈতিক রাজনীতির পক্ষে সংগঠিত গণতন্ত্রের ধারণার ওপর জোর দেন। রায় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন বলে তার পরিবর্তে দলবিহীন গণতন্ত্রের পক্ষে সাওয়াল করেন। তিনি বলেন, ক্ষমতা সর্বদা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এবং জনগণের জন্য তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার উপায় ও পদ্ধতি থাকবে। তাই প্রচলিত মার্কসবাদের সাম্যবাদী ধারণা এবং পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচনার দ্বারা তিনি সংগঠিত গণতন্ত্রের ধারণা প্রদান করেন। রায় মনে করেন, যদি ব্যক্তিই সমাজের চূড়ান্ত একক হয় তাহলে প্রকৃত গণতন্ত্রে ব্যক্তিদেরই ক্রমাগত, কার্যকর ক্ষমতা প্রয়োগ নিশ্চিত করা দরকার। কোনও সংসদীয় প্রতিনিধি বা দলীয় কাঠামোর মাধ্যমে নয়। রায়ের দাবী, তাঁর তত্ত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণে সাহায্য করে, এবং তৃণমূল স্তরের ব্যক্তির অংশ গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ নাগরিক নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দেয়। রায়ের এই ধারণা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং কার্যক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো সরাবরাহ করে। তাই রায়ের প্রদত্ত ধারণাটি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র এবং অপর্যাপ্ত উদারগণতন্ত্রের বিপরীতে একটি বিকল্প প্রস্তাব করে যার লক্ষ্য এমন এক সমাজ তৈরী করা যেখানে ব্যক্তি রাজনৈতিক ও দার্শনিক উভয় দিক থেকেই তাদের ভাগ্যের প্রকৃত কর্তা রূপে বিবেচিত হতে পারে। এবং সেখানে সার্বভৌম জনগণের দ্বারা সকল ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হতে পারে।

রায় দাবী করেন, ১. সমাজের পূর্বে ব্যক্তির অবস্থান এবং ২. স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তিরাই উপভোগ করতে পারে। রায়ের এমন দাবী সরাসরি ব্যক্তিকে সমষ্টি বা শ্রেণীর অধীনস্থ করার মার্কসবাদী প্রবণতার বিরোধিতা করে এবং তা সংশোধন করতে চায়। যুক্তি ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়ে রায় মানুষের কর্মক্ষমতাকে পুনরায় কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। যা মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব দ্বারা অবমূল্যায়িত বা উপেক্ষিত হয়েছিল। এই ধারণার জন্য তিনি এক শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করেন, যার ভিত্তি ছিল "মানুষ তার ভাগ্যের নির্মাতা"। রায় মনে করেন এই ধারণাটি মার্কসের মূল উদ্দেশ্যের সুপ্ত মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

আবার রায় সামাজিক শৃঙ্খলা বা সামাজিক বিপ্লবে নৈতিকতার প্রয়োজনীতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরাসরি মার্কসীয় ব্যাখ্যার 'দূর্বল নৈতিক ভিত্তি'কে চিহ্নিত করে সেটির সমাধান করেছেন। তিনি মানুষের মূল্যবোধ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন যা মানব সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। এই নৈতিক কাঠামোয় মানব সত্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য রূপে যুক্তি ভিত্তিক নৈতিক সামর্থ্যের স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক বা বস্তুবাদী নিয়ন্ত্রণবাদের উর্দ্ধে যাওয়ার প্রয়াস। এ ব্যাখ্যায় ব্যক্তির সচেতন নৈতিক পছন্দের অধিকার গুরুত্ব পায়।

রায় মানুষের কর্মক্ষমতা এবং নৈতিক বিবেচনার সঙ্গে বস্তুবাদের সমন্বয় করেছেন। তিনি মার্কসীয় যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদের বিপরীতে মানসিক কার্যকলাপ এবং মানব চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকার করেন। এই কারণে রায় মার্কস স্বীকৃত বস্তুবাদকে

খারিজ করে একটি বিকল্প বস্তুবাদের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন যা তাঁর মতে মানবতাবাদের যথাযথ ভিত্তি গঠন করতে পারে।

মার্কসীয় বস্তুবাদের প্রধান ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে সমাজের সকল ঘটনা অন্তর্নিহিত বস্তুগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিকশিত হয়। হেগেলের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের 'দ্বান্দ্বিক' দিকটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কস একে বস্তুগত প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেন। আবার ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল ইতিহাস ও সামাজিক পরিবর্তনের অধ্যয়নে মার্কসের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ। যেখানে বলা হয়, মানুষ তাদের বস্তুগত অবস্থা এবং উৎপাদিত পণ্য থেকে অর্থ লাভ করে এবং সেই সম্পর্কগুলি স্থির নয়, বরং গতিশীল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ধারণা হল 'অর্থনৈতিক ভিত্তি' (উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক) 'উপরিকাঠামো'কে (সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ এবং চেতনা) নির্ধারণ করে।

অন্যদিকে রায় বস্তুবাদকে বোঝাতে 'ভৌত বাস্তববাদ' (physical realism) শব্দটি বলতে বেশী পছন্দ করতেন। যা ঐতিহ্যবাহী মার্কসীয় বস্তুবাদ থেকে তাঁর ধারণাকে পৃথক করে। এটি মানুষ ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক দর্শন। যেখানে বস্তুকে বাস্তব এবং মনকে বস্তুর উচ্চস্তরের বিকাশের ফল রূপে দেখা হয়। সকল অস্তিত্বের উৎস রূপে বস্তুকে স্বীকার করা হয়। তবে তিনি বস্তুবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন দ্বন্দ্বতত্ত্ব ছাড়াও পৃথক ভাবে বস্তুবাদ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর মতে, "There is no necessary connection between dialectics and Materialism. Marx arbitrarily hitched the Hegelian 'fever

fantasy' on to Materialism"[১] রায় মনে করেন মার্কসবাদের গোঁড়া সমর্থকগণ আঠারো শতকের 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' থেকে মার্কসবাদকে আলাদা করার চেষ্টা করলেও সেখানে ইতিহাস বোধের অভাব থেকে গেছে। কারণ মার্কস কেবল এপিকিউরাস থেকে বস্তুবাদের ধারণা গ্রহণ করেননি, বরং অন্যান্য বস্তুবাদী দার্শনিক যেমন, হলবাখ, দিদেরো প্রমুখ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই রায় বলেন, "Holbach's System of Nature, still remains the fundamental treatise of materialism, and the relation between Diderot and Marx is closer than that between Marx and Hegel."[২] রায়ের মতে, মার্কস হেগেলীয় শিক্ষার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে আঠারো শতকের যান্ত্রিক বস্তুবাদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলেন এবং দ্বান্দ্বিকতার আদর্শবাদী ধারণার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি হেগেলীয় ঐতিহ্যকে মার্কসবাদের দুর্বল দিক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। রায়ের কথায়, "The Hegelian heritage, indeed, is the weak spot of Marxism. The simplicity and scientific soundness of materialism are marred by making its validity conditional upon dialictics."[৩]

আবার তিনি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদের বিপক্ষে বলেন, ধারণাগুলি একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া হলেও, একবার গঠিত হলে তাদের নিজস্ব যুক্তি এবং গতি থাকে। তাঁর মতে, চিন্তা মানুষের উৎপাদিত সবচেয়ে বিপ্লবী পণ্য। তাই তিনি দাবী করেন, 'একটি সামাজিক বিপ্লবের আগে একটি দার্শনিক বিপ্লব অবশ্যই প্রয়োজন'[৪]। এই দার্শনিক

---

[১] Roy, M.N., "Editorial Notes", *The Marxian Way*, Vol. I, No 4, 1946-47, p. 364

[২] Roy, M.N., "Editorial Notes'', Vol. I, No. 3, 1946, p. 274.

[৩] Ibid, p. 274

[8] Principles of New Humanism, Thesis 15.

বিপ্লবের ফলে ধারণাগুলি কেবল বস্তুগত অবস্থার প্রতিফলন না হয়ে একটি স্বতন্ত্র রূপান্তরকারী শক্তি রূপে গণ্য হয়। তাই রায় নৈতিকতার আপেক্ষিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে বিষয়গত ভিত্তি প্রদানের চেষ্টা করেছেন। যদিও অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত মার্কসবাদের আপেক্ষিক নৈতিকতার ধারণার সঙ্গে রায়ের নৈতিকতার ধারণার সাযুজ্য দেখিয়েছেন,[৫] কিন্তু আমরা অধ্যাপক দত্তগুপ্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারছি না। আমরা আমাদের গবেষণার বিভিন্ন অংশে দেখানো চেষ্টা করেছি কিভাবে রায় নৈতিকতার বিষয়গত এবং সার্বিকতার ভিত্তি প্রদান করছেন।

তিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণাকে বাতিল করেন। স্পষ্ট করে বললে তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখান করেন। তিনি নব মানবতাবাদের বাইশটি সুত্রের পঞ্চম সূত্রে বলেছেন,

> The economic interpretation of history is deduced from a worng interpretation of Materialism. It implies dualism, where as Materialism is a monistic philosophy. History is determined process; but there are more than one causative factors. Human will is one of them, and it cannot always be referred to any economic incentive.[৬]

তাই তিনি আবার চতুর্থ সূত্রে বলেছেন, ‘ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদ ইচ্ছার স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। বস্তুত, যে সব শক্তির দ্বারা ইতিহাসের গতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে

---

[৫] *জিজ্ঞাসা*, ত্রিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১২-২০১৩, পৃ ৩২৮

[৬] Roy, M.N.& Spratt, Philip. *Beyond Communism*, Thesis V, p. 153

নির্ধারিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে মানুষের ইচ্ছা অন্যতম'। রায়ের এমন দাবী স্পষ্ট করে যে একটি নিয়ম শাসিত মহাবিশ্বের মধ্যে মানবীয় কর্মক্ষমতার স্থান থাকতে পারে। কারণ ইতিহাস ও সমাজের যে নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন তা মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা ও নৈতিক বোধকে উপেক্ষা করে চলে না, বরং তার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। তিনি ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রণবাদকে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মেনে নেন যেখানে সমাজ ও ইতিহাসের বিকাশ একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও অনিবার্য প্রক্রিয়া বলে গণ্য হয়। রায়ের কথায়, "history follows certain objective laws, but is made by men."[৭] অর্থাৎ ইতিহাস বস্তুগত নিয়ম অনুসরণ করলেও সেই ইতিহাস গঠন করে মানুষ নিজেই– তার ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, নৈতিকতা ও চিন্তার মাধ্যমে। সেই জন্য রায় মানুষকে নিছক নিয়মের পুতুল বলে স্বীকার করেননি। মানুষ যদি নিয়মের পুতুল হয় তাহলে নৈতিকতা, দায়িত্ব, সমাজসংস্কার– সব অর্থহীন হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন, "Determinism is not fatalism, Human will is a factor in history."[৮] ব্যক্তির ইচ্ছা ইতিহাস পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে বলেই রায়ের দর্শনে মৌলিক উপাদান রূপে নৈতিকতার গুরুত্ব আছে। তিনি বলেন, নৈতিকতা কোন ঐশ্বরিক অনুষঙ্গ নয়, বরং 'যুক্তিপূর্ণ' এবং চেতনার স্তরেও এক যান্ত্রিক জৈবিক কার্যকারিতা। নৈতিকতা হল বিবেকের প্রতি আবেদন, যা পরিবেশ সম্পর্কে একটি সহজাত সচেতনতা এবং প্রতিক্রিয়া। মানব প্রকৃতিতে এই ভিত্তি নৈতিকতাকে অন্তর্নিহিত এবং সার্বজনীন করে তোলে যা কেবল শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন নয়।

---

[৭] Roy, M.N., *Reason Romanticism and Revolution*, p. v-vi

[৮] Roy, M.N, *New Humanism*, p. 34-35

সুতরাং বলা যেতে পারে রায়ের নবমানবতাবাদের প্রয়োজনীয় দার্শনিক ধারণাগুলি— ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যুক্তি, নৈতিকতা এবং বাস্তবতার এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বীকারের মাধ্যমে র‍্যাডিক্যাল গণতন্ত্রের একটি মডেল তৈরী করে যা বাস্তব পরিস্থিতি এবং মানব মনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে। এই কাঠামো মানবতাকে প্রাধান্য দিয়ে সক্রিয় বিশ্ব গঠনে প্রয়াসী হয় যেখানে শোষণ, ক্ষমতাহীনতা এবং নৈতিক শূন্যতার সমস্যাগুলির সমাধান হয়।

এই আলোচনার নিরিখে যে কোনও ব্যক্তি রায়কে মার্কস বিরোধী বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু রায় নিজেকে মার্কস বিরোধী বলে মনে করতেন না। তিনি বলেন, তাঁদের রাজনীতির দার্শনিক স্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হয়েছে মার্কস প্রদত্ত ফয়েরবাখ সম্বন্ধীয় একাদশতম সূত্র থেকে 'আজ পর্যন্ত দার্শনিকেরা বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন; এখন তাঁদের উচিত এর পুনর্গঠন করা'। তাই রায় মনে করতেন যে রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে কিছু সুস্পষ্ট দার্শনিক নীতি গ্রহণ মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি নয়। এমনকি ১৯৪৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে রায় সর্বসমক্ষে দাবী করেন যে 'এখনও পর্যন্ত মার্কসবাদ আমাদের আদর্শ।'[৯] কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তিনি মার্কসবাদের কঠোর সমালোচনা করলেও মার্কসবাদী কোন আদর্শকে গ্রহণ করতে চাইছেন? উত্তরে বলতে হয়, প্রকৃতপক্ষে রায় মার্কসবাদের নৈতিক আবেদনের দ্বারা অধিক প্রভাবিত ছিলেন। তিনি মনে করেন, মার্কসবাদে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে দাবী করা হয় সেটি মূলত নৈতিক দাবী। তাই তিনি মার্কসবাদের বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা করলেও মার্কসের মধ্যে যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটিকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

---

[৯] Roy, M.N. and Spratt, Philip, *Beyond Communism*, p. 44

আসলে রায় মার্কসবাদের "praxis" এর ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। প্রাক্সিস বলতে চিন্তা ও কর্মের একতাকে বোঝায়। অর্থাৎ শুধু তত্ত্ব নয়, সেই তত্ত্বকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাই আসল উদ্দেশ্য। মার্কস একে বলেছিলেন, "Philosophers have only interpreted the world in various ways; the point, however, is to change it."[১০] মার্কসের এই বক্তব্য সরাসরি প্রাক্সিসকে সমর্থন জানায়। রায় মার্কসের এই বক্তব্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন বলে *Beyond Communism* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রায় বলেন মতাদর্শ বাস্তব জীবনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসে। এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও তত্ত্বই কার্যকর নয়। একইসঙ্গে ইতিহাসের রূপান্তর মানুষের সচেতন সক্রিয় কার্যকলাপের ফল বলে মনে করেছিলেন। রায় মনে করেন, মার্কস মানবতাবাদী সুলভ আবেগপ্রবণ মনের অধিকারী ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন কল্পনাপ্রবণ এবং রোমান্টিক।[১১] কারণ বিপ্লবের উপর মার্কসের গভীর আস্থা ছিল। এই বিপ্লবের ধারণাকেই রায় রোমান্টিক বলেন। বিপ্লবের মূল স্বীকার্য বিষয় হল— মানুষ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম। মানুষের সৃষ্টিশীলতায় মার্কসের এমন আস্থাকে রায় গ্রহণ করেন। কারণ এই সৃষ্টিশীলতাই সমাজ বিবর্তনের গতিবেগ বৃদ্ধি করে বিপ্লব ঘটায়। তাই রায়ের মতে, মার্কস মানবতাবাদী ছিলেন। কারণ মার্কসের বৈপ্লবিক তত্ত্বের মূলে আছে গভীর নৈতিক আবেদন। এমনকি মার্কসের সমালোচকগণ তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা ও সততার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। উচ্চনীতিবোধ ও অন্যায়ের প্রতি গভীর বিরাগ না থাকলে শোষিত অত্যাচারিতের পক্ষে থেকে এমন একক সংগ্রাম করে যাওয়া মার্কসের

---

[১০] Marx, Karl, *Theses on Feuerbach*, Thesis no XI.

[১১] Roy, M.N., *Reason, Romanticism and Revolution*

পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই রায় মার্কসের এমন নৈতিক ভাবধারা সম্পন্ন মানবতাবাদী স্পিরিটকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নব মানবতাবাদের ২২তম সূত্রে বলছেন,

> Radicalism starts from the dictum that "man is the measure of everything" (Protagoras) or "man is the root of mankind" (Marx), and advocates reconstruction of the world as commonwealth and fraternity of free men, by the collective endeavour of spiritually emancipated moral men.[১২]

নবমানবতাবাদের লক্ষ্য পূরণের প্রতিবন্ধকতা

তবে মার্কসীয় সমস্যার সমাধান রূপে তিনি নবমানবতাবাদী তত্ত্ব প্রদান করলেও সেখানে কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা রয়ে গেছে। যেমন, প্রচলিত মার্কসীয় দার্শনিক সমস্যায় স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই তিনি স্বাধীনতার ধারণাকে গ্রহণ করে নবমানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন ওঠে, তিনি স্বাধীনতা বলতে কী বুঝিয়েছেন? রায় উত্তরে বলেন, স্বাধীনতা হল "ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের পথে যে সকল বাধা রয়েছে তার ক্রম অপসারণ।"[১৩] কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের জানা প্রয়োজন 'বিকাশ' বলতে তিনি কী বুঝছেন? কেননা রায় যদি সমগ্র কিছু অর্থাৎ ব্যক্তির যাবতীয় বিষয়াদি প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা সংঘটিত বলে মনে করেন তাহলে বিকাশও প্রাকৃতিক নিয়মের অংশ রূপে বিবেচিত হয়। আবার, ব্যক্তির

[১২] Roy, M.N. & Spratt, Philip. *Beyond Communism*, p. 126

[১৩] Principles of New Humanism, Thesis 3.

যাবতীয় বিষয়াদি যদি প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? ব্যক্তির পছন্দের জায়গা কোথায়? আমরা জানি সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাগুলির বিকাশ ঘটাতে চায়। তাহলে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যখন ব্যক্তিরা নিজেদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে চাইলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা থাকে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হবে কীভাবে? যদিও রায় সমস্যার সমাধান রূপে বুদ্ধিবৃত্তির বা যুক্তির কথা বলেন তা কিন্তু যথেষ্ট নয়। কারণ তাঁর কাছে যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিধ্বনি মাত্র। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিহিত যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিধ্বনি হলে সেটি নির্ধারণবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে ব্যক্তির পছন্দের জায়গা থাকে না। আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই নিজ নিজ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটায় তাহলেও সমস্যা থেকে যায়। কেননা বুদ্ধিবৃত্তি যদি জৈব বিবর্তনের ফল হয় তাহলে একই বিষয়ে কিছু ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটায় এবং কিছু মানুষ নিজস্ব সম্ভাবনার প্রকাশে অপারগ হয় কেন? একই নিয়ম বা নীতি অনুসরণ করে কেউ নিজের লক্ষ্য লাভ করতে পারলেও অপরে সেই লক্ষ্য লাভ থেকে বঞ্চিত হয় কেন?

তাছাড়া রায়ের নৈতিক ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি রয়ে গেছে। তিনি মনে করেন, নৈতিকতা হল বিবেকের অনুমোদন সাপেক্ষ যা পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা থেকে এবং পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। নৈতিকতা হল বিবেকের যান্ত্রিক, জৈবিক ক্রিয়া যা যুক্তির পথ অনুসরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্মেষিত হয়। রায় বলেন,

> ...morality is an appeal to conscience, and conscience is instinctive awareness of, and reaction to the environment.

> It is a mechanistic biological function on the level of consciousness. Therefore, it is rational.[১৪]

অর্থাৎ রায় নৈতিকতাকে যৌক্তিকতার বা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিবেকের সিদ্ধান্ত যদি যান্ত্রিক এবং সহজাত সচেতনতা হয় তাহলে তা যৌক্তিক হয় কীভাবে? কোনও কিছু সহজাত হওয়া এবং কোনও কিছু যৌক্তিক হওয়া এক বিষয় নয়।

রায় নৈতিকতাকে ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃতিক ভিত্তির সাহয্যে ব্যাখ্যা না করে তার প্রকৃতিবাদী ও মানবকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন, নৈতিকতা যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও মানব সমাজের প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিকতার উদ্ভব মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা ও সমাজ জীবনের বাস্তব চাহিদা থেকে— তা কোনও ঈশ্বর বা ধর্ম থেকে উদ্ভূত নয়। রায়ের এমন দাবী প্রকৃতিবাদী দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু রায় ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না সেহেতু নৈতিকতার জন্য তিনি যুক্তিবোধ, মানব প্রেম ও সমাজজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন। রায়ের কথায়,

> The realisation of a secular rational morality opens up a new perspective before the modern world...It must be realised that human existence is self-contained and self sufficient; and that therefore, man can find himself the power to work out his destiny, to make a better world to live in.[১৫]

---

[১৪] Roy, M.N.& Spratt, Philip. *Beyond Communism*, Thesis 13, p. 156

[১৫] Roy, M.N., *Reason Romanticism and Revolution*, P. V

রায়ের এই কথাগুলি প্রকৃতিবাদী সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। তাই রায় প্রকৃতিবাদ নির্ভর নৈতিকতা তথা মানবতাবাদকে সমর্থন করেছেন এমন দাবী করা যায়। সেজন্য তিনি তাঁর দর্শনকে নতুন নামে অভিহিত করতেও চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়,

> As regards the substitution of the term Materialism by another,...But it has not been possible to find a more appropriate term. Terms like Monistic Naturalism or Physical Realism may be considerd.[১৬]

রায় তাঁর প্রদত্ত নৈতিকতার ব্যাখ্যায় ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে বলে দাবী করেছেন। সেই সঙ্গে মার্কসের তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা ছিল না বলে রায় মনে করেছিলেন। কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় যে রায় মার্কসীয় নৈতিকতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিলেও তাঁর মতবাদটি পুনরায় যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ বা নিয়ন্ত্রণবাদে রূপান্তরিত হয়। কারণ সমস্ত কিছু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চালিত হলে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। নৈতিকতার ভিত্তি রূপে রায় বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করেন। বুদ্ধিবৃত্তি হল প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিধ্বনি মাত্র। ফলে বলা যায় বস্তুবাদের (মার্কসীয়) যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদের সমস্যাকে অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি নৈতিকতার যে প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেই ব্যাখ্যাও পুনরায় যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবাদে পরিণত হয়েছে। রায় বলেন, “শূন্য থেকে মানুষের আবির্ভাব হয়নি। বিশ্বজগতের বাস্তব পটভূমিতে জৈবিক বিবর্তনের নানা স্তরের ভিতর থেকে মানুষের উদ্ভব হয় বলেই মানুষের মন, বুদ্ধি, ইচ্ছা–

---

[১৬] Roy, M.N., *New Humanism*, p. 48-49

সব কিছুই বস্তু জগতের এক অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই বস্তু জগত নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হওয়ায় মানুষের অস্তিত্ব, বিবর্তন, আবেগ, ইচ্ছা, চিন্তা—সব কিছুই বস্তুজগতের নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন। তাই মানুষ যুক্তিবাদী। বিশ্বজগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্যতান মানবীয় যুক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র।”[১৭] কিন্তু মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে নৈতিকতার ভিত্তি বললে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

একথা সত্য যে অনেক দার্শনিকই মনে করেন নিয়ন্ত্রণবাদ বা নির্ধারণবাদ ও ইচ্ছার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। তবে সেখানে নিয়ন্ত্রণবাদ বলতে বোঝানো হয় জগতের কোনও ঘটনাই অকারণ নয়। জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত কোনও না কোনও কারণের দ্বারা জগতের প্রতিটি ঘটনা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড বলেন, মানুষের সকল কর্মপ্রবৃত্তির মূলে কোনও না কোনও কারণ থাকে। সেই কারণ কোনও সময় সজ্ঞান মনের, আবার কখনও মনের নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত কামনা বাসনা হতে পারে। কিন্তু কারণ স্বীকার করা সত্ত্বেও কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পাদনে ব্যক্তির ভূমিকা স্বীকার করা যায়। নিয়ন্ত্রণবাদী ভাবনায় সার্বিক কার্য-কারণবাদ স্বীকার করেও কর্মকর্তার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কারণ যদি কর্মকর্তার কর্মকে অনিয়ন্ত্রিত অথবা অকারণ বলা হয় তাহলেই বরং ঐ কর্মের সঙ্গে কর্মকর্তার কোনও সম্বন্ধ থাকে না। সেক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভাল-মন্দের বিচার অর্থহীন হয়। তাই স্বেচ্ছাকৃত কর্মের সঙ্গে কর্তার যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কর্মটির কারণ রূপে কর্তার চরিত্রকে, তার ইচ্ছাকে নির্দেশ করা হয়। রায় এই কর্মের কারণ রূপে বিবেকের কথা বলেন। যা কর্তার চরিত্রের এক রূপ। বিবেক হল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা। কিন্তু এমন ব্যাখ্যা দ্বারাও রায়ের নৈতিক ব্যাখ্যা

[১৭] রায়, মানবেন্দ্রনাথ, *নব মানবতাবাদ*, পৃ ৩৮

বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ রায়ের কথায় বিবেক জৈবিক বিবর্তনের ফসল ও সহজাত সচেতনতা। বিবেকের সিদ্ধান্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং যান্ত্রিক। রায় কোনও কিছু বিবেকজাত হওয়াকে যৌক্তিকতার লক্ষণ বলেন। কিন্তু কোনও কিছু সহজাত হওয়া এবং কোনও কিছু যৌক্তিক হওয়া এক বিষয় নয়। যুক্তি যান্ত্রিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে যুক্তি ও যান্ত্রিক জৈব ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য থাকে। কিন্তু রায় এই বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে যুক্তি ও যান্ত্রিক ক্রিয়াকে সমতুল্য বলেছেন।

আবার রায় যে বস্তুবাদকে তাঁর তত্ত্বের ভিত্তিভূমি বলে মনে করেন সেই বস্তুবাদ অনুসারে জড় জগত যেমন সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চালিত হয় আমাদের আন্তর জগৎ, অর্থাৎ আমাদের প্রবণতা, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষাও সমরূপ যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা চালিত। সেখানে দাবী করা হয় আন্তর জগতের নিয়মগুলি আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশে পরিচালিত, মস্তিষ্ক কিছু নিয়ম নির্ধারণ করে যে নিয়মানুসারে কাজগুলি হয়ে থাকে। কাজেই আমরা আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশে কর্ম সম্পাদন করলেও আমরা করছি বলে মনে করি। তাই সেটিও এক প্রকার নিয়ন্ত্রণবাদ। তাই এক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপস্থিতি অস্বীকৃত। সবই যদি মস্তিষ্ক প্রসূত কর্ম হয় তাহলে সেখানে স্বাধীনতা নামক নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয় কীভাবে? রায়ের মতে নৈতিকতা বিবেকের নির্দেশ। এই বিবেক যদি কোনও ভাবে মস্তিষ্ক প্রসূত ক্রিয়ার অধীন হয় তাহলে সেখানে হঠাৎ করে স্বাধীনতার ধারণার অনুপ্রবেশ সম্ভব কীভাবে? রায় বলতে পারেন যে বিবেক যুক্তির দ্বারা চালিত বলেই সেখানে স্বাধীনতার ধারণার উদ্ভব হয়। কিন্তু এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রায় বলেন, যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী। যুক্তি যদি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী হয় তাহলে সেখানে স্বাধীনতার স্বীকৃতি সম্ভব নয়।

আবার রায় মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন যে সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনও স্থান নেই। সেখানে কেবল সমষ্টি বা গোষ্ঠীর গুরুত্ব আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জায়গা নেই বলে তা মানবতাবাদের পরিপন্থী। কেননা ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার না করে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে পারি না। আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত না হলে সেখানে বিপ্লবের ধারণা থাকে না। অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতা ছাড়া বিপ্লব সম্ভব হয় না। কিন্তু রায়ের মতবাদে যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকে তাহলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্য দিয়েও বিপ্লব সংঘটিত হয় না। ফলে রায়ের মতবাদও মার্কসীয় দোষে দুষ্ট বলতে হয়।

এই সমস্যা সমাধানে রায় আধুনিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেন, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন করা যায় এবং সেগুলিকে আবার চূড়ান্তরূপে পরমাণু বা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। একইভাবে তিনি মানসিক ক্রিয়াকর্মের উৎসকে, প্রাণময়-বিশ্বকে ভৌতজগতের প্রেক্ষাপটে চিহ্নিত করেন। তবে তিনি মনে করেন, চিন্তাভাবনার কোনও শরীর নিরপেক্ষ আধিবিদ্যক অস্তিত্ব নেই। এমন নয় যে, সেগুলি পূর্ব থেকে বায়বীয় রূপে বিদ্যমান অথবা ভৌতবিশ্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে একত্রে কার্যকারণ সম্পর্কে বিরাজমান। সুতরাং চিন্তাভাবনার উৎপত্তি বিষয়ে রায়ের দর্শনে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত নয়। তিনি একটি অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যেখানে বলছেন মন ও জড়ের উৎস ভিন্ন নয়, যদিও তাঁদের বাস্তব ভিন্নতা আছে। তিনি বলছেন

> We only say that, while ideas do not grow by themselves, they can be traced to the background of physical Universe; once they are formed, they have an existence

of their own. After the generation of ideas, the single basic current of physical events bifurcates, so to say: the biological world, on the higher levels of evolution, is composed of a double process—dynamic of ideas and succession of physical fact. Mind and matter can be reduced to a common denominator; but as such, they are two objective realities.[১৮]

অর্থাৎ তিনি চিন্তা-ভাবনার সয়ম্ভূতা অস্বীকার করে তাদের অস্তিত্ব ভৌত বিশ্বের প্রক্ষাপটে খুঁজতে চেয়েছেন। ভৌত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি হলেও পরে তারা স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে। তাই তিনি বলেন, চিন্তা-ভাবনা উদ্ভবের পর ভৌত ঘটনাবলীর একক মূল ধারাটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। সেজন্য বলা যায় যে জৈব বিবর্তনের উচ্চতর পর্যায় দ্বৈত প্রক্রিয়ায় গঠিত; একটি হল চিন্তাভাবনার গতিশীলতা এবং অন্যটি হল ভৌত ঘটনার পরম্পরা। সেজন্য রায় বলেন, মন ও জড়বস্তুকে একটি সাধারণ উৎসে উপনীত করা গেলেও সেগুলি পৃথক দুটি বাস্তব সত্তা। রায় তাই বলেন, চিন্তাভাবনা একবার গড়ে উঠলে তা বস্তুত নিজস্ব নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাঁর কথায়, "ideas, once formed, exist independently as objective realities, governed by their own laws."[১৯]

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে রায়ের এই বস্তুবাদী বক্তব্যগুলি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? অর্থাৎ বস্তুবাদকে স্বীকার করেও চিন্তাভাবনার এমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়? তিনি

[১৮] Roy, M.N. & Spratt, Philip. *Beyond Communism*, p. 53-54

[১৯] Ibid, 54

বস্তুবাদের মধ্যেই মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা দুটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করছেন কীভাবে? এবং সেই তত্ত্বে দ্বৈতবাদ অস্বীকার করেই অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করছেন কীভাবে? তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে রায়ের বস্তুবাদ কি যুক্তিসঙ্গত? উত্তরে বলা যায় বস্তুবাদ সম্পর্কিত রায়ের মতটি ব্যতিক্রমী নয়। কারণ পরবর্তী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বস্তুবাদে এ ধরণের ব্যাখ্যার একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। উল্লেখ্য যে পাশ্চাত্যে আধুনিক বস্তুবাদের দার্শনিকগত বিকাশ হয়েছে শরীরবাদ বা ভৌতবাদের (physicalism) মাধ্যমে। শরীরবাদের সমর্থক দু'জন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন জন সার্ল এবং ডোনাল্ড ডেভিডসন। এই দুই দার্শনিকের তত্ত্বে এমন বস্তুবাদের কথা লক্ষ্য করা যায়। তাই আমরা এঁদের তত্ত্বের সাহয্যে রায়ের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

জন সার্ল (১৯৩২ ----) হলেন আমেরিকান আধুনিক বস্তুবাদের সমর্থক। তাঁর মতে, চেতনা কোনও অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক কিছু নয়, তা হল জৈবিক ঘটনা (biological phenomena) অর্থাৎ চেতনা বস্তুগত (material) মস্তিষ্কের কার্যকলাপের ফল। চেতনা মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয় বলে তা জৈবিক এবং বস্তুগত। সার্লের কথায়, "Mental phenomena are caused by neurophysiological processes in the brain and are themselves feature of the brain."[২০] কিন্তু চেতনা নিছক জড়বস্তু নয়। চেতনার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য (যথা, অনুভবযোগ্যতা, বিষয়ীগত সত্তা বা উদ্দেশ্যমুখিতা) থাকে যেগুলি মস্তিষ্কে থাকে না। তিনি বলেন,

> "Because they are intrinsically mental, they are a certain type of biological state, and therefore a fortiori they are

[২০] Searle, J., *The Mystery of Consciousness*, p. 11

physical."[২১] এবং "It is irreducible not because it is ineffable or mysterious, but because it has a first-person ontology, and therefore cannot be reduced to phenomena with a third person ontology."[২২]

অর্থাৎ চেতনা মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন এবং মস্তিষ্কে আশ্রয় করে সংঘটিত হয়। কিন্তু চেতনা মস্তিষ্কজাত হওয়া সত্ত্বেও তা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য মস্তিষ্কের নিয়মের দ্বারা তার বর্ণনা সম্ভব নয়। কিন্তু একই সঙ্গে সার্ল মনে করেন, সত্তা (reality) এক– সেটি হল বস্তু বা জড়। তাই বলতে হয় মস্তিষ্ক ছাড়া চেতনার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু চেতনার উৎপত্তি মস্তিষ্ক থেকে হলেও তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার জন্য চেতনা স্বতন্ত্র সত্তাগত অস্তিত্ব বজায় রাখে। একই সঙ্গে সার্ল বলেন, মানসিক অবস্থাকে দৈহিক অবস্থায় পর্যবসিত করা যায় না। মানসিক অবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা দৈহিক অবস্থায় স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিনি এটাও বলেন যে প্রতিটি মানসিক অবস্থার অনুরূপ একটি দৈহিক অবস্থা আছে এবং মানসিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হলে তার অনুরূপ দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তিনি বলেন, চেতনা মস্তিষ্কজাত হওয়ার সত্ত্বেও তা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য মস্তিষ্কের নিয়মে চালিত নয়। কিন্তু চেতনার যদি মস্তিষ্ক ভিন্ন সত্তা থাকে তাহলে এদের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হবে কীভাবে? উত্তরে সার্ল বলেন, মস্তিষ্ক থেকে চেতনা এক 'কোয়ালিটি' বা গুণ রূপে উৎপন্ন হয় বলে তা মস্তিষ্কের গুণ। অর্থাৎ সার্লের কথা অনুসারে বলা যেতে পারে একটি দৈহিক অবস্থা থেকে একটি মানসিক অবস্থার উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু আমরা কী বিপরীত দাবী করতে পারি? অর্থাৎ একটি চেতনা বা মানসিক অবস্থা

[২১] Searle, J., *The Rediscovery of the Mind*, p. 14

[২২] Searle, J., *The Rediscovery of the Mind*, p. 199

থেকে একটি দৈহিক অবস্থার উৎপত্তি হতে পারে? উত্তরে সার্ল বলেন, একটি মানসিক অবস্থা থেকে একটি দৈহিক অবস্থার উৎপত্তি হতে পারে। আবার একটি মানসিক অবস্থাও অপর একটি মানসিক অবস্থার কারণ হতে পারে। যেমন, একটি বিশ্বাস থেকে কোনও মানুষের বিশেষ বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মাতে পারে,যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। যেমন, আমি বিশ্বাস করি কফি খেতে খুব ভাল। এখন আমার কফি খেতে ইচ্ছা হল। এখানে একটি মানসিক অবস্থা (আমার বিশ্বাস) অন্য একটি মানসিক অবস্থার (কফি পানের ইচ্ছা) কারণ। আবার যখন কফি খাব বলে আমি কফি প্রস্তুত করতে যাই তখন যে কাজ করি তাকে মানসিক অবস্থা থেকে দৈহিক অবস্থার জন্ম বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মানসিক অবস্থা থেকে দৈহিক অবস্থা তৈরী হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরটি সার্ল বর্ণনাত্মক (descriptive) ভাবে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, মানসিক অবস্থা আসলে মস্তিষ্কের একটা অবস্থা। মস্তিষ্কে যে অবস্থা তৈরী হয় তার দুটি বর্ণনা হতে পারে। সেই বর্ণনাগুলিকে মানসিক শব্দতালিকা (mental vocabulary) এবং দৈহিক শব্দতালিকা (physical vocabulary) দিয়ে বর্ণনা করা হয়। মানসিক শব্দতালিকা দিয়ে যা বর্ণনা করা হয় তা মানসিক অবস্থা এবং ঐ অবস্থাকে যখন দৈহিক শব্দতালিকা দিয়ে বর্ণনা করা হয় তখন তা দৈহিক অবস্থা। যেমন, যখন একটি মলিকিউল অন্য একটি মলিকিউল এর সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ হল তখন আমরা বলি হাতটি তুললাম, এমন দৈহিক কাজটি মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ আসার পরেই সংঘটিত হয় অর্থাৎ আমরা হাত নাড়াচড়া করি। এই ঘটনার অপর একটি বর্ণনা হতে পারে। সেটি হল—আমার ইচ্ছে হল যার কারণে আমি হাতটি সরালাম। এখানে ইচ্ছা হাতটা সরানোর কারণ।

সার্ল মনে করেন, এই লেভেল দুটির বর্ণনা জ্ঞানের জগতে আশ্চর্যকর কিছু নয়। এগুলিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যেমন, আমাদের সামনে উপস্থিত টেবিলের

দুটি বর্ণনা হতে পারে। যেমন, টেবিল একটি শক্ত বস্তু যার উপর বই রাখা যায়, যার চারটি পায়া আছে, যার বাদামী রঙ আছে, যা কাঠ দিয়ে তৈরী ইত্যাদি। টেবিলের এমন বর্ণনা হল উচ্চ স্তরের (higher level) বর্ণনা। এই একই বিষয়ের অপর এক বর্ণনা দেওয়া যায় মলিকিউল স্তরে। যেটিকে নিম্ন স্তরের বর্ণনা (lower level) বলা হয়। যেখানে অ্যাটমগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়েই টেবিলটি ব্যাখ্যাত হয়। যে ব্যাখ্যায় টেবিলটিকে অ্যাটমের সমাহার বলা যায়। যেমন, এক্স মলিকিউল, ওয়াই মলিকিউলগুলি একসঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হলে টেবিলটি গঠিত হয়। তাই সার্ল বলেন, পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে যেমন এটি সম্ভব তেমনভাবে চেতনাকে এভাবে ব্যাখ্যার দ্বারা বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাই তিনি চেতনাকে মস্তিষ্কের উচ্চ পর্যায়ের বর্ণনা বলেছেন।

সার্লের এই তত্ত্বে নৈতিকতার ব্যাখ্যা অপর্যাপ্ত থেকে যায়। তিনি মনে করেন, দৈহিক পর্যায় এবং মানসিক পর্যায় উভয়ই নিয়ন্ত্রিত বা অনুমানযোগ্য (predictable) হলেও মানসিক পর্যায়ের অনুমানযোগ্যতা আমাদের অনুভবের মধ্যে ধরা পড়ে না। সেজন্য আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন (free) বলে মনে করি। কিন্তু আমরা বস্তুতপক্ষে স্বাধীন নয়। স্বাধীনতার ধারণা, যার ভিত্তিতে নৈতিকতা গড়ে ওঠে সেটি আমরা শুধু অনুভব করি কিন্তু তার অনুরূপ কোনও কিছু জগতে নেই। তাই সার্ল স্বাধীনতাকে জরুরী ভ্রান্তি (important illusion) রূপে স্বীকার করেন।

সার্লের তত্ত্বের সঙ্গে রায়ের তত্ত্বের বিশেষ অংশে সাযুজ্য রয়েছে। সার্ল মানসিক বিষয়ের যে স্বতন্ত্রতা দাবী করেছেন সেই দাবী রায়ও করেছেন। অর্থাৎ রায় জৈবিক অবস্থা থেকে মানসিক অবস্থার উৎপত্তি এবং মানসিক বিষয়ের একটি স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু রায়ের দর্শনের সঙ্গে সার্লীয় দর্শনের একটি বড় পার্থক্য আছে। সার্ল মনে করেন

মানসিক পর্যায়ের পরিবর্তন শারীরিক পর্যায়ের পরিবর্তনকে অপেক্ষা করে। যদিও রায় এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে এক মত পোষণ করেন না। কেননা রায় মনে করেন, মানসিক জগত নিজস্ব নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। সেই পরিবর্তন শারীরিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়। রায় তাঁর তত্ত্বে এমন ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করে স্বাধীনতার ধারণা স্বীকার করছেন। কিন্তু সার্লীয় তত্ত্বে স্বাধীনতা অস্বীকৃত হয়। কারণ সার্ল মনে করেন, মানসিক পরিবর্তন হতে গেলে অনুরূপ শারীরিক পরিবর্তন হয়। আবার তিনি মানসিক অবস্থা থেকে মানসিক অবস্থার, মানসিক অবস্থা থেকে শারীরিক অবস্থার, শারীরিক অবস্থা থেকেও মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হয় বলে দাবী করেছেন। এই দাবীগুলির সঙ্গে বস্তুবাদকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রত্যেকটি মানসিক অবস্থার অনুরূপ এক শারীরিক অবস্থা থাকবে কারণ মানসিক অবস্থাগুলি আসলে মস্তিষ্ক অবস্থার উচ্চস্তরীয় উপস্থাপনা। মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সম্পর্ক এভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমেই সার্ল তাঁর বস্তুবাদী অবস্থানকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তাই সার্লীয় মতবাদে নিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকৃত। সার্ল মনে করেন শারীরিক অবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। শারীরিক অবস্থা যদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বলে স্বীকার করা হয় তাহলে মানসিক অবস্থাও নিয়ন্ত্রিত বলতে হয়। তাই সার্লীয় বস্তুবাদে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায় না। তাই বলা যেতে পারে বস্তুবাদী তত্ত্বে চেতনার স্বাতন্ত্র্যের দাবীর দ্বারা ইচ্ছার স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে মুক্ত হতে হয়।

বস্তুবাদের এই কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা পাওয়া যায় ডোনাল্ড ডেভিডসনের তত্ত্বে। ডোনাল্ড ডেভিডসন (১৯১৭-২০০৩) ছিলেন একজন আমেরিকান দার্শনিক। যিনি মনে করেন, শারীরিক এবং মানসিক ঘটনা দুটি একে অন্যের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক বজায় রাখে। অর্থাৎ শারীরিক ঘটনা এবং মানসিক ঘটনাগুলি

পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে। যেমন, প্রত্যক্ষ দ্বারা কোনও ব্যক্তির বিশ্বাস তৈরী হতে পারে। আবার কোনও ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিশ্বাস তাকে বিশেষ কর্মে পরিচালনা করতে পারে। যদিও ডেভিডসন তত্ত্বরূপে কেবল ভৌতিক তত্ত্ব (physical reality) স্বীকার করেছেন। কিন্তু ডেভিডসন বলেন, এমন কোনও নিয়ম নেই যার দ্বারা শারীরিক অবস্থাকে মানসিক অবস্থায় এবং মানসিক অবস্থাকে শারীরিক অবস্থায় পর্যবসিত করা যায়। তবে বিশেষ অর্থে মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল অথবা প্র-নির্ভর (Supervenient)। তিনি প্র-নির্ভরতার (Supervenient) অর্থ করেন দুটি ঘটনার শারীরিক বৈশিষ্ট্য এক রকম হলে অনুরূপ মানসিক ঘটনার বৈশিষ্ট্য এক না হয়ে পারে না। অথবা কোনও ঘটনার কিছু শারীরিক দিক থেকে পরিবর্তন না করে মানসিক দিক থেকে পরিবর্তন হবে না। তাঁর কথায়

> There cannot be two events alike in all physical respects but differing in some mental respect. Or that an object cannot alter in some mental respect without alterming in some physical respect.[২৩]

তাই তিনি শারীরিক ঘটনা ও মানসিক ঘটনার মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যদিও সেই তাদাত্ম্য সম্পর্ক 'টাইপ' তাদাত্ম্য (type identy) নয় তা হল 'টোকেন' তাদাত্ম্য (token identy) সম্পর্ক। অর্থাৎ মানসিক অবস্থা উৎপন্ন হলে কোনও না কোনও দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই ধরণের বা এই রকমের মানসিক অবস্থা উৎপন্ন করতে গেলে এই ধরণের বা এই রকমের দৈহিক অবস্থা উৎপন্ন

[২৩] Davidson, D., 'Mental Events', in *Essays on Action and Events*, p. 214

করতে হবে। যেহেতু সেখানে ঐ বিশেষ ধরণ বা রকম বলা যায় না সেহেতু সেখানে কোনও কঠোর নির্ধারিত নিয়ম নেই। তাছাড়া মানসিক ঘটনাকে বর্ণনা করার শব্দভাণ্ডার এবং শারীরিক ঘটনাকে বর্ণনা করার শব্দভাণ্ডার এতটাই পৃথক যে একটিকে অন্যটির দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শারীরিক ঘটনার উপযুক্ত নিয়ম দিয়ে তাই মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ-যোগ্য নয়। তাই ডেভিডসন বলেন, দৈহিক ব্যাপার বিষয়ক নিয়মগুলি কঠোরভাবে নির্ধারিত (strict deterministic) হলেও মানসিক ব্যাপার বিষয়ক নিয়মগুলি এমন কঠোরভাবে নির্ধারিত নিয়ম নয়। তাই সেখানে পূর্বাভাসযোগ্যতা (predictability) থাকে না। তাঁর কথায়, "There are no strict laws on the basis of which mental events can be predicted and explained"[২৪]। তাই মানসিক অবস্থায় কোনও পূর্বাভাসযোগ্যতা (predictability) থাকে না বলে ডেভিডসন ইচ্ছার স্বাধীনতার সম্ভাবনা স্বীকার করছেন।

সুতরাং বলা যায় রায়ের মতবাদের সঙ্গে ডেভিডসনের তত্ত্বে বিশেষ মিল রয়েছে। রায় তাঁর অদ্বৈতবাদী তত্ত্বে বস্তুকে একমাত্র সত্তা বলে স্বীকার করেছেন। তেমনি ডেভিডসনও ভৌত সত্তাকে একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, একটি মাত্র সত্তাই আছে, এবং সেটি ভৌতসত্তা। এই অর্থে তিনি অদ্বৈতবাদ এবং জড়বাদকে সমর্থন করেন। তবে রায়ের তত্ত্বের সঙ্গে ডেভিডসনের তত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তিনি মানসিক ঘটনার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ অস্বীকার করায় তাঁর তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করার সুযোগ থাকে। তিনি বলেন, মনস্তত্ত্বকে (psychology) অন্যকিছুতে পর্যবসিত (reduce) করা যায় না। কারণ তিনি পদ্ধতিগত পর্যবসান (methodological

---

[২৪] Davidson, D., 'Mental Events', in *Essays on Action and Events* p. 216

reduction) স্বীকার করেন না। ডেভিডসন মনে করেন, শারীরিক নিয়মগুলিকে মানসিক নিয়মে পর্যবসিত করা যেতে পারে যদি পদ্ধতিগত পর্যবসান (methodological Reduction) সম্ভব হয়। যেহেতু এমন কোনও সাধারণ নিয়ম নেই সেহেতু মানসিক অবস্থাগুলি শারীরিক অবস্থাতে পর্যবসিত (reduce) করা যায় না। কারণ মানসিক অবস্থা যে শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় সেই শব্দ দিয়ে শারীরিক অবস্থার বর্ণনা করা যায় না। অন্য দিকে রায়ের তত্ত্বে নিয়ন্ত্রণবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এবং রায় পদ্ধতিগত পর্যবসান এবং সত্তাগত পর্যবসান স্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন,

> A psychological process can be reduced to chemical and physical processes, and they again, ultimately, to atoms or electrical fields. So, the origin of mental activities can be traced in the physical background of the living world.[২৫]

রায়ের এই কথা সত্তাগত পর্যবসানকে সমর্থন করে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রায়ের বক্তব্যগুলি পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকার করে। তিনি বলছেন,

> Begin with psychology and anthropology; they, together with the allied sciences, all merge in biology—the science of life. Biology, through bio-chemistry, merges in chemistry; the dividing the between chemistry and physics has disappeared;[২৬]

---

[২৫] Roy, M.N. & Spratt, Philip, *Beyond Communism*, p. 53

[২৬] Ibid, p. 71

আবার রায় তাঁর সর্বশেষ বিখ্যাত গ্রন্থে বলছেন,

> The psyche is not a mystic entity,...it can be reduced to physio-chemical constituents....[২৭]

এখানেই ডেভিডসনের সঙ্গে রায়ের তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। রায় মনে করেছিলেন, মানসিক অবস্থাগুলি শারীরিক অবস্থায় পর্যবসিত করা যায়। কারণ তিনি সমস্ত নিয়মকেই (শারীরিক ও মানসিক) প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেন। রায়ের কাছে প্রকৃতি হল ভৌতিক (physical)। ফলে মানুষের সমস্ত পর্যায় (mental, physical and social) একই প্রাকৃতিক নিয়ম (natural law) অনুসারে কাজ হয়ে থাকে। সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলে সেখানে অপর্যবসানযোগ্য মানসিক অবস্থার নিয়মের অস্তিত্ব থাকে না। আগেই আমরা বলেছি যে সার্লের তত্ত্বে এই পর্যবসান স্বীকার করার ফলে স্বাধীনতা স্বীকৃত হচ্ছে না। রায়ের তত্ত্বে এই পর্যবসান স্বীকৃত হওয়ার ফলে মানুষের স্বাধীনতার দাবী প্রশ্নযোগ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু রায়ের তত্ত্বে স্বাধীনতার ধারণাই মূল। কারণ রায়ের মানবতাবাদের সার হল ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ। আবার তিনি স্বাধীনতার অর্থ করেন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ এবং সেই বিকাশের পথে যে সকল বাধা রয়েছে সেগুলির অপসারণ। রায়ের কথায়, “Freedom is the progressive removal of all restrictions on the unfolding of human potentialities.”[২৮] রায় মনে করেন, মানবতাবাদী তত্ত্বই কেবল মানুষের সম্ভাবনা

---

[২৭] Roy, M.N., *Reason, Romanticism and Revolution*, p. 25

[২৮] Roy, M.N. & Spratt, Philip, *Beyond Communism* p. 141

বিকাশের পথে বাধাগুলি দূর করার প্রয়োজনীয়তা এবং পথ প্রদর্শন করতে পারে। অর্থাৎ মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে মানবতাবাদী তত্ত্ব মানুষকে সাহায্য করতে পারে। একই সঙ্গে রায় দাবী করেন যে মানুষের বিকাশ কীসের দ্বারা সম্ভব তা যদি সে বুঝতে পারে এবং মানুষ যদি সেই বিকাশের জন্য সচেষ্ট হতে পারে তাহলেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে। এই প্রচেষ্টার অংশ রূপে মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত হয়। তাই তিনি *Beyond Communism* গ্রন্থে বলছেন, মানুষের স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক বিষয় কাজ করলেও সর্বদা তা অর্থনৈতিক বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। রায়ের কথায়, "History is a determined process; but there are more than one causative factors. Human will is one of them, and it cannot always be referred directly to any economic incentive."[২৯] আসলে রায়ের এমন বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনি ধরে নিয়েছেন মানুষের স্বাধীনতার ইচ্ছে আছে, সেই স্বাধীনতা অর্জন করাই তার লক্ষ্য এবং এই স্বাধীনতা অর্জন মানুষের পক্ষে কঠিন নয়। ব্যক্তি মানুষ সচেষ্ট হলেই তা অর্জন করতে পারে। সেই প্রচেষ্টায় মানুষ স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি রেখে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা তৈরী করতে পারে— যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থা রূপে রায় বিশেষ সংগঠিত গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। রায়ের মতে, এই গণতন্ত্র মানুষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বা সম্ভাবনা বিকাশের পথে অগ্রসর হওয়া সুগম করে তোলে। রায় মনে করেন, যেহেতু মানুষ যুক্তিশীল প্রাণী এবং যুক্তির পথে মানুষ স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটাতে চায় সেহেতু সেখানে কোনও রকম বাধা থাকতে পারে না। কিন্তু মানুষ যুক্তিসিদ্ধ পথে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটাতে চায় বলে সেখানে কোনও বাধা থাকে না— রায়ের এমন মত স্বীকার করা যায় না। কারণ যুক্তিসিদ্ধ পথে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ ঘটাতে গেলে

[২৯] Principles of New Humanism, Thesis 5.

মানুষ অনেকসময় বাধার সম্মুখীন হয়। মানুষের এই বাস্তবিক বাধাগুলি রায়ের তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হল স্বাধীনতার পথে এই বাস্তবিক বাধাগুলি রায়ের তত্ত্বে প্রতিফলিত হল না কেন?

উত্তরে বলা যায়, রায়ের তত্ত্বে বিশেষ কতকগুলি অভিজ্ঞতা বিরোধী পূর্বস্বীকৃতি থাকায় আলোচ্য বাধাগুলি উপস্থাপিত হয়নি। রায় স্বাধীনতার ধারণাকে একরূপ বা সমরূপ (homogenous) বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে, স্বাধীনতা হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন। রায় এই বিকাশের ধারণাকে সমরূপ (homogenous) বলে গ্রহণ করেছেন। বিকাশের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে যে পৃথক হতে পারে সেই বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন না। তিনি মনে করেন সব ব্যক্তির কাছে বিকাশ একই অর্থ বহন করে। কারণ তিনি মনে করেন প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তির উপর নির্ভর করে নিজের সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাতে চায়। ফলে রায় ব্যক্তি মানুষের ভিন্নতাকে চিহ্নিত করতে পারেননি। তাই রায়ের এই পূর্বস্বীকৃতি অভিজ্ঞতা বিরোধী। কেননা, বাস্তবিকভাবে বিকাশরূপ স্বাধীনতার ধারণা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একজন ব্যক্তি নিজের বিকাশ বলতে যা বোঝেন অপর ব্যক্তি তার বিকাশ বলতে তা নাও বুঝতে পারেন। ব্যক্তি ভেদে চাহিদা ভিন্ন হওয়ার জন্য তাদের সম্ভাবনাগুলির বিকাশও ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে। রায়ের তত্ত্ব এই ভিন্নতাকে মান্যতা দেয় না।

রায় ধরে নিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। তাই তারা একে অন্যের সহযোগিতায় কাজ করে। কেননা তিনি মনে করেন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগ— এই দুটোই অস্তিত্বের জন্য জৈবিক সংগ্রামের মানসিক উপস্থাপনা থেকে উদ্ভূত। রায় বলেন, “The struggle for freedom is a continuation of the biological

struggle for existence on the higher level of intelligence and emotion."[৩০] রায়ের কাছে স্বাধীনতার ইচ্ছে হল অস্তিত্বের সংগ্রামের মানসিক প্রতিরূপ। কারণ মানুষ স্বাধীন হতে চায়, সে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবের বাইরে যেতে চায়। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্ট প্রতিকূলতার বাইরে যেতে চায় অন্য প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যবহারের মাধ্যমে। এইরূপ চাহিদা থেকেই বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগ আসে বলে সেগুলি একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতায় কাজ করতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে রায় মানুষকে সারগত ভাবে যৌক্তিক প্রাণী বলে দাবী করেন। রায়ের কথায় "...the human being is essentially rational."[৩১] কিন্তু বাস্তবিক অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখলে মানুষকে সারগত ভাবে কেবলমাত্র যৌক্তিক প্রাণী বলা যায় না। মানুষের মধ্যে অনেক অযৌক্তিকতা (irrationality) থাকে। কিন্তু রায় মানুষের মধ্যে নিহিত অযৌক্তিকতাগুলির বিষয়ে গুরুত্ব না দিয়ে মানুষকে সারগত ভাবে যৌক্তিক প্রাণী বলেই দেখতে চেয়েছেন। সেইজন্য তিনি মনে করেছেন মানুষ কেবল যৌক্তিক কাজ করে। কিন্তু বাস্তবিকভাবে মানুষ অনেক অযৌক্তিক কাজ করে থাকে। এবং মানুষের মধ্যে অযৌক্তিকতা থাকে বলেই সে অযৌক্তিক কাজ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রায়ের মতানুসারে যৌক্তিকতার উৎপত্তি বিবর্তনের মাধ্যমে হয় এবং অযৌক্তিকতার উৎপত্তিও বিবর্তনের ফল বলে স্বীকার করতে হয়। মানুষের অযৌক্তিকতার অন্যতম উৎস হল আবেগ। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আবেগ দ্বারা কৃত কর্ম যুক্তির (Reason) বিরোধী হয়। কিন্তু রায় বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগের একই উৎস স্বীকার করে তাদের লক্ষ্য এক বলে ধরে নিয়েছিলেন বলে আবেগের অযৌক্তিকতার দিকটি তাঁর তত্ত্বে উপেক্ষিত হয়। এবং আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্বের

---

[৩০] Roy, M.N. & Spratt, Philip, *Beyond Communism*, p. 141

[৩১] Principle of Radical Democracy, thesis IV.

সমস্যাও তাঁর দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের লক্ষ্য এক নাও হতে পারে। এমন হতেই পারে যে বুদ্ধিবৃত্তির এবং আবেগ ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের ধারণা উপস্থাপিত করে। কিন্তু রায় এই বিষয়কে মান্যতা না দিয়েই বিকাশের ধারণাকে সমরূপ (homogenous) বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ তাঁর তত্ত্বে বিকাশ একটি সহজ লভ্য অবস্থা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি এবং আবেগ উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশের সমরূপ ধারণা লক্ষ্য রূপে উপস্থাপিত হয় বলে তিনি তাদের মধ্যে বিরোধিতা চিহ্নিত করতে অক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া, কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি সমর্থিত বিকাশের একাধিক ধারণা একই সময়ে সৃষ্ট হতে পারে এবং এই ধারণাগুলির মধ্যেও বিরোধিতা থাকতে পারে সে সম্ভাবনা রায়ের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আবার রায় ব্যক্তিকে (human being/individual) বোঝার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির মনকে একক হিসাবে ধরে নিয়েছেন। তিনি নব মানবতাবাদের প্রথম সূত্রে ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে 'ব্যক্তিই হল একক'। কাজেই রায় ব্যক্তির মনকেও একক রূপে গ্রহণ করেন। ফলে ব্যক্তি-মানুষের মনে ব্যক্তিমন ছাড়াও ভিন্ন ধরনের 'মন' যে থাকতে পারে তিনি তা লক্ষ্য করেননি। প্রতিটি মানুষের মনে একাধিক দিক থাকে যাকে আমরা 'ব্যক্তিমন', 'গোষ্ঠীমন' এবং 'প্রজাতিমন' বা 'সমাজমন' বলে চিহ্নিত করতে পারি। ব্যক্তি-মানুষ নির্ভর চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মনের যে অংশে থাকে তাকে বলা যায় 'ব্যক্তি মন'। অন্যদিকে ব্যক্তি মাত্রেই সামাজিক জীব হিসেবে এক বা একাধিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই সব গোষ্ঠীর স্বার্থ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি উপাদান দিয়ে তৈরী হয় 'গোষ্ঠীমন'। যেহেতু গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ ঐ গোষ্ঠীর নিরিখে নিজের পরিচিতি (identity) গঠন করে তাই ব্যক্তি মানুষের অজান্তেই ঐ গোষ্ঠীমনের আত্মীকরণ ঘটে। এভাবে গোষ্ঠীমন ব্যক্তিমানুষের মনের একটি অংশে পরিণত হয়। আবার ব্যক্তির

মধ্যে ব্যক্তি মন, গোষ্ঠী মন বা সমষ্টি মন অতিরিক্ত পৃথক ভাবে প্রজাতি মন বা বৃহত্তর সামাজিক মন থাকে। এই বৃহত্তর সামাজিক চেতনার দ্বারাই ব্যক্তি সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে ব্যক্তি চেতনায় সে কেবল ব্যক্তিরূপেই নিজের পরিচয় তৈরী করে। একই সঙ্গে সমষ্টি চেতনার দ্বারা নিজেকে সমষ্টির পরিচয়ে আবদ্ধ করে অন্যান্য গোষ্ঠী বা সমষ্টি থেকে নিজেকে পৃথক করে। সুতরাং ব্যক্তি বা ব্যক্তির মন কেবল ব্যক্তি চেতনার দ্বারা নির্মিত হয় না। ফলত ব্যক্তির মনকে একক (unit) রূপে গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তির মন বিভিন্ন ধরণের চেতনার জটিল সংগঠন। কিন্তু এই বিভিন্ন চেতনার সম্পর্ক একরৈখিক নয়। কারণ সব সময় ব্যক্তিমন যা মনে করে তা সমষ্টিমন মনে করে না। আবার গোষ্ঠী বা সমষ্টিমন যা মনে করে তা বৃহত্তর সামাজিকমন মনে করে না। কারণ বৃহত্তর মানব সত্তা গোষ্ঠীর সত্তার থেকে ভিন্ন কিছু চাইতে পারে। অন্যভাবে বললে, ব্যক্তি এবং ব্যক্তি চেতনা যে অবস্থাকে স্বাধীনতা বলে মনে করে সেই অবস্থা সমষ্টি বা সমষ্টি চেতনার কাছে স্বাধীনতা বলে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। আবার গোষ্ঠী বা সমষ্টি চেতনা যে অবস্থাকে স্বাধীনতা রূপে গণ্য করে সেই অবস্থা বৃহত্তর সামাজিক চেতনার কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে। উল্লেখ্য, রায় মানুষের মনের এই জটিল সংগঠনের সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করতেন ব্যক্তিমন থেকে অতিরিক্ত গোষ্ঠীমন ইত্যাদি কাল্পনিক বস্তুমাত্র, বাস্তব নয়। গোষ্ঠীমনকে এভাবে কাল্পনিক বলে দাবী করলে ব্যক্তি-মানুষের নিজের বিকাশের ধারণা, নৈতিকতাবোধ ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ গোষ্ঠী বা বৃহত্তর সমাজের যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে তা অস্বীকার করতে হয়। ফলে রায়ের এই অবস্থানটিও অভিজ্ঞতা বিরোধী অবস্থানের নিদর্শন। গোষ্ঠীমনকে স্বীকার করলে যেহেতু ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠীর প্রাধান্যের সম্ভাবনা থেকেই যায় সেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দাবী রক্ষার স্বার্থে রায় গোষ্ঠী মনকে অস্বীকার করেন। এই কারণেই তিনি মার্কসবাদের সমালোচনা

করেছিলেন, যেহেতু সেখানে গোষ্ঠীমনের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। গোষ্ঠীমনকে স্বীকার করেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে রক্ষা করা যেতে পারে সেই সম্ভাবনা রায় বিবেচনার মধ্যে আনেননি। এছাড়াও ব্যক্তিমনের অতিরিক্ত গোষ্ঠীমন স্বীকার করলে ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভের পথে যে প্রতিবন্ধকতা থাকে সেই বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দেননি। কারণ তিনি মনে করেছিলেন ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিমন দিয়েই যুক্তিসিদ্ধ পথে অগ্রসর হলে স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবিকভাবেই ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর বাধা থাকতে পারে। এই বাধা দুই ভাবে আসতে পারে, ব্যক্তির ভিতর থেকে এবং ব্যক্তির বাইরে থেকে। আবার গোষ্ঠী যখন কোনও স্বাধীনতা চায় সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দিক থেকে বাধা আসতে পারে অথবা অন্য কোনও গোষ্ঠী থেকে বাধা আসতে পারে। কিন্তু এই বিষয়গুলি তিনি বিবেচনার মধ্যে আনেননি।

ব্যক্তি মনের জটিল সংগঠন বশত ব্যক্তি মনের বিভিন্ন অংশগুলি তার সামনে বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য উপস্থিত করে। ব্যক্তিমন, গোষ্ঠীমন এবং প্রজাতিমন প্রদত্ত বিকাশের প্রতিটি ধারণাই বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারী হয়ে থাকে। সেই উপস্থিত লক্ষ্যগুলির মধ্যে ব্যক্তিকে কোনও একটি লক্ষ্য নির্বাচন করতে হয়। এখানেই ইচ্ছার স্বাধীনতার গুরুত্ব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যখন ব্যক্তির সামনে বিভিন্ন বিকল্প থাকে এবং সেই বিকল্পগুলির মধ্যে কোনও একটি বিকল্পকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা ঐ ব্যক্তির থাকে তখনই বলা যায় ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। এই ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি রায় পদ্ধতিগত পর্যবসান তত্ত্ব স্বীকার করেছেন বলে তাঁর তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা তথা স্বাধীনতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

রায়ের বস্তুবাদী মানবতাবাদ: পরিমার্জন ভিত্তিক বিকল্পের রূপরেখা

মন ও দেহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পর্যবসানের সম্ভাবনা স্বীকার করলে মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়াগুলি পূর্বানুমান বা পূর্বাভাসযোগ্য হয়ে যায়। কারণ সেক্ষেত্রে জড়-জাগতিক নিয়মের মতো মনোজগতের নিয়মগুলিকেও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণবাদী (strict deterministic) বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনায় যেখানে কঠোর পূর্বাভাসের সম্ভাবনা থাকে সেখানে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। যে কারণে সার্লের দর্শনে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে ভ্রান্ত বলতে হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে বস্তুবাদে পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় ডেভিডসনের তত্ত্বে পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকৃত হয়নি। তাই বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি বস্তুবাদী হওয়ার জন্য সত্তাগত পর্যবসান অথবা পদ্ধতিগত পর্যবসান কিংবা উভয়কেই স্বীকার করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

রায়ের ভৌত বাস্তববাদী তত্ত্বে যে অদ্বৈতবাদী ধারণা গৃহিত হয়েছে সেই দাবীকে অনুসরণ করে আমরা একটা বিকল্প প্রস্তাব করতে পারি যেখানে বস্তুবাদ ভিত্তিক মানবতাবাদের সম্ভাবনা রক্ষিত হতে পারে। এই বিকল্প ভাবনায় আমরা বস্তু-অদ্বৈতবাদ তত্ত্বকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করব। এই বিশেষ অর্থে, বস্তুকে মৌলিক বলে ধরে নিয়ে সেই বস্তু থেকে উৎপন্ন এবং বস্তুতে আশ্রিত সমস্ত বিষয়ের বস্তুগত অস্তিত্ব স্বীকার করা হবে। সার্ল তাঁর তত্ত্বে এমন বস্তুগত অস্তিত্ব ভিত্তিক বস্তুবাদ স্বীকার করেছেন। তিনি চেতনাকে মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন এবং মস্তিষ্কে আশ্রিত বলেছেন। কাজেই যা কিছু বস্তু থেকে উৎপন্ন এবং যা বস্তুতে আশ্রিত অর্থাৎ বস্তুর উপর অস্তিত্বের জন্য নির্ভরশীল তাদের বস্তুগত অস্তিত্ব

স্বীকার করেছেন। আমরাও একই প্রকারে মন বা চেতনাকে বস্তুগত বলে দাবী করতে পারি। আমাদের এমন দাবী রায়ের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রায় বলেছেন, “Mind and matter can be reduced to a common denominator; but, as such, they are two objective realities.”[৩২] কিন্তু ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে সার্লের তত্ত্বের মতোই রায়ের তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্লের তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত না হওয়ার কারণ হল তিনি দাবী করেছিলেন যে প্রতিটি মানসিক ঘটনার অনুরূপ একটি শারীরিক ঘটনা থাকে। রায় অবশ্য এমন দাবী তাঁর তত্ত্বে করেননি। কিন্তু রায় পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকার করার ফলে তাঁর তত্ত্বে ইচ্ছার স্বাধীনতা অব্যাখ্যাত থাকে। আমরা বলতে পারি যে বস্তুবাদী তত্ত্ব নির্মাণ করতে গেলে পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকার করার কোনও আবশ্যকতা নেই। এমনকি, রায় যেভাবে মানস জগতের স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন সেই মানস জগতের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত পর্যবসান স্বীকার করা সম্ভব নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। যদি বস্তুবাদী তত্ত্বে কোনও পর্যবসান স্বীকার করা না হয় তাহলে ডেভিডসনের মতো আমরা বলতে পারি সেখানে কোনও মানস-ভৌত নিয়ম (psychophysical laws) তৈরী করা যায় না। কাজেই মানস জগতের ক্ষেত্রে কোনও কঠোর পূর্বাভাস সম্ভব নয়। এই কথা বলার অর্থ হল মানসিক জগতে ইচ্ছার স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে স্বীকার করা।

মনের জগতের ক্ষেত্রে কঠোর পূর্বাভাস (strict predictability) অস্বীকার করার মূলত তিনটি কারণ আমরা উপস্থাপন করতে পারি। যার প্রথম কারণটি রায়কে অনুসরণ করে বলা যায়। রায়ের তত্ত্বে সহজেই পদ্ধতিগত পর্যবসান অস্বীকৃত হতে পারত। কারণ রায় বলেছেন, প্রাণী জগত থেকে শুরু করে মনুষ্য জগতের যে বিবর্তন তার প্রধান চালিকা

[32] Roy, M.N. and Spratt, Philip, *Beyond Communism*, p. 54.

শক্তি 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'। রায়ের মতে, মনের জগতে বা মানুষের ক্ষেত্রে এই 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'ই স্বাধীনতার স্পৃহায় প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। এই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের অনুরূপ কোনও বর্ণনা আমরা জড় জগতে প্রয়োগ করতে পারি না। জড় জগতের ক্ষেত্রে এরকম সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। ফলে মনোজগত সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে শরীরবাদে (physiology) পর্যবসান করা যায়— এমন সম্ভাবনা মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা যায়, মানুষের মনোজগতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সেখানে জ্ঞাত-পূর্বাভাস এবং অজ্ঞাত-পূর্বাভাসের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। তাই শেষ বিচারে মানুষের কর্মের কোনও পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। মানুষ স্বভাবত স্বাধীনতাকামী বলে যখন কোনও কর্মের কর্তা জানতে পারেন যে তার কর্মের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তখন ঐ কর্তার মধ্যে এমন এক প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে যা ঐ পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে। এই মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প কর্মকে কর্তা নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু পূর্বাভাসকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য বিকল্প নির্বাচনের সম্ভাবনা জড় জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জড়জগতের ক্ষেত্রে এমন ভাবে জ্ঞাত-পূর্বাভাস এবং অজ্ঞাত-পূর্বাভাসের মধ্যে কোনও পার্থক্য হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য সম্ভব বলে মানুষের কর্মকে কখনই কোনও কঠোর নিয়মের অধীনে আনা সম্ভব নয়। কেননা যদি মানুষের সমস্ত কর্মকে কঠোর নিয়মের অধীনে আনতে হয় তাহলে জ্ঞাত পূর্বাভাসের কী পরিণতি হতে পারে সে সম্পর্কেও নিয়ম থাকতে হবে। কিন্তু এমন নিয়ম পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সেই পরিণতি ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।[৩৩]

---

[৩৩] Basu, Soumitra, Human Action and Freedom: Some Reflections on Searle's view, in *Jadavpur Journal of Philosophy*. pp. 29-42

তৃতীয় যুক্তিটি আধুনিক সমাজ ও রাজনৈতিক দার্শনিক স্লাভয় জিজেকের (Slavoj Zizek) বিখ্যাত *Freedom: A Disease without Cure* গ্রন্থ থেকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। তিনি মনে করেন, মানুষের মনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মানুষ জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে মানুষ সেই ঘটনার তাৎপর্য নির্ণয় করে থাকে। সেজন্য ঘটনার ব্যাখ্যা কীভাবে দেওয়া হয় তার উপর নির্ভর করে ওই ঘটনা ব্যক্তির পরবর্তী কার্যক্রমকে কীভাবে প্রভাবিত করবে। অতীতের কোনও ঘটনা যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ওই ঘটনাকে পরবর্তীকালে মানুষ এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে যাতে ওই ঘটনার নতুন অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত হয়। এই কারণে কোনও ঘটনা অব্যাখ্যাত থাকলে অথবা বিশেষ কোনও এক ভাবে ব্যাখ্যাত হলে মানুষকে যে ধরণের কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারে, সেই ঘটনা নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় মানুষের মধ্যে ভিন্ন ধরণের কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এর নিদর্শন রূপে এখানে উল্লেখ্য যে মার্কসীয় তত্ত্ব প্রচলিত ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে বাতিল করে নতুন ভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছিল। ফলে সেখানে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মুক্ত হয়েছিল। মার্কস ইতিহাসকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করার ফলে স্বাধীনতার জন্য মানুষের কর্তব্য কী সেই সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় কেবলমাত্র অতীতের ঘটনা বা অতীতের ধ্যান ধারণা সবসময় মানুষের চিন্তা বা কর্মকে নির্ধারণ করতে পারে না। যেভাবে ভৌতজগতে পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনাকে নির্ধারণ করে, সেভাবে মানসিক জগত নির্ধারিত হয় এমন বলা যায় না। কারণ অতীত ঘটনা মানুষকে নির্ধারণ করে না বরং অতীতকে মানুষ কীভাবে দেখছে, কীভাবে ব্যাখ্যা করছে, কীভাবে তার তাৎপর্য নির্ণীত হচ্ছে সেগুলির উপর নির্ভর করে অতীতের প্রভাব পরিবর্তিত হয়। এই অর্থে অতীতকে পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা মানুষের আছে বলে জিজেক মনে

করেন। ফলে অতীত দ্বারা ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত হবে অথবা মনোজগত নিয়ন্ত্রিত হবে সেটা সম্ভব নয়। তাই বলা যায় এখানে পূর্বাভাস সম্ভব নয়। যেহেতু এখানে পূর্বাভাস সম্ভব নয় সেই কারণে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকৃত হতে পারে।

আমরা দেখেছি মানবেন্দ্রনাথ রায় স্বাধীনতার দুটি অর্থ করেছেন। এক অর্থে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলছেন। অন্য অর্থে তিনি স্বাধীনতাকে বিকাশরূপ লক্ষ্য বলে গণ্য করেছেন, যা প্রতিটি ব্যক্তি একান্তভাবে অর্জন করতে চায়। তিনি মনে করেন, এই বিকাশ রূপ স্বাধীনতাটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থে গৃহিত না হলে স্বাধীনতার অর্থ ব্যহত হয়। কারণ সেখানে গোষ্ঠী বা সমষ্টি প্রাধান্য পায়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, রায় অভীপ্সিত স্বাধীনতা কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে অর্জন করা সম্ভব? কারণ ব্যক্তি একক ভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না; যে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যক্তিসমগ্রের প্রচেষ্টা সাপেক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু রায়ের মতে, স্বাধীনতা গোষ্ঠী বা সমষ্টি সাপেক্ষ হলে সেখানে সমষ্টি প্রাধান্য স্বীকার করতে হয়। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হানি ঘটে। তাই রায়ের মতে, সমষ্টি নির্ভরতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করতে পারি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে একটি দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বীকার করলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী একে অপরকে প্রভাবিত করে অথবা পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া করে। এই পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আলাপ-আলোচনার ফলে এমন এক নতুন লক্ষ্য উদ্ভূত হতে পারে, যা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফসল। যে লক্ষ্যটি প্রত্যেক ব্যক্তির অভীপ্সিত স্বতন্ত্র স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ ব্যক্তি যে বিকাশের লক্ষ্যে স্বাধীনতা চায় সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। কারণ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারে অথবা নিজের মতকে অন্য সকলের (গোষ্ঠীর) কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে। এভাবেই তারা একে

অপরকে প্রভাবিত করতে পারে। তখন যে নতুন লক্ষ্য সৃষ্টি হয় তা ব্যক্তির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক রূপে কাজ করে। তখনই ব্যক্তি সেই লক্ষ্যটিকে নিজের লক্ষ্য রূপে গণ্য করে এবং সেই লক্ষ্য অনুসারে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। একইভাবে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্কও দ্বান্দ্বিকতা বা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কারণ সেখানে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা থাকলে এবং কোনও রকম আধিপত্যবাদী ধারণা না রাখলে যে নতুন লক্ষ্য নির্ণীত হবে সেই নতুন বৃহৎ লক্ষ্য সাধনে সকল গোষ্ঠী এগিয়ে আসবে। সেখানে নতুন ধরণের বিকাশের ধারণা সৃষ্টি হবে এবং সেই অনুসারে স্বাধীনতার পরিসরও বৃদ্ধি পাবে। দ্বান্দ্বিকতা প্রসূত স্বাধীনতা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বাধীনতাকে সীমিত করে না। বরং নতুন নতুন লক্ষ্যের সন্ধান দিয়ে স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সুতরাং আমরা দাবী করতে পারি, রায়ের অভিজ্ঞতা-বিরোধী পূর্বস্বীকৃতিগুলি যদি বর্জন করা যায়, রায়ের পদ্ধতিগত পর্যবসান তত্ত্বকে যদি পরিহার করা যায় এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে যদি যথাযথ দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রক্ষা করে বস্তুবাদী মানবতাবাদ সম্ভব হতে পারে।

গ্ৰন্থপঞ্জী

1. Afanasyev, V. (1978). *Marxist Philosophy: A Popular outline*, Trans. by L. Lempert. Edited by J. Riordan. Moscow: Foreign languages Publishing House.
2. ---, (1987) (2018). *Historical Materialism*. Delhi: Aakar Books.
3. Banerjee, Amritava. (1978). *Historical Materialism and Political Analysis*. Kolkata: K.P. Bagchi and Co.
4. Bax, Earnest Belfort. (1911). *The Last Episode of The French Revolution: Being a history of Gracchus Babeuf and the Conspiracy of the Equals*. London: Grant Richards Ltd.
5. Beiser, Frederick. (2008). *Hegel*. New York: Routledge.
6. Bhattacharyya, Buddhadeva. (1983). *Socialism in Theory and Practice*. Calcutta: Uccharan.
7. Buonarroti, Philippe. (1836). *Babeuf's Conspiracy for Equals*, Trans. by Bronterre. London: H. Hetherington.
8. Burber, Martin. (1996). *Paths in Utopia*. New York: Syracuse University Press.
9. Burckhardt, Jacob. (n.b.). *The Civilization of the Renaissance in Italy*. Trans. by S.G.C. Middlemore. London: George Allen &Unwin Ltd.
10. Burns, J.H, (Ed.). (1991). *The Cambridge History of Political Thought 1450-1700*. London: Cambridge University Press.
11. Burnet, John. (2002). *Early Greek Philosophy*. New Delhi: Cosmo Publications.
12. Carlyle, Thomas. (1898). *The French Revolution: A History*. New York: Charles Scribner's Sons

13. Chamberlin, William B. (1941). *The Philosophy Ludwing Feuerbach*. London: George Allen and Unwin Ltd.
14. Chattopadhyay, Debiprasad. (Ed.). (1981). *Marxism and Indology*. Calcutta: K P Bagchi & Company.
15. Cole, G.D.H. (1953). *A History of Socialist Thought*, Vol. I. London: Macmillan.
16. Copleston, Frederick. (2003). *A History of Philosophy*, Vol 1 & 6. New York: Continuum.
17. Cornforth, Maurice. (1976). *Dialectical Materialism: An Introductory Course*. Calcutta: National Book Agency.
18. Craig, Edward. (Ed.). (2005). *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 4 & 6. New York: Routledge.
19. Darrow, Clarence, & Durant. DR. Will. (1927). *Debate: Is man a Machine?*. New York: The Language of Public discussion.
20. Draper, J.W. (1902). *A History of Intellectual Development of Europe*. Vol. 2. London: George Bell & Sons.
21. Dupre, Louis. (1966). *Philosophical Foundations of Marxism*. New York: Harcourt, Brac & World.
22. Dutta, R. Palme. (1940). *India To-Day*. London: Victor Gollancz Ltd.
23. ---, (1963). *Problems of Contemporary History*. London: Lawrence and Wishart.
24. Einsenstein, Elizabeth L. (1959). *The First Professional Revolutionist: Filippo Michele Buonarroti*. Cambridge: Harvard University Press.
25. Eliade, Mircea. (Ed.). (1987). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 6. New York: Macmillan Publishing Company.

26. Engels, Fredrick. (1907). *Land Marks of Scientific Socialism: Anti-Duehring*. Trans. & Ed. by Austin Lewis. Chicago: Charles H. Kerr & Company.
27. Feuerbach, Ludwing. (1972). *The Essence of Christianity*. Trans. by Zawar Hanfi. (n.p.): (n.p.).
28. Franstov, G.P. (1975). *Philosophy of Sociology*. Moscow: Progress.
29. Ghosh, Gouri Prasad. (Ed.). (2009). *Everyman's Dictionary*. Kolkata: Ramkrishna Pustakalaya.
30. Glezerman, G. & Kursanov, G. (Ed.). (1968). *Historical Materialism, Basic Problems*. Moscow: Progress.
31. Gramsci, Antonio. (1999). *Prison Notebook*. London: Elec Book Company Ltd.
32. Guest, David. (1971). *Lectures on Marxist Philosophy*. Calcutta: New Book Centre.
33. ---. (1989). *A Text Book of Dialectic Materialism*. London: Lawrence & Wishart Ltd.
34. Hegel, George Wilhelm Friedrich. (2010). *Science of Logic*. Trans & Ed. by George Di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.
35. Hobbes, Thomas. (1887). *Leviathan* or *The Matter, Form and Power of a Common wealth, Ecclesiastical and Civil*, 3rd edition. London: Glorge Routledge and Sons.
36. Hoffman, John. (1976). *Marxism and the Theory of Praxis*. New York: International Publishers.
37. Hospers, John. (1956). *An Introduction to Philosophical Analysis*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
38. Iggers, G. George. (1958). *The Doctrine of Saint-Simon: An Exposition*. New York: Schocken Books.

39. Kamenka, Eugene. (1970). *The Philosophy of Ludwing Feuerbach*. New York: Praeger Publishers.

40. Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Trans. and Ed. by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.

41. Kharin, Yu A. (1981). *Fundamentals of Dialectics*. Moscow: Progress.

42. Kristeller, Paul Oskar. (1961). *Renaissance Thought*. New York: Harper Torchbooks.

43. Kursanov, G. (Ed.). (1967). *Fundamentals of Dialectal Materialism*. Moscow: Progress.

44. Lange, Frederick Albert. (1925). *The History of Materialism*. Trans. by Ernest Chester Thomas. New York: Brace & company.

45. Lecky, W.E.H. (1910). *Rationalism in Europe*. London: Longmans, Green and Co.

46. Lehning, Arthur. (1974). Bakunin's Conceptions of Revolutionary Organizations and Their Role: A Study of His 'Secret Societies'. In C. Abramsky (ed.). *Essays in Honour of E.H. Carr*. London: The Macmillan Press.

47. Lenin, V.I. (1962). *Collected Works, Vol. 14*, Trans. by Abraham Fineberg & Ed. by Clemens Dutta. Moscow: Progress Publishers.

48. ---. (1976, 2022). *Philosophical Notebooks*. New Delhi: Phoneme Books.

49. Lukes, Steven. (1985). *Marxism and Morality*. Oxford: Clarendon Press.

50. Marx, Karl. (1970). *Critique of Hegel Philosophy of Right*. Trans. by Joseph O'Malley. Oxford: The Oxford University Press.

51. Marx, Karl & Engels, F. (1975). *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism against Bruno Bauer and Company*. Trans. by Richard Dixon and Clemes Dutt. Moscow: Progress Publishers.

52. Marx K., (1976). Moralising Criticism and Critical Morality. In *Marx and Engels collected works*, vol. 6. Moscow: Progress Publishers.

53. Marx, Karl. (2016) *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Delhi: Aakar Books.

54. McLellan, David. (1972). *Marx before Marxism*. Harmondsworth: Penguin.

55. ---. (1980). *The Thought of Karl Marx: An Introduction*. London: The Macmillan Press Ltd.

56. Mcmurty, J. (1978). *The Structure of Marx's World-View*. Princeton: Princeton University press.

57. Mettrie, Julien Offray De La. (1912). *Man a Machine*. Chicago: The open court publishing co.

58. Mirandola, Giovanni Pico Della. (1965). *On the Dignity of Man and Other Works*. Trans. by Charles Glen Wallis. Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publishing.

59. Nehru, J. (1934). *Glimpses of World History*. New York: Asia Publishing House.

60. ---. (1946) *The Discovery of India*. New Delhi: Oxford University Press.

61. Oizerman, T.I. (1973). *Problems of the History of Philosophy*. Moscow: Progress.

62. ---. (1981). *The Making of the Marxist Philosophy*. Moscow: Progress Publishers.

63. Oparin, A.I., (1955). *The Origin of Life*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

64. Pearsall, Judy. (Ed.). (2002). *The New Oxford Dictionary of English*. New York: Oxford University Press.
65. Perilli, Lorenzo, & Taormina, Daniela P. (Ed.). (2018). *Ancient Philosophy: Textual Paths and Historical Explorations*. London & New York: Routledge.
66. Ray, Sibnarayan. (Ed.). (1959). *M.N. Roy: Philosopher-Revolutionary*. Kolkata: Renaissance Publishers.
67. Rescher, Nicholas. (2006). *Metaphysics*. New York: Prometheus Books.
68. Meszaros, Istvan. (1975). *Marx's Theory of Alienation*. London: Merlin Press.
69. Mittal, K.K. (1974). *Materialism in Indian Thought*. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.
70. Rosenthal, M. and P. Yudin. (1967). *A Dictionary of Philosophy*. Trans. by Richard R. Dixon and Murad Saifulin. Moscow: Progress Publishers.
71. Roth, John K. (Ed.). (1995). *International Encyclopedia of Ethics*. London: Fitzroy Dearborn Publishers.
72. Rousseau, Jean-Jacques. (1984). *A Discourse on Inequality*, Trans. by Maurice Cranston. London: Penguin Books.
73. Roy, M.N. (1940). *Materialism: An Outline of The History of Scientific Thought*. Kolkata: Renaissance Publication.
74. ---. (1960). *Politics Power and Parties*. Kolkata: Renaissance Publishers
75. ---. (1989). *Reason, Romanticism and Revolution*. Delhi: Ajanta Publications
76. ---. (1999). *From The Communist Manifesto to Radical Humanism*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.

77. ---, (1999). *Humanism Revivalism and The Indian Heritage*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.

78. ---. (2006), *Problem of Freedom*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.

79. Roy, M.N. & Philip Spratt. (2011). *Beyond Communism*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd.

80. Roy, Sibnarayan. (Ed.). (1959). *M.N. Roy: Philosopher-Revolutionary*. Calcutta: Renaissance Publishers (Private) Ltd.

81. Russell, B. (1967). *Why I Not A Christian*. London: Touchstone Books.

82. Ryazanov, David. (Ed.). (1983). *The Communist Manifesto of Karl Marx and F. Engels*. Trans. by Ganendranath Bandyopadhyay. Calcutta: Parl Publishers.

83. Sarkar, Susobhan. (1983). *Towards Marx*. Culcutta: Papyrus.

84. Sartre, J.P. (1948). *Existentialism and Humanism*. Trans. By Philip Mairet. London: Methuen & Co. Ltd.

85. Sattar, S. Abdul. (2007). *Humanism of Mahatma Gandhi and M.N. Roy*. Ambala Cantt.: The Associated Publishers.

86. Schaff, Adam. (1970). *Marxism and the Human Individual*. New York: Mcgraw-Hill.

87. Schmidt, Affred. (1971). *The Concept of Nature in Marx*. London: NLB

88. Schwegler, Albert. (1982). *Modern Philosophy: Descartes to Hegel*. Trans. by James Hutchison Stirling. Calcutta: K.P. Bagchi & co.

89. Searle, John R. (1986). *Minds, Brains and Science*. London: Harvard University Press.

90. ---. (1992). *The Rediscovery of the Mind*. Cambridge: MIT Press.

91. Sharma, Chandradhar. (2003). *A Critical Survey of Indian Philosophy*. Delhi: Motilal Banarsidass.

92. Shields, Christopher. (Ed.). (2003). *The Blackwell Guide to Ancient Philosophy*. U.K.: (n.p.).

93. Simon, St. (n.d.). *New Christianity*. Trans. by The Rev. J. E. Smith. London: B. D. Cousins.

94. Singer, Peter. (1983). *Hegel: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

95. Singh, M.P., & Roy, Himanshu. (Ed.). (2011). *Indian Political Thought: Themes and Thinkers*. Delhi: Pearson.

96. Thilly, Frank. (1931). *A History of Philosophy*. New York: Henry Holt and Company.

97. Wallace, William. (1904). *The Logic of Hegel*. Oxford: The Oxford University Press.

98. Watson, Gary. (Ed.). (1989). *Free Will*. New York: Oxford University Press.

99. Wedberg, Anders. (1982). *A History of Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.

100. Wetter, Gustav A. (1958). *Dialectical Materialism: A Historical Survey of Philosophy in the Soviet Union*. London: Routledge & Kegan Paul.

101. Wright, E.O. (1978). *Class, Crisis, and the State*. London: New Left Books.

102. Wright, William Kelley. (1941). *A History of Modern Philosophy*. New York: The Macmillan Company.

103. Zizek, Slavoj. (2023). *Freedom: A Disease without Cure*. London: Bloomsbury Academic.

104. ইসলাম, ড. আমিনুল. (১৪১৫). *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*. ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স.

105. এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক. (১৯৮২). *অ্যান্টি ড্যুরিং.* (অনু.) দীপক রায়. খড়্গপুর: কর্নারস্টোন পাবলিকেশন.

106. ---. (২০১৯). *পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি:.

107. ---. (২০০১). *প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা.* অনু- দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. কলকাতা: এন বি এ.

108. কর্ণ্‌ফোর্থ, মরিস. (১৯৯৩). *দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ.* (অনু.) ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক.

109. কিরিলেঙ্কো, গ. ও করশুনোভা, ল. (২০১৭). *সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ: দর্শন কী.* (অনু.) প্রফুল্ল রায়. ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী.

110. ক্রাপিভিন, ভাসিলি. (১৯৮৯). *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী?.* (অনু.) প্রফুল্ল রায়. কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন.

111. গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত. (১৯৯৩). *চার্বাক দর্শন.* কলকাতা: অবভাস.

112. গেস্ট, ডেভিড. (২০১১). *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ: মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা.* (অনু.) আনন্দময়ী মজুমদার. ঢাকা: সাহিত্যিকা.

113. ঘোষ, অরুণাভ. (সম্পা.). (২০০১). *সার্ধশতবর্ষে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার-এর প্রাসঙ্গিকতা.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.

114. ঘোষ, শিবদাস. (২০২০). *মার্কসবাদ প্রসঙ্গে.* কলকাতা: সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট).

115. চক্রবর্তী, বসুধা. (১৯৬১). মানবতাবাদ. কলকাতা: দীপায়ন.

116. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ. (১৯৯৩), *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে.* কলকাতা: অনুষ্টুপ.

117. ---. (১৩৬৩ বাং). *লোকায়ত দর্শন.* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি:

118. ---. (২০১১). *অগ্রন্থিত রচনা: দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব.* (সম্পা.). মলয়েন্দু দিন্দা. কলকাতা: অবভাস.

119. ---. (২০১৯). *মার্কসবাদ.* ঢাকা: মাটিগন্ধা.

120. চৌধুরী, কণিষ্ক. (২০১৭). *ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারা.* কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী.

121. ত্রিপাঠী, অমলেশ. (১৯৮৭). *ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চরমপন্থী পর্ব.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স.

122. দত্তগুপ্ত, শোভনলাল. (২০০৬). *মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ.

123. ---. (২০১০). *সমাজ মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল: নির্বাচিত প্রবন্ধ.* কলকাতা: সেরিবান.

124. ---. (সম্পা.). (২০১৯). *আনতোনিও গ্রামশি বিচার-বিশ্লেষণ.* কলকাতা: সেরিবান.

125. ---. (২০২০). *প্রসঙ্গ পশ্চিমী মার্কসবাদ: গ্রামশি থেকে হাবেরমাস বক্তৃতামালা.* কলকাতা: সেরিবান.

126. দাস, স্বদেশরঞ্জন. (১৯৬৫). *মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও দর্শন.* কলকাতা: দ্য র‍্যাডিকাল হিউম্যানিষ্ট.

127. পাল, শ্রীরামচন্দ্র. (১৯৭১). *দর্শন পরিচয়.* কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স.

128. পোনমারেভ, বরিস এন. (১৯৮৬). *পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সাম্যবাদ.* অনু- শিশির মিত্র. কলকাতা: মনীষা

129. বকসী, প্রদীপ. (১৯৮৫). *মার্কসবাদ, গণিত ও তর্কশাস্ত্র.* কলকাতা: জ্ঞানান্বেষণ.

130. বটোমোর, টম. (১৯৯৩). *মার্কসীয় সমাজতন্ত্র.* (অনু.) হিমাংশু ঘোষ. কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী.

131. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ. (২০১৬). *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* খণ্ড ২. কলকাতা: সাহিত্য একাডেমী.

132. বর্মন. রেবতীমোহন. (১৯৯৪). *হেগেল ও মার্কস.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি:

133. ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ. (২০১৩). *বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা.* কলকাতা: অবভাস.

134. ---. (২০১৭). *চার্বাক চর্চা.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি:

135. ---. (২০১৮). *মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা.* কলকাতা: অবভাস.

136. ---. (২০২১). *দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা.* কলকাতা: অবভাস.

137. ভট্টাচার্য, সুকুমারী. (২০০২). *প্রবন্ধসংগ্রহ* ২. কলকাতা: গাঙচিল.

138. ---. (২০০৯). *বেদে সংশয় ও নাস্তিক.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি.

139. ভট্টাচার্য্য, সৌরেন, ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক. (সম্পা. ও অনু.). (১৯৬৪). *আনতোনিও গ্রামশি নির্বাচিত রচনাসমগ্র.* কলকাতা: পার্ল পাবলিকেশন.

140. ভদ্র, মৃণালকান্তি. (১৯৯১). *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ.* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়.

141. ভাসিলি, ক্রাপিভিন. (১৯৮৯). *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কি.* (অনু.) প্রফুল্ল রায়. মস্কো: প্রগতি প্রকাশন.

142. ভৌমিক, ননী. (১৯৮৭). *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*-২. মস্কো: প্রগতি প্রকাশন.

143. মার্কস ও এঙ্গেলস. (১৯৭৯). *নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড,* মস্কো: প্রগতি প্রকাশন.

144. মার্কস, কার্ল. (২০০৯). *দ্য ক্যাপিটাল.* সার-সংক্ষেপ- রেবতী বর্মন. ঢাকা: নালন্দা.

145. মিত্র, মাধবেন্দ্র নাথ, চ্যাটার্জী, অমিতা ও সরকার, প্রয়াস (সম্পা.). (২০১৩). *মনোদর্শন: শরীরবাদ ও তার বিকল্প.* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা.

146. মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা. (২০১৫). *ব্যক্তিচরিত্র এবং নৈতিকতা.* কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবোধি বুক এজেন্সী.

147. রশীদ, হারুন. (২০০৭). *মার্কসীয় দর্শন.* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ.

148. রাসেল, বার্ট্রাণ্ড. (১৯৯৮). *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস.* (অনু.) শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত ও শর্মিষ্ঠা রায়. কলকাতা: বাউলমন প্রকাশন.

149. রায়, অজিত. (১৯৬০). *আনতেনিও গ্রামশীর জীবন ও তত্ত্ব.* কলকাতা: পার্ল পাবলিকেশন.

150. রায়, অনিল. (১৩৬৫ বাংলায়). *হেগেলীয় দর্শন.* কলকাতা: জয়শ্রী প্রকাশন.

151. রায়, মানবেন্দ্রনাথ. (১৩৫৩ বাংলায়). *মার্কসবাদ.* (অনু.) সমরেন রায়. কলিকাতা: রেনেসাঁ পাবলিশার্স.

152. ---. (১৯৮৮). *মানবতাবাদী পথ.* (সম্পা.) মনোজ দত্ত. কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স

153. ---. (২০০৫). *নবমানবতাবাদ: একটি ইস্তাহার.* (অনু.) গোপাল চন্দ্র দাস. কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স.

154. রায়, শিবনারায়ণ. (সম্পা.). (২০০৭). *বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ: মুক্তি সাধনার তিন পর্ব.* কলকাতা: রেনেসাঁ পাবলিশার্স প্রা. লি.

155. লেনিন, ভি আই. (২০১০). *নির্বাচিত রচনাবলী.* খণ্ড ১. (অনু.) বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়. কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.

156. ---. (২০১২). *বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ.* (অনু.) বরুণ মুখোপাধ্যায়. কলকাতা: বিবলিয়া.

157. শীলাঙ্ক. (১৯৭৮). *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রবৃত্তি.* মুনি জম্ববিজয়. দিল্লী: মোতিলাল বেনারসীদাস ইন্ডোলজিক্যাল ট্রাস্ট.

158. শাস্ত্রী, শ্রীপঞ্চানন. (১৩৯৪ বাং). *চার্বাক দর্শনম্.* আগড়পাড়া: শ্রী সাম্যব্রত চক্তবর্ত্তী.

159. সরকার, শিপ্রা. ও দাশ, অনমিত্র. (সংকলিত). (২০১৪). *বাঙালীর সাম্যবাদ চর্চা.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:

160. স্তালিন, জে ভি. (১৯৫০). *দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ.* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি:

161. সুইজি, পল এম. (২০২২). *মার্কসবাদ প্রসঙ্গে.* (অনু.) সুশোভন মুখোপাধ্যায়. খড়গপুর: কর্নারস্টোন পাবলিকেশনস্.

162. হাবিব, ইরফান. (সম্পা). (২০২১). *সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে.* (অনু.) জয়দীপ ভট্টাচার্য. কলকাতা: এন বি এ.

Journals:

163. Basu, Soumitra. (1992). Human Action and Freedom: Some Reflections on Searle's view. *Jadavpur Journal of Philosophy*. Vol. 04. No. 01.

164. Chouhan, A.P.S. & Singh, Dinesh Kumar. (July- Sept. 2005). M.N. Roy and Marxism. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 66. No. 3. pp. 633-648.

165. Contini, Paolo & Osmanaj Elisabeth. (19th October, 2023). Slouching toward New Humanism. *Frontiers*. DoI. 10.3389/fsoc.2023.1111690

166. Grover, D.C. (Jan-Mar, 1972). Contemporary Socialist Thought in India: A Study in Revisionism. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 33. No. 01. pp. 58-74

167. Mahakul, B.K. (July- Sept., 2005). Radical Humanism of M.N. Roy. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 66. No. 03. pp. 607-618.

168. Sahu, Sangita. (August, 2023). New Humanism: An Analytical Review. *Aksara Multidisciplinary Research Journal*. Issue no. 09. Vol. 3. EISSN 2582 5429.

169. Sarasohn, Lisa T. (July-September, 1985). Motion and Morality: Pierre Gassendi, Thomas Hobbes and the Mechanical World-View. *Journal of the History of Ideas*. Vol. 46. No. 3. pp. 363-379

170. Sellars, Roy Wood. (May 1927). Why Naturalism and Not Materialism?. *The Philosophical Review*. Vol 36. No. 3. pp. 216-225.

171. Sibi, Dr. K.J. (January, 2020). Thoughts of M.N. Roy on Radical Humanism and Democracy. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*. Vol. 4. Issue 4. EISSN 2456 6470.

172. Simirnov, G. (1985). Marxism And The Individual. *The Marxist*, Vol. 3, No. 4. Retrieved from https://cpim.org/marxism-individual/

173. Varma, Vishwanath Prasad. (1961). Marxism and M.N. Roy. *The Indian Journal of Political Science*. Vol. 22. No. 04. pp. 279-292.